প্রথম প্রকাশ
জানুঅরি ১৯৫৯

প্রকাশক
মনোরঞ্জন মজুমদার
আনন্দধারা প্রকাশন
৭৯।১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
অশোক ভট্টাচার্য
শোভনা প্রেস
১/১ জাননগর রোড
কলিকাতা-১৭

প্রচ্ছদ শিল্পী
খালেদ চৌধুরী

নি বে দ ন

লেখালেখিতে পনের বছর কাটল। আজো ঠিক করতে পারি নি, গদ্য না পদ্যের রহস্য আমাকে বেশি টানে। কবিতায় বেশি মুগ্ধ হই, না, কথাসাহিত্য আমায় অধিকতর অভিভূত করে। অথবা ভাষা ও শব্দের জাদু আমার লেখার প্রেরণা। তাই গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ-সাধনের প্রকৃতি যেমন জানতে চাই, তেমনি উপভাষা ও গদ্যভাষার উৎস-সন্ধানেও যেতে চাই। জানতে চাই বাক্‌প্রতিমার রহস্য।

প্রথম দুটি নিবন্ধ বিশ বছরের (১৯৫০) বাংলা গল্প-উপন্যাসের বিচিত্র রূপকর্ম নিয়ে আলোচনা। এ আলোচনার সীমারেখা ১৯৫০-এর শারদীয় সাহিত্যসম্ভারের পূর্ব-মুহূর্ত। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনাটি আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্ররোচিত করেছিল একটি তীব্র উদ্দীপক নিবন্ধ রচনায় (দ্র° গল্পভারতী শারদ সংখ্যা ১৯৫০)। সেটি আমার লেখাপড়ার পরম পুরস্কার বলে মনে করি।

গত দশ বছরে (১৯৫০) রচিত পনেরটি নিবন্ধের সংকলন এই গ্রন্থ। সর্বত্রই মতের মিল হবে, এমন ভরসা করি নে। সমর্থন চাই নে, উপেক্ষায় আমার আপত্তি।

দেশব্যাপী হানাহানির মাঝে প্রবন্ধ-গ্রন্থ প্রকাশের বুকের পাটা দেখিয়েছেন শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার। এজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

বর্তমান লেখকের

স্মৃতি-বিস্মৃতি

সাহিত্য-সন্ধান

সাহিত্য-বাতায়ন

লেখকের মুখোমুখি

বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস

বাংলা সমালোচনার ইতিহাস

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য

বীরবল ও বাংলা সাহিত্য

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ

বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ

কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা

রবীন্দ্র-মনীষা

রবীন্দ্র-সমীক্ষা

Pramatha Chaudhuri (Sahitya Akademi)

সম্পাদনা

রবীন্দ্র-বিতান (রবীন্দ্র-সমালোচনা-নিবন্ধ সংকলন)

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যসঞ্চয়

যুগ্ম-সম্পাদনা

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

শুদ্ধসত্ত্ব সাহিত্যিক
শ্রীঅন্নদাশংকর রায়
শ্রদ্ধাভাজনেষু

সময়ের খর স্রোত, বাংলা উপন্যাস

॥ এক ॥

"সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে যে চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ, তা পৃথিবীব্যাপী অসন্তোষ ও বিদ্রোহের প্রতীক। যে সমস্ত ঐতিহাসিক শক্তি আজ সমাজের ভবিষ্যৎ নির্দেশ করছে, তাদের প্রভাবে শিক্ষা ও সমাজের গুরুবাদী মনোভাব টলে উঠেছে। বুদ্ধির স্বাধীনতার আহ্বানে প্রাচীন সংস্কারের প্রাচীর ভেঙে যায়, জোয়ারের প্রথম স্রোতে নতুন জলের সঙ্গে আবর্জনাও ভেসে আসে। জোয়ারের বেগ যত বেশী, ভাঁটার টানও তত প্রবল। তাই ভারতবর্ষে আজ প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াপন্থী শক্তি দুই-ই সমান প্রবল, দোটানায় জনমানস বিভ্রান্ত, উদ্বেল। বহু যুগব্যাপী সামাজিক প্রক্রিয়ায় যে গুরুবাদী মনোবৃত্তি গড়ে উঠেছিল, তার বদলে বুদ্ধিনির্ভর স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার সময়ে যে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে ভাববে, সমাজে অনিশ্চয়তা, চাঞ্চল্য ও বিদ্রোহ দেখা দেবে, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে ?...

পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিন্তু আমাদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান যতখানি বদলিয়েছে, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্বাস ততখানি বদলায় নি। সমালোচনার মনোভাব সমাজে ছড়িয়েছে বটে, কিন্তু আজও তা ভাসাভাসা, সমাজের মূল প্রশ্নের দিকে আজও তার দৃষ্টি যায় নি। বুদ্ধির প্রাধান্য যতখানি কথায় স্বীকার করি, ততখানি কাজে করি না। তাই প্রাচীনপন্থী বিশ্বাস ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর যুগপৎ প্রকাশ পদে পদে আমাদের বিস্মিত করে। বর্তমান যুগের ভারতবাসীর চিন্তায় কথায় কাজে একই সঙ্গে বহু যুগের বিভিন্ন ও কোন কোন বিষয়ে পরস্পরবিরোধী মনোভাবের পরিচয় মেলে। সর্বত্রই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যে অপূর্ব সংমিশ্রণ, তার ফলে অভিজ্ঞতার প্রত্যেক ক্ষেত্রে যে সমন্বয় ও সমাবেশ, তার বৈচিত্র্য কখনো বিস্ময়কর, কখনো বিভ্রান্তিকর।......

একদিকে জাতির পুনর্জন্ম, অন্যদিকে সামাজিক কুসংস্কারের পুনরুজ্জীবন—এই দোটানায় ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক জীবন বিভ্রান্ত। পূর্বের পরিচিত সমাজ আজ বিলুপ্ত অথবা বিলীয়মান। কর্তৃত্বের ভিত্তিতে সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণ

আজ প্রায় অসম্ভব। পূর্বের সমাজে গুরুবাদ ছিল, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন-যাত্রার নিশ্চয়তাও ছিল। আজ ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত এবং বহু ক্ষেত্রে লক্ষ্যহীন। পুরোনো সমাজবন্ধনের মধ্যে ফিরে যাওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। আজকের দিনে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সমাজ যেভাবে পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা, তাতে আজ কোন দেশ অথবা সমাজের পক্ষে বাইরের পৃথিবীকে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করবার পথ নেই। যেসব মানুষের সঙ্গে জীবনে কোন দিন দেখা হবে না, যাদের অস্তিত্বের কথাও আমরা সাধারণত ভাবি না, তারাও আজ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে। আমাদের অজান্তে যেসব সিদ্ধান্ত, আমাদের জীবন-মরণও তাদের উপর নির্ভরশীল। অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় শক্তির ক্রীড়নক হিসাবে ব্যক্তি-বোধ এর পূর্বে কোনদিন এত নিরুপায় বোধ করেনি। একদিকে বিপুল বিশ্বের ভার এবং অন্যদিকে ব্যক্তিবিশেষের অসহায়তা; তারই মধ্যে আজকার তরুণ সম্প্রদায় অনিশ্চিত বিদ্রোহে অজানা লক্ষ্যের দিকে চলেছে।

চিরদিনের শান্ত আত্মস্থ ভারতবর্ষ তাই আজ চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। ভারতবাসী আজ পরিচিত বন্দর ছেড়ে দুস্তর সাগর পাড়ি দিতে চায়। লক্ষ্য আজো স্পষ্ট নয়। কিন্তু লক্ষ্যের জন্য আকুতি আজ অনস্বীকার্য।

কোন সমাজ বা কোন যুগই কিন্তু স্বয়ম্ভূ নয়। হতে পারে না। দুনিয়ায় একেবারে নতুন কিছুই নেই, সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের যেসমস্ত অভিব্যক্তিকে একান্তভাবে নতুন মনে হয়, বিচার করলে দেখা যাবে যে, তাদেরও ইতিহাস দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও পুরাতনের সঙ্গে বর্তমানের পার্থক্য যে এক অর্থে নতুন, একথাও অস্বীকার করা যায় না। শুধু ভারতবর্ষ বলে নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই গত দুই-তিন শতকে পরিবর্তনের গতি ও পরিমাণ অভূতপূর্ব। ইতিহাসের আদিমকাল থেকে প্রায় দশ হাজার বছরেও যেসব বদল সম্ভব হয় নি, গত দুই-তিনশো বছরে সেগুলি বাস্তবরূপ নিয়েছে। মানুষের সমাজে যেসব পরিবর্তন গত দুই-তিনশো বছরে হয়েছে, তার তুলনায় পূর্বের দশ হাজার বছরের ইতিহাসকে গতিহীন স্থাবর সমাজের ইতিহাস বললে অত্যুক্তি হবে না। গত পঞ্চাশ বছরে এই পরিবর্তনের গতি আরও বেগবান হয়েছে। বর্তমানে দশ বছরে যেসব পরিবর্তন আসে পূর্বে হাজার বছরেও তা সম্ভব হয় নি।

বর্তমান যুগের দু'টি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একদিকে পরিবর্তনের গতিবেগ অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়েছে এবং আজও বাড়ছে। অন্যদিকে, আজ এ পরিবর্তন কোন বিশেষ দেশকালে সীমিত নয়। আজ প্রত্যেক পরিবর্তনের ফল পৃথিবীব্যাপী।" ('ভারতীয় ঐতিহ্য' : চতুরঙ্গ, বর্ষ ৩১, সংখ্যা ২, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৬)।

জনাব হুমায়ুন কবির মৃত্যুর পূর্বে এই দীর্ঘ রচনাটি শেষ করে যেতে পেরেছিলেন। উদ্ধৃত অংশটি তার সমাপ্তি-অধ্যায় থেকে গৃহীত।

সময়ের খরস্রোত কতো তীব্র, গভীর ও দূরপ্রসারী, তার পরিচয় অল্প কথায় নিপুণভাবে এখানে কবির সাহেব ব্যক্ত করেছেন। আমাদের চেনা পরিবেশ, সংসার, সমাজ কী দুরন্ত গতিতে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে, তার সামগ্রিক রেখাচিত্রটি এই বর্ণনায় আভাসিত। আমাদেরকে ঘিরে যে চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ, সংশয় ও নৈরাশ্য, যে দ্বিধা ও দোটানা, যে আত্মপ্রতারণা ও পরস্পরবিরোধিতা, বিশাল সংঘবদ্ধ সমাজ ও উৎপাদন শক্তির কাছে ব্যক্তি-বোধের নিরুপায়তা ও অসহায়তা, এস্টাব্লিশমেন্টের প্রতি আনুগত্য ও ভীরু আপোস, নিঃসঙ্গতার বেদনা ও বিচ্ছিন্নতাবোধের সূচীমুখ তীক্ষ্ণতা, এস্টাব্লিশ-মেন্টের বিরুদ্ধে তারুণ্যের বিদ্রোহ ও সাহসী সংগ্রাম, কর্তাভজা মনোভাব ও কুসংস্কারানুগত্যের জগাখিচুড়ি, নতুন পৃথিবী অন্বেষণের তীব্র ব্যাকুলতা ও আন্তরিকতা—এ-সব কিছুই আমাদের চঞ্চল, উত্তেজিত, অশান্ত করে তুলেছে।

বাংলা উপন্যাসে এইসব প্রগতি ও পশ্চাৎগতির ছাপ পড়েছে। প্রাচীন-পন্থী বিশ্বাস ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি একই সঙ্গে ধরা পড়ে। পরস্পরবিরোধী মনোভাবের সংমিশ্রণে ব্যক্তি-মানুষের দ্বিধা-সংশয় শিল্পরূপ পায়। অভিজ্ঞতার প্রতিটি ক্ষেত্রে যে সমন্বয় ও সমাবেশ, তার বৈচিত্র্য কখনো বিস্ময়কর, কখনো বিভ্রান্তিকর হয়ে দেখা দেয়। তাই সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে পরস্পর-বিরোধী ধারা পাশাপাশি প্রবাহমান। একটানা গল্প বলে যাওয়ার অশিক্ষিত পটুত্ব যেমন দেখা যায়, তেমনি অন্তর্বীক্ষায় তৎপর অস্তিত্বের স্বরূপসন্ধানী উজ্জ্বল উপন্যাসও লেখা হয়। একদিকে যেমন নিটোল কাহিনী বয়নের প্রতি ঝোঁক দেখা যায়, অপরদিকে তেমনি অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে আশ্চর্য মৌলিকতা লক্ষ্য করা যায়।

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস, রোমান্স-কাহিনী রচনায় যেমন উৎসাহ, রোমান্টিক স্মৃতিবাহী টানা গল্প রচনায় তেমনি উৎসাহ। আবার

অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা, অসামাজিকতা—এই তিন বোধের প্র আনুগত্য লক্ষ্য করা করা যায়; আধুনিক মানসের এইসব 'চরিত্রলক্ষণ উপন্যাসের প্লট ও চরিত্রকে গড়ে তোলে—এও লক্ষ্য করা যায়। বিচ্ছিন্নতা-বোধ অথবা নৈঃসঙ্গ্য অতিক্রমণের প্রয়াস ও সে প্রয়াসের পথে অন্তর্মনের গভীরে লেখকের মানস অভিযাত্রা : আধুনিক উপন্যাসে এই শিল্পলক্ষণ তথা জীবনদৃষ্টির উপস্থিতি যেমন সত্য, তেমনি বিচ্ছিন্নতাবোধ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব বা বিচ্ছিন্নতাবোধে জর্জরিত লেখকের বিশ্বাসের শোচনীয় অনুপস্থিতি তেমনি সত্য।

কল্লোল-কালিকলম-বিচিত্রা-ভারতী গোষ্ঠীর লেখকদের হাত থেকে উপন্যাসের দায়িত্বভার বুঝে নিয়েছিলেন যে লেখকগোষ্ঠী, তাঁরাও আজ প্রবীণ। আজ তাঁদের হাত থেকে দায়িত্বভার বুঝে নিতে এসেছেন তরুণ লেখকরা, এই সত্য অবশ্যস্বীকার্য।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, মনোজ বসু, প্রমথনাথ বিশী, বনফুল,—এঁরা উপন্যাস লিখছেন না, এমন কথা বলি না, এঁদের অনেকেই এখনো পর্যন্ত নব দৃষ্টি ও নব পরীক্ষায় উৎসাহী, তাও সত্য। কিন্তু তার চেয়ে বেশি সত্য এঁদের পরবর্তীরা নব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে পদার্পণ করেছেন। সতীনাথ ভাদুড়ী, সুবোধ ঘোষ, বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গৌরকিশোর ঘোষ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, জীবনকে নোতুন রূপে দেখেছেন, দেখিয়েছেন। এই গোষ্ঠীর পরবর্তীরা বেশিদিন অপেক্ষা করেন নি; তাঁরা উপন্যাসক্ষেত্রে পৌঁছে গেছেন, ধ্বনিত হচ্ছে তাঁদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। শোনা যাচ্ছে নোতুন নাম: শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, আনন্দ বাগচী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। এ'দুই গোষ্ঠীর মাঝে আছেন শংকর, ধনঞ্জয় বৈরাগী, প্রফুল্ল রায়, মহাশ্বেতা দেবী, কবিতা সিংহ, অসীম রায়, কমলকুমার মজুমদার, অমিয়ভূষণ মজুমদার। আর মনে পড়ছে দু'জন কিছুকাল পূর্বে লোকান্তরিত ঔপন্যাসিক—সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সতীনাথ

ভাদুড়ীকে।

(পাঠকের কাছে বর্তমান লেখকের ব্যক্তিগত নিবেদন : এটি লেখক-তালিকা নয়, গোষ্ঠীবন্ধন বা মেলবন্ধন প্রয়াস নয়, উপন্যাস-তালিকা নয়, নিছক ভালো লাগা না-লাগার বিবরণ।)

॥ দুই ॥

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' লিখে সতীনাথ ভাদুড়ী আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আঞ্চলিক উপন্যাসের সিদ্ধি ও শিল্পসম্ভাবনার উজ্জ্বল পরিচায়ক এই উপন্যাস। বিহারের গ্রামের অন্ত্যজ সমাজের একটি কিশোরকে ঘিরে তিন খণ্ডে এই উপন্যাস গড়ে উঠেছে। লেখকের গভীর সংবেদনশীলতা ও অভিজ্ঞতার সার্থক মিলন ঘটেছে এখানে। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে লিখিত তাঁর শেষ উপন্যাস 'দিগ্‌ভ্রান্ত' সর্বথা আধুনিক উপন্যাস। ডাক্তার, তাঁর স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে—চারজনকে নিয়ে এই উপন্যাস গড়ে উঠেছে। চারজনের মধ্যে যে পারিবারিক ও মানসিক বন্ধন ও আত্মীয়তা ছিল, তা কীভাবে ছিন্ন হল, কীভাবে পরস্পরের মাঝে দেওয়াল গড়ে উঠল, কীভাবে সেই ব্যবধান আবার ঘুচে গেল—তারই নিপুণ বিশ্লেষণ 'দিগ্‌ভ্রান্ত'। অন্তর্মনের বিশ্লেষণে সতীনাথ ভাদুড়ীর শিল্পসিদ্ধি শেষবারের মতো নোতুন করে প্রতিষ্ঠিত হল। 'জাগরী'তে বাবা, মা, দু'ছেলে,—চারটি চরিত্র। এখানেও চারটি চরিত্র—বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে। 'জাগরী' রোমান্টিক উপন্যাস, দিগ্‌ভ্রান্ত সর্বাঙ্গীণ আধুনিক উপন্যাস—বিচ্ছিন্নতাবোধের নির্মোহ বিশ্লেষণ। কেবল সতীনাথ ভাদুড়ীর অগ্রগতি নয়, বাংলা উপন্যাসের শিলাস্মারক 'দিগ্‌ভ্রান্ত'।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'সৃষ্টি' 'স্মৃতি' 'ঘর' অন্তর্বিশ্লেষণের উজ্জ্বল স্বাক্ষর, তাতে সন্দেহ নেই। মননধর্মী উপন্যাসের নিদর্শন এগুলি। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা-আবর্ত-মোহানা'র পর সঞ্জয় ভট্টাচার্যের এইসব উপন্যাসে মননেরই প্রাধান্য।

অন্নদাশংকর রায়ের কাছে উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু প্রেম। চল্লিশ বছর আগে প্রেমকে অবলম্বন করে উপন্যাস লিখেছেন, আজো লিখছেন, কিন্তু তাঁর বক্তব্য চর্বিতচর্বণ নয়। 'আগুন নিয়ে খেলা', 'পুতুল নিয়ে খেলা'

থেকে তিনি বহুদূর এগিয়ে এসেছেন। 'বিশল্যকরণী' ও 'তৃষ্ণার জল' তার প্রমাণ। পূর্বধৃত উপন্যাস দু'টিতে হৃদয় বিনিময়ের আখ্যান, ছিল 'খেলা', আজ অন্নদাশংকরের দৃষ্টিতে তা সমগ্র অস্তিত্বের প্রবল তৃষ্ণা। তিনি কাহিনীর পুরোনো ছকটি বর্জন করেন নি, কিন্তু বক্তব্য বদলেছেন। পটভূমি অংশত ইয়োরোপ—অংশত ভারতবর্ষ, পাত্রপাত্রী বিদেশিনী ও ভারতীয় সমাজের উঁচু তলার যুবক। মিল এই পর্যন্তই। 'বিশল্যকরণী'র নায়ক হারীত ও 'তৃষ্ণার জল'-এর নায়ক প্রবাহন, দুজনেই প্রেমকে জীবনের মহত্তম উপলব্ধি বলে মেনেছে, সে উপলব্ধি তাদের জীবনে এসেছে বিভিন্নস্তরের নারী-চরিত্রের সান্নিধ্য পেরিয়ে। 'বিশল্যকরণী'তে হারীত-বকুল, হারীত-পার্বণী, হারীত-জোল: অনুরাগের নানা স্তর, এ যেন প্রেমের পথ পরিক্রমা। হারীতের লক্ষ্য যে প্রেম তা এইসব অভিজ্ঞতার স্তর পেরিয়ে পাওয়া যায়। প্রেমের উপলব্ধি হারীতের কাছে পূর্ণতার উপলব্ধি। 'তৃষ্ণার জলে' এই উপলব্ধির পরিণত শিল্পরূপ। সুদেষ্ণা, কাজরী, ইলেন—নারীপ্রেমের নানা স্তর নায়ক প্রবাহনকে পূর্ণতার পথে এগিয়ে দিয়েছে। এই নায়ক ভাবুক লেখক, তরুণ সিভিলিয়ান, স্বভাবে রোমান্টিক। ইলেন নাম্নী বিদেশিনী, প্রবাহনের জীবনে সেই নারী যে তাকে দেয় প্রার্থিত তৃষ্ণার জলের আশ্বাস। ইলেনের সঙ্গে মিলনের মধ্য দিয়ে প্রবাহনের প্রেমানুসন্ধান তথা পূর্ণতানুসন্ধানের সমাপ্তি। "তারই জন্য আমি অপেক্ষা করতে চাই যে আমার তৃষ্ণার জল, আমি যার তৃষ্ণার জল", প্রবাহনের এই উক্তিতে এই উপন্যাসের রোমান্টিকতা ব্যক্ত হয়েছে। বস্তুত এ দু'টি উপন্যাস প্রেমের নয়, প্রেমতত্ত্বের উপন্যাস।

প্রেমেন্দ্র মিত্রর 'প্রতিধ্বনি ফেরে' জীবনের সত্য অন্বেষণের কাহিনী। প্রেমেন্দ্র মিত্র কিছুকাল পূর্বে আলব্যার কাম্যু-র 'দি আউটসাইডার' উপন্যাসটি 'অচেনা' নামে অনুবাদ করেন। 'প্রতিধ্বনি ফেরে' প্রসঙ্গে এই সংবাদ তাৎপর্যহীন নয়। অস্তিত্বের জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল, জীবনসত্যের অন্বেষণে নিরত ভ্রাম্যমাণ পুরুষ কাম্যু-র উপন্যাসের নায়ক। 'প্রতিধ্বনি ফেরে' অতদূর যেতে পারেনি, কিন্তু এখানে, জীবনসত্যের অন্বেষণই (detection) মুখ্য সাধন। উপন্যাসের নামটি তাৎপর্যপূর্ণ। সংবাদপত্রের তরুণ রিপোর্টার অসীম রাহা তার সংবাদপত্রের জন্য বিগত যুগের রাজনৈতিক নেতা উমাপতি ঘোষালের জীবনের কাহিনী সন্ধানে বেরিয়েছিল। ফ্ল্যাশব্যাকে উমাপতির জীবনের নানা তথ্য এসেছে। অসীম রাহা উমাপতির জীবনের সত্যকে অন্বেষণ

করছে। নীরজা দেবী, মন্দি চৌধুরী, নিশীথ পাত্র, জয়া দেবী, মলয়া, বিপিন—নানা জনের কাছ থেকে সে উমাপতির জীবনের সত্যটা জানতে চাইছে। কিন্তু কাকে সে খুঁজছে? কোন্ উমাপতিকে? সে তো অচেনা। চেনা উমাপতির আড়ালে অচেনা উমাপতি, তাকে সে কোথায় পাবে? শেষ পর্যন্ত অসীম রাহা উমাপতি সম্পর্কে তার সাংবাদিক কৌতূহল পরিত্যাগ করেছে, সংবাদ-পত্র কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে—"উমাপতি ঘোষাল সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি বটে, কিন্তু তথ্য দিয়ে কোন জীবনেরই সত্য জানা যায় কিনা এ সন্দেহই ক্রমশ বেড়েছে। আপনি উমাপতির ব্যর্থতার রহস্য জানতে চেয়েছিলেন। তিনি ব্যর্থ কিনা তাই আমার কাছে রহস্য-হয়েই রইল।· উমাপতিকে খুঁজতে গিয়ে নিজেকে খুঁজে পেয়েছি মনে হচ্ছে। আর একবার এই গ্রন্থি জটিল রহস্য-নগরীর কবি হবার চেষ্টা করে দেখব।"

উমাপতিকে ঘিরে জীবনের যে রহস্য, অসীম রাহা তাকেই খুঁজতে বেরিয়েছে, আর সে ক্ষেত্রে নিজে বাইরের কৌতূহলী দর্শকমাত্র থাকে নি, ভিতর-দেহলীতে পদার্পণ করেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখায় বরাবরই এই detection জীবনের রহস্য খুঁজে বেড়ানোর ঝোঁকটা রয়েছে, অনেক আগের লেখা 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের নামটিতে এই অন্বেষণের ইঙ্গিত আছে। সে ইঙ্গিত এই উপন্যাসে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। একালের ঔপন্যাসিকের অন্বেষণ বাইরে নয়, মনের গভীরে, এ সত্য এখানে আভাসিত। প্রেমেন্দ্র মিত্রেরই কবিতায় তা সুন্দরভাবে ব্যক্ত—

মত্ততা ছেড়ে মনের গভীরে এস না,
নেশা নয়, থাক পরম পাওয়ার এষণা।
চারা পোঁতাটাই নয়ক' আসল সত্য
আছে কিনা দেখ হৃদয়ের আনুগত্য।

প্রেমেন্দ্র মিত্রর সমসাময়িক শিল্পী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অন্যভাবে জীবনকে অন্বেষণ করেছেন। সংসারের সুখ-দুঃখের তরঙ্গে দোলায়িত নর-নারীকে কখনো কাছাকাছি এনেছেন, কখনো দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, আবার তাদের কাছাকাছি এনেছেন। ঘটনার তরঙ্গ নায়ক-নায়িকাকে কাছে টেনেছে, দূরে ঠেলেছে। 'মন্দাক্রান্তা' উপন্যাসে ঘটনানির্ভর কাহিনীতে বদলির চাকরি নিয়ে মুন্সেফ অতনু ঘুরেছে সারা বাংলা দেশ, পিছনে কলকাতায় থেকে গেল জয়ন্তী, জয়ন্তী বিয়ে করল ধনী শিল্পপতিকে।

ঘটনাচক্রে বিচারক অতনুর এজলাসে স্বামীর মৃত্যুদণ্ড নিতে আসতে হয়েছে জয়ন্তীকে। এ স্বাক্ষর কি কেবল রায়দানে? জীবনের পাতায় নয়? প্রেম কি প্রয়োজনে, স্বার্থে, না অন্যতর কিছুতে? ঘটনার চমকপ্রদ বিন্যাসে, ভাষার উজ্জ্বল প্রসাধনে, নদীমাতৃক বাংলার দৃষ্টিনন্দন চিত্র অংকনে অচিন্ত্যকুমারের নৈপুণ্য তর্কাতীত। কিন্তু জয়ন্তীর জীবন-সন্ধান জীবনের বহিরঙ্গে, অন্তরঙ্গে অস্তিত্ব সন্ধান নয়।

অপরদিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনসন্ধানের কাহিনী 'আলোক-পর্ণা'। 'মন্দাক্রান্তা'র অতনুর মতই 'আলোকপর্ণা'র বিকাশ মজুমদার বাংলাদেশের রূপ দেখতে চেয়েছে। অতনু পিছনে রেখে এসেছে জয়ন্তীকে, যে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। কিন্তু অতনুর জীবনে দ্বিতীয়া নায়িকার আবির্ভাব ঘটে নি। আর বিকাশ পিছনে রেখে এসেছে মনীষাকে, যার সঙ্গে তার বন্ধন সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় নি, অথচ আবির্ভাব ঘটেছে নব নায়িকা সুবর্ণার। বিকাশের জীবনে শূন্যতার মাঝে এসেছে সুবর্ণা। বিকাশের দ্বিধা, শূন্যতা-বোধ, ভীরুতা, সংশয় প্রকাশ পেয়েছে ঘটনানির্ভর কাহিনীতে। অস্তিত্বের অর্থ অন্বেষণে বিকাশ ব্যর্থ, কারণ সে যোগ্যতা তার নেই। বিকাশ না পারে এস্টাব্লিশমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে, না পারে বিচ্ছিন্নতাবোধের বেদনাকে শিল্পরূপ দিতে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আধুনিকতার সর্বাঙ্গীণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে দু'টি গ্রন্থে—'নির্জন শিখর' ও 'তৃতীয় নয়ন' (১৯৬৮-৬৯)। 'নির্জন শিখরে'র নায়ক সদ্যঅবসরপ্রাপ্ত দর্শনের অধ্যাপক ডক্টর দেবনাথ ভট্টাচার্য। আগাগোড়া আত্মকথনের ভঙ্গিতে স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে দেবনাথ তাঁর পঁয়ষট্টি বছরের জীবনকে শান্ত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে দেখেছেন। দেবনাথ বিশ্বাস করেন 'ডিটারমিনিজমে' কিন্তু সে বিশ্বাস আজ দর্শনক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত। দেবনাথ তাকেই আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন, জীবনে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁকে কেউ বোঝেনি—তাঁর স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, সহকর্মী সকলের থেকে তিনি দূরে। যে তাঁকে বুঝেছিল, সেই বিদ্যুতের সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে নি। আজ দেবনাথ পিছন ফিরে জীবনকে দেখছেন, ফেলে-আসা দিনগুলিকে পোড়োবাড়ির মত মনে হচ্ছে। স্মৃতিরা তাঁর জীবনে কল্পনা হয়ে যায় নি, তারা বাস্তবে ছিল, এখনো আছে। নিঃসঙ্গতাবোধ, বিচ্ছিন্নতাবোধ, ও এক অনিবার্য বিষাদে আক্রান্ত এই নায়ক একালের মানুষেরই প্রতিনিধি।

'তৃতীয় নয়ন'—তিনজনের কথা : ইন্দিরা, ধীরাজ আর ভূপেশ। উপন্যাসটির গাঁথুনি কুশলী হাতের রচনা। এক : ইন্দিরার রাত, দুই : ধীরাজের সকাল, তিন : ভূপেশের সন্ধ্যা। ইন্দিরার স্বামী ধীরাজ, ধীরাজের বন্ধু ও ইন্দিরার কুমারী জীবনের হীরো ভূপেশ। তিনজনে নোতুন করে মিলিত হয়েছে। তিনজনের স্বীকারোক্তি ও অন্তর্বিশ্লেষণ কী নির্মম অথচ কী অসহায়!

ইন্দিরার স্বীকারোক্তির শেষ লাইন—"মনে পড়ে গেল, এই রাত্রি শেষে আমার জন্মদিন। কিন্তু কোন্ আলোতে আমি নতুন করে জাগব?"

ধীরাজের স্বীকারোক্তির একটি অংশ—"জন্মদিনের অনুষ্ঠান। আজ এই অভিনয়টুকু আমাদের দরকার। অভিনয়? আমরা প্রত্যেকেই তো একটা অজ্ঞেয় নাটকের অভিনেতা। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে এগিয়ে যেতে হবে—কেউ ঠেকাতে পারবে না। শুধু প্রতি দৃশ্যে—প্রতি অঙ্কে আমরা যে অভিনয় করব তার ঘটনা-সংলাপ-গতি কিছুই আমাদের জানা নেই, মঞ্চের নাটকের সঙ্গে এইখানেই আমাদের তফাৎ।"

আর জীবনে সবদিক দিয়ে ব্যর্থ ভূপেশের স্বেচ্ছাবৃত আত্মহননই তার স্বীকারোক্তি। অসুস্থ ভূপেশ বাঁশিতে সুর তোলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের—'এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে/তার হৃদয় বাঁশি আপনি কেড়ে/ নিশীথ রাতের নিবিড় সুরে/বাঁশিতে তান দাও হে পুরে/একলা বসে শুনব বাঁশি অকূল তিমিরে—"

অকূল তিমিরে ভূপেশের জীবনসূর্য অস্তমিত হল, শেষ হয়ে গেল বিপ্লবীর জীবন, ব্যর্থ প্রেমিকের জীবন। জীবনযুদ্ধে পরাজিত সৈনিকের আয়ু নিঃশেষ হল।

উপন্যাসের পরিশিষ্ট : ধারোয়া নদীর ধারে : ভোর : ধীরাজের কন্‌ফেশন্। আত্মমুখী বুদ্ধিনির্ভর ধীরাজের স্বীকারোক্তি : "আমি জীবন-মৃত্যুকে এক করে দিয়ে এক নকল নিরাসক্তির নির্বোধ নায়ক ছিলুম। আজ ভূপেশের মৃত্যুটা প্রমাণ করল বেঁচে থাকার ঐশ্বর্য কত বেশি, নিরাসক্তিটা কী নিরর্থক প্রলাপ।" এই মহৎ উপলব্ধিতে 'তৃতীয় নয়ন' সার্থক।

॥ তিন ॥

জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকার আজ কে বহন করছেন? মানুষের মনের গহনে আদিম প্রবৃত্তির লীলা চিত্রণে উভয়ের শিল্প-সাফল্য আজ কে অর্জন করেছেন? সকল ধরনের মানুষ সম্পর্কে উভয়ের নির্মোহ নিরাসক্ত দৃষ্টির অধিকারী আজকের কোন শিল্পী? সমস্ত রকম ভাব-বিলাসের বিরুদ্ধে উভয়ের যে বিদ্রোহ, আজ কোন্ লেখকে তা বর্তেছে? জগদীশ গুপ্তের 'লঘুগুরু' ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাস নির্মোহ বিজ্ঞানদৃষ্টি, নৈর্ব্যক্তিক জীবনদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ বাস্তববোধের উজ্জ্বল নিদর্শন। আজ এর উত্তরাধিকারী কোন্ শিল্পী?

আমার মনে হয় এসব প্রশ্নের উত্তরে কয়েকটি নামের সঙ্গে একটি নাম অবশ্য উচ্চার্য—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। জগদীশ গুপ্ত বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর আপাত মিল নেই, কিন্তু অন্তরমিল আছে বলে মনে হয়েছে 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসে তাঁর নাম ছড়ায়, নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের বাস্তববাদী উপন্যাস বলে তা গৃহীত হয়। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র কেবল বাস্তববাদী নন, তার চেয়ে বেশি। লেখক নিজে যেমন, তাঁর লেখাও তেমনি ইনট্রোভার্ট—বাস্তব দৃশ্য ছাড়িয়ে অন্তর্লোকে জ্যোতিরিন্দ্রর উত্তরণ। জীবনের রহস্য উন্মোচনের এক আশ্চর্য রূপ তিনি দেখিয়েছেন। মানুষের সঙ্গে তিনি প্রকৃতিকে দেখেন। প্রত্যেক মানুষ যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি রহস্যময়। পরিচিত নিসর্গের গাছপালার সঙ্গে তার যোগ আছে, যেমন সম্পর্ক আছে পরিবেশ-পরিজনের সঙ্গে। সবটা মিলিয়ে তিনি সৌন্দর্য দর্শন করেন। তাঁর শিল্পদৃষ্টিতে এমন একটা সামগ্রিকতা আছে যা ইদানীং দুর্লভ। সৌন্দর্য-নিগূঢ়তা, সমগ্রতা তাঁর কাছে বস্তু অপেক্ষা সত্যতর। তিনি মুগ্ধ রোমান্টিক প্রকৃতি-পূজক নন। কিন্তু পরিচিত নিসর্গ থেকে তিনি সৌন্দর্যদর্শনের মূলে যেতে চান। তাঁর সৃষ্ট নরনারী নিসর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, নিসর্গ সম্পর্কে কখনই অচেতন নয়। 'নিশ্চিন্দিপুরের মানুষ' ও 'প্রেমের চেয়ে বড়'—এ দুই উপন্যাসে জ্যোতিরিন্দ্রর শিল্পসামর্থ্য সংশয়াতীতরূপে প্রতিষ্ঠিত, অথচ কী আশ্চর্য আলাদা ধরনের দু'টি প্রধান চরিত্র। 'নিশ্চিন্দিপুরের মানুষ' উপন্যাসের নায়িকা শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে তুলে নেওয়া উদ্বাস্তু মেয়ে আর 'প্রেমের চেয়ে বড়' উপন্যাসের নায়ক 'লর্ড', যে খুনের দায়ে জেল খেটে সবে ফিরেছে। ঐ

উদ্বাস্তু মেয়ে যেমন আশ্রয়হীনা, 'লর্ড'ও তেমনি আশ্রয়হীন। অথচ দু'জনের আশ্রয়হীনতার মধ্যে কী দুস্তর ব্যবধান! অনেক দুর্ভাগ্য দুঃখ লাঞ্ছনার পথ পেরিয়ে উদ্বাস্তু মেয়েটি নিশ্চিন্দিপুরের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে পৌঁছল আর 'লর্ড' সামাজিক পারিবারিক সম্পর্কের ফাঁকি পেরিয়ে, ব্যক্তিগত প্রেমের অভিজ্ঞতা পেরিয়ে এক নোতুন অভিজ্ঞতায় উপনীত হল—ঈশ্বর সন্ধানের মহৎ পথে তার নব জীবনে উত্তরণ। সাংসারিক ইতরতা ও স্থূলতা পেরিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র এক শান্ত সৌন্দর্যের জগতে উত্তীর্ণ হন, আমাদের উপন্যাসপাঠের এ এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। আজ এ কথাও স্বীকার্য, জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতই তিনি জীবনের জটিলতাকে নিপুণ শিল্পরূপ দিতে ভালোবাসেন। তার প্রমাণ 'ঝড়'। এ উপন্যাসে চারটি নরনারীর জীবনের জটিলতাকে উপস্থিত করা হয়েছে।

ডস্টয়েভস্কী নানাভাবে ইউরোপীয় উপন্যাসকে প্রভাবিত করেছেন। তাঁর নায়কের অপরাধবোধ ও তার স্বীকারোক্তি, স্বীকৃতি, প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন, যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে মানুষের পাপ থেকে মুক্তি, 'ডাবল-থীম' (double theme) মারফৎ অস্তিত্ব সন্ধান, প্রেয়কে অতিক্রম করে শ্রেয়বোধে যাবার প্রয়াস নানা-ভাবে আধুনিক উপন্যাসের নায়কদের প্রভাবিত করেছে। বাংলা উপন্যাসে তার ব্যত্যয় ঘটেনি। বুদ্ধদেব বসুর 'পাতাল থেকে আলাপ', 'গোলাপ কেন কালো', সমরেশ বসুর 'বিবর', 'প্রজাপতি', 'পাতকে'র প্রসঙ্গে মনে পড়ে ডস্টয়েভস্কীর The Double (1846), Notes from the Underground (1866), Crime and Punishment (1866), The Gambler (1867), The Idiot (1869), The Possessed (1871), Brothers Karamazov (1880), এবং টমাস মানের 'Confessions of a Confidence Man' (Felix Krull, 1954) : এই উপন্যাসগুলিতে মনের গহনে অবতরণ, মানব মনের বিস্ময়কর স্ববিরোধিতা, ব্যক্তিত্বের আত্মসংঘর্ষ, ভালো ও মন্দের প্রতি যুগপৎ প্রবল আকর্ষণ, অপরাধ, অনুতাপ, প্রায়শ্চিত্ত প্রাধান্য পেয়েছে। স্বীকারোক্তি (Confession) এ ধরনের উপন্যাসের মূল থীম। বুদ্ধদেব বসু ও সমরেশ বসুর উদ্ধৃত উপন্যাসগুলিতে স্বীকারোক্তির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। নামগুলিও তাৎপর্যপূর্ণ—'বিবর', 'পাতক' 'পাতাল'—এদের সঙ্গে মিল আছে, ডস্টয়েভস্কীর 'Underground'-এর। বুদ্ধদেব বসু ও সমরেশ বসুর এইসব উপন্যাসে যৌনপ্রবৃত্তি মানবজীবনের সবকিছুর মূলে সক্রিয় বলে

দেখানো হয়েছে। এটাই জীবনের কেন্দ্র, নিয়ন্তাশক্তি—এটি প্রমাণ করার দিকে ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়।

সমরেশ বসু এখানেই থামেন নি, বিবরবাস থেকে তাঁর অচিরেই মুক্তি ঘটেছে। বস্তুত সমরেশের মতো জীবনবাদী শক্তিশালী ঔপন্যাসিকের পক্ষে এই মুক্তি অভিপ্রেত। দুটি সাম্প্রতিক উপন্যাসে তাঁর এই মুক্তি প্রতিষ্ঠিত—'সুচাঁদের স্বদেশ যাত্রা' ও 'মানুষ'। দুটি দু ধরনের উপন্যাস, উভয়এই লেখক জীবনকে খুব গভীরভাবে দেখেছেন।

সুচাঁদের ট্রাজেডি তার একার নয়, বহুর। দেশ ভাগ হল, সুচাঁদ পূর্ব-বাংলা ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় এসে দেখল তারা এখানে অভ্যর্থিত নয়, অনভিপ্রেত, তারা 'রিফ্যুজি' মাত্র। পিছনে যে জন্মভূমি ফেলে এসেছিল সুচাঁদ বুকে বিরাট অভিমান নিয়ে সেখানে ফিরে গেল। কিন্তু পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই সুচাঁদ গ্রেপ্তার হল হিন্দুস্থানের স্পাই বলে। তা হলে সুচাঁদেরা কোথায় যাবে? ঘরেও নহে, পারেও নহে, কোথায় তাদের ঠাঁই? দেশ বিভাগের মর্মান্তিক বেদনা, হতভাগ্য মানুষের মর্মবিদারী ট্রাজেডি এখানে লেখক করুণনিপুণ লেখনীতে উপস্থিত করেছেন। আমাদের জীবনে দেশ বিভাগের মতো যে প্রধানতম ট্রাজেডি ঘটে গিয়েছে, সমরেশ বসু তাকে এখানে শিল্পরূপ দিলেন। দেশ-কালচেতনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রইল এ উপন্যাসে।

কিন্তু 'মানুষ' উপন্যাসেই সমরেশের সাম্প্রতিক শিল্পসাফল্যের উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া গেল। পার্টি-রাজনীতি যে হিংসা ও হত্যাকে প্রশ্রয় দেয়, তা মানুষকে কীভাবে কতোটা ক্ষতিগ্রস্ত করছে—তা তিনি দেখাতে চেয়েছেন 'মানুষ' উপন্যাসে। বরেন গঙ্গোপাধ্যায় 'নিশীথ ফেরী' উপন্যাসে তাকেই দেখেছেন। সমকালচেতনা উভয়েই উপস্থিত। 'নিশীথ ফেরী'তে নায়ক প্রকাশের বিশ্বাস ছিল পার্টি আনবে সুদিন, তার জন্যই একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করল। কিন্তু কোথায় তার উদ্যত প্রশ্নের উত্তর—কেন এই হত্যাকাণ্ড? আর 'মানুষ' উপন্যাসে 'ইনার পার্টি স্ট্রাগলে'র মধ্যে পড়ে মানুষের জীবন নিয়ে যে ছেলেখেলা, রাজনৈতিক হত্যার যে জবাবদিহি, যে শাস্তি ঘটে তা সুজিত ও তার বন্দী ধীরেশের মধ্যে দেখানো হয়েছে। ধীরেশ গাঙ্গুলি একদিন ধ্রুবকে হত্যা করেছিল, আজ তাকে বন্দী করে আনা হয়েছে—হত্যার শাস্তি তাকে পেতে হবে। এই Crime and Punishment-এর আশ্চর্য কাহিনী 'মানুষ'। ভুল বললাম, এ তো ঘটনানির্ভর কাহিনী নয়,

অন্তরে অন্তরে মানুষের সত্তার অনুসন্ধান ; স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের উপস্থাপনা।

শেষ মুহূর্তে কেষ্টদার উদ্যত শাণিত কাটারির মুখে ধীরেশ ভেঙে পড়েছে। স্বীকার করেছে ধ্রুবকে ঈর্ষাবশত হত্যা করেছে। পার্টিতে কেন ধ্রুবর এত জনপ্রিয়তা ? "মারো কেষ্টদা, তোমাদের অমন ভালোবাসার নেতাকে আমি মেরেছি। ধ্রুব কেন এত ভালোবাসার নেতা ছিল, আমি সহ্য করতে পারিনি। সকলের ওপরে থেকেও কোনদিন তোমাদের মধ্যে ঢুকতে পারিনি, তোমাদের সকলের মধ্যে ধ্রুবর মুখ দেখেছি।"

ডস্টয়েভস্কির প্রতিপাদ্য আরেকবার প্রতিষ্ঠিত হল। 'Crime and Punishment'-এর অপরাধের স্বীকারোক্তি, অনুতাপের প্রয়োজনীয়তা এখানে পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত হল। কেষ্টদা ও সুজিতকে নিবৃত্ত করলেন ভগবতীদিদি। উপন্যাসশেষে সুজিত ও ভগবতীদিদির উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ। Confession ও ক্ষমার মহিমায় আলোকিত হয়েছে 'মানুষ' উপন্যাসটি।

সুজিত : 'যে ধীরেশকে আমি নিয়ে এসেছিলাম, এ সে নয়, আমি বুঝতে পারছি। ধ্রুবর জীবনের বিনিময়ে, ও এখন মরতে চায়।'

ভগবতীদিদি : 'না, ধীরেশের মরা চলে না। যখন এখানে আসি তখনো ওকে মানুষ বলে মনে করতে পারিনি, এখন ওকে একটা খাঁটি মানুষের মত লাগছে, যেটা আমরা সবাই হতে চাই, আরো বেশি করে।'

জীবনবাদী মানবপ্রেমিক ঔপন্যাসিক সমরেশ বসুকে এখানেই ফিরে পাই। বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'নিশীথ ফেরী'তে এই প্রশ্ন, এই দাবী নোতুন করে উত্থাপিত।

প্রকাশ ওরফে সুখেন্দু সামন্ত পার্টির নির্দেশে রিভলভার ও কার্তুজ পৌঁছে দিল এস. এস. ওরফে শান্ত-কে। এই পৌঁছে দেবার কাহিনী ও প্রকাশের মানস-প্রতিক্রিয়া—আগামী খুনের অগ্রিম প্রতিক্রিয়া—উপন্যাসটিতে বর্ণিত হয়েছে। প্রকাশের অস্থিরতা, ত্রাস ও চাঞ্চল্য এখানে নিপুণভাবে বিশ্লেষিত।

ডস্টয়েভস্কির 'The Double'-এর থীম ঘুরে ঘুরে এসেছে এদেশে-ওদেশে। বিমল করের 'মৃত ও জীবিত' উপন্যাসে তার এক রূপ দেখি। ঘটনাবিরল চমকবর্জিত অ-নাটকীয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিমল কর এর শিল্পরূপ দিয়েছেন। ট্রিটমেন্টের আধুনিকতা লক্ষ্য করা যায় 'মৃত ও জীবিত' উপন্যাসে। এ উপন্যাসের নায়ক আবীরের সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য পরমার মৃত স্বামীর। এ সাদৃশ্য

নেহাতই কায়িক, মানসিক নয়। এ পর্যন্ত কাহিনীতে লেখকের নিজস্বতা প্রকাশ পায় নি। নিজস্বতা দেখা দিয়েছে এর পর থেকে—আবীর অনুভব করে সে পরমার মৃত স্বামী হয়ে যাচ্ছে, অথবা সেই মৃত ভদ্রলোক আবীর হয়ে উঠছে। অথচ এ উপন্যাসে কাহিনীর সমগ্রতা ও নিশ্চিত উপসংহার নেই। বক্তব্য উপস্থাপনে বিমল করের নিজস্বতা এখানে ধরা পড়ে।

উপন্যাসের শেষাংশে লেখকের অন্তর্বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর মতই তাঁর চরিত্ররা নিঃসঙ্গতাপ্রিয়। মনোবিকলনের পথে, আত্মবিশ্লেষণের পথে, আত্মমগ্নতার পথে এগিয়েছে 'মৃত ও জীবিত' উপন্যাসের আবীর ও পরমা। সমস্ত উপন্যাসটার মধ্য দিয়ে অনতিপ্রচ্ছন্ন বিষাদমিশ্রিত কৌতুক ও নিরাসক্ত জীবনদৃষ্টি প্রবাহিত। এই প্রবাহ শান্ত, স্তিমিত। জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি নানা অনুভূতিতে আবীর বিচলিত, মৃতের প্রতি ক্রোধ ও জিঘাংসা, প্রণয়াস্পদার প্রতি ঘৃণা ও আসক্তিতে আবার বিপর্যস্ত হয়েছে। পরমার মৃত স্বামী-ব্যক্তিটি ছিল হীন প্রকৃতির। পরমার তাকে সহ্য হচ্ছিল না, পরমা তাকে এমন করে মারল যাতে তার আত্মহত্যা ছাড়া উপায় ছিল না। খুন নয়, খুনের নামান্তর। পরমার এই স্বীকারোক্তির পর আবীরের পক্ষে পরমাকে মেনে নেওয়া, মনে নেওয়া সম্ভব ? আবীরের মনে হল, সে যেন পরমার মৃত স্বামী হয়ে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তে আবীরের অন্তর্বিশ্লেষণ আশ্চর্য। "নির্জন পার্কে চাঁদের আলোয় আবীর আচমকা অদ্ভুত, ভীষণ এক লোভ বোধ করল। সে এখানে এই নির্জন স্তব্ধ জনমানবহীন জায়গায় পরমাকে অনায়াসেই খুন করতে পারে। (রেলিঙের পড়ে থাকা) একটা শিক তুলে নিলেই যথেষ্ট। কিন্তু কেন সে খুন করবে ? কেন ? কেন ? আবীরই কি পরমার সেই স্বামী ? না, না, না। পরমাকে কেন আবীর খুন করবে বুঝতে পারল না। অথচ পরমার ওপর তার প্রবল, অজ্ঞাত এক ঘৃণা হচ্ছিল। পার্কের ফটকের সামনে এসে আবীর আচমকা পরমার হাত ধরল। হাত ধরে কাছে টেনে নিল। পরমা আপত্তি করল না। চুম্বন বুঝি কিছু দীর্ঘ হল, এত দীর্ঘ যে একটা পতঙ্গ অন্ধকারে আবীরের কানের ওপর এসে না পড়লে সে বুঝতে পারত না, পরমার ওষ্ঠে আর স্বাদ নেই। রিকশায় পাশাপাশি বসে ফিরে যেতে আবীর দেখল, কী আশ্চর্য, সে পরমার মৃত স্বামী হয়ে যাচ্ছে।...আচমকা আবীর দেখল লোকটা কখন তার মধ্যে এসে গেছে।...না, না, না।...রিকশা ঘুরিয়ে ফিরে যেতে যেতে আবীর ভাবল : সে পরমার মৃত অথবা জীবিত কোনো

স্বামীই হতে চায় না। সে শুধুই আবীর হতে চায়। আর এখন বাড়ি ফিরে যেতে যেতে পরমাকে গুড বাই মিস্টার চিপস করা ছাড়া উপায় নেই।"

বিচ্ছিন্নতাবোধ, নিঃসঙ্গতাবোধ ও বিষাদ অন্তর্সংলাপে বিমল করের উপন্যাসে প্রকাশিত। নিয়ত অতৃপ্ত, আত্মআবিষ্কারে নিরত লেখক বিমল কর বার বার তাঁর উপন্যাসের জাত ও রীতি বদলিয়েছেন। তিন খণ্ড 'দেওয়াল' দ্বিতীয় বিশ্বসমরকালীন কলকাতার পটভূমিতে লেখা মধ্যবিত্ত জীবনের প্রামাণ্য উপন্যাস। বিমল কর এখানে না থেমে নোতুন পথে এগোলেন। ঈশ্বর, নিয়তি, মৃত্যু : এইসব বিষয় তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস-গুলিকে আলোড়িত করেছে। তাঁর ভাষার রোমান্টিক বিষাদময়তার মূলে আছে এই জীবনদৃষ্টি। বিমল কর বিশিষ্টার্থে জীবনরহস্য সন্ধানী শিল্পী। তাই তাঁর উপন্যাসে অন্বেষণবৃত্তিটি প্রবল। তাঁর অন্বেষণ আজও শেষ হয়নি। "খড়কুটো", "পূর্ণঅপূর্ণ", "গ্রহণ", "পরিচয়", "যদুবংশ" (মাঝে একটি নভেলেট 'বালিকাবধূ')—বিমল করের detection শেষ হয় নি। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বিমল কর দু'জনেই জীবনের রহস্য সন্ধান করেন (আবার দু'জনেই গোয়েন্দা গল্পের সার্থক লেখক)। আসল কথা গোয়েন্দাকাহিনীর detection কৌশলটি সদর্থে তাঁরা জীবনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। 'খড়কুটো'য় কৈশোরের পটে প্রেম, ধর্মবোধ, ঈশ্বরচিন্তা "পূর্ণঅপূর্ণে" পরিণত জীবনের পটে অপূর্ণ মানুষের পূর্ণতার অন্বেষণ, "গ্রহণে" মানুষের সঙ্গে মানুষের জটিল সম্পর্কের সুনিপুণ বিশ্লেষণ, "পরিচয়ে" প্রেমের সহজ গভীরতার ছবি, "বালিকা বধূ"তে বাল্যপ্রেমের স্নিগ্ধমধুর কাহিনী ও তার শেষে জীবনের দহন-যন্ত্রণা। বিমল কর সর্বাঙ্গীন আধুনিক ঔপন্যাসিক, তা এসব উপন্যাসে প্রমাণিত।

বিচ্ছিন্নতাবোধ, নৈঃসঙ্গ্য ও বিষাদ আধুনিক জীবনের প্রধান লক্ষণ। আধুনিক উপন্যাসে এই তিন লক্ষণ শিল্পরূপ পেয়েছে। কে রবে এ পরবাসে ?—এই পৃথিবীকে অচেনা বলে মনে হয়েছে। তাই নায়কের আত্মসন্ধান আজ ঔপন্যাসিকেরই আত্মসন্ধান! উপন্যাস আজ লেখকের আত্মপ্রকাশের প্রবলতম বাহন হয়ে উঠেছে। জেমস জয়স, টমাস মান, মার্সেল প্রুস্ত, ফ্রানৎজ কাফকা, অলব্যের কামু, সার্তর্, ফ্রাঁসোআ মোরিআক, আর্নেস্ট হেমিং-ওয়ে, লাকস্‌নেস্, পাস্তেরনাক—এই দশজন ঔপন্যাসিক আধুনিক পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসের প্রধান শিল্পী। এঁদের উপন্যাসের জীবনজিজ্ঞাসা একাধারে বিশ্ব-মানবের আত্মসন্ধান ও লেখকের আত্মাবিষ্কার। এঁদের মধ্যে জাঁ পল সার্তর্

ও অলব্যের কামু-র প্রভাব শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত বাংলা উপন্যাসে অনায়াসলক্ষণীয়।

সার্তর্ যে মতবাদে বিশ্বাসী তার নাম অস্তিত্ববাদ (Existentialism)। সব রকম অনুশাসন, শৃঙ্খলা ও আইনকে অস্বীকার করে অস্তিত্ববাদীরা অস্তিত্বকে মানেন ও তারই নির্দেশে চালিত হতে চান। 'Les chemins de la liberte' শীর্ষক উপন্যাসধারার সার্তর্ অস্তিত্ববাদী নায়ক চরিত্রকে উপস্থিত করেছেন। 'L'age de raison' (1945), 'Le Suris' (1949), 'La Mort dens l'ame' (1950) এই উপন্যাসধারার অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী চতুর্থ উপন্যাসে এ ধারার সমাপ্তি ঘটেছে। মানুষকে বাইরের সকল সামাজিক বাধানিষেধ থেকে মুক্ত করে তার স্বভাবধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়াতেই জীবনের সার্থকতা, এই মনোভাব এখানে সক্রিয়।

অপরপক্ষে অলব্যের কামু-র উপন্যাসে সূচীমুখ বিশ্লেষণে মানুষের নির্মম ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে। স্বীকারোক্তি ও আত্মকথনের ভঙ্গিতে নায়কের জীবনকে, সেই সঙ্গে আধুনিক জীবনকে দেখা হয়েছে। কামু-র 'Le Chute' নামক ফরাসি ভাষায় রচিত উপন্যাসটির ইংরেজী অনুবাদ 'The Fall'। এর নায়ক র্জা ব্যাপতিস্ত ক্লামেন্স আধুনিক মানুষের প্রতিনিধি। এ উপন্যাসে মধ্যবিত্তের যে নির্মম বিশ্লেষণ, তার অন্যায়ের সঙ্গে গোপন আপোস, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় স্থূলতা ও ইতরতার সঙ্গে সহবাস, ভীরুতা, স্বার্থপরতা —সবকিছু ধরা পড়েছে। নায়ক পারীর ভূতপূর্ব ব্যবহারজীবী, বর্তমানে আর্মস্টার্ডামে বাস করে। কুখ্যাত 'মেক্সিকো সিটি' পানশালায় বা জুইডারজী নদীর কুয়াশাঘেরা পথে সদ্য-পরিচিতের কাছে নায়ক তার আত্মকাহিনী বলেছে। তার 'কনফেশনে' ক্লামেন্স আধুনিক মধ্যবিত্ত জীবনের ভণ্ডামি ও নীচতা, নিষ্ঠুরতা ও চরিত্রহীনতা, স্বার্থপরতা ও আদর্শহীনতার নির্মম বিশ্লেষণ করেছে।

নদীতীরে ভ্রমণরত নায়ক সদ্যোপরিচিতের কাছে আত্মোদ্ঘাটন করছে :

The only deep emotion I occasionally felt in these affairs was gratitude, when all was going well and I was left, not only peace, but freedom to come and go never kinder and gayer with one than when I had just left another's bed, as if I extended to all other women the debt I had just contracted towards one of

them. In any case, however, apparently confused my feelings were, the result I achieved was clear : I kept all my affections within reach to make use of them when I wanted. On my own admission, I could live happily only on condition that all the individuals on earth, or the greatest possible number, were turned towards me, eternally unattached, deprived of any separate existence and ready to answer my call at any moment, doomed in short to sterility until the day I should deign to favour them. In short, for me to live happily it was essential for the individuals I chose not to live at all. They must receive their life, sporadically, only at my bidding.

কামুর নায়কের এই নির্মম অকুণ্ঠ আত্মবিশ্লেষণ সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে নায়কদের স্বীকারোক্তির প্রেরণা জুগিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

চার

প্রবন্ধ-সূচনায় হুমায়ুন কবিরের যে বক্তব্য উদ্ধার করেছি, তার প্রথম বাক্যটি এই—'সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে যে চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ, তা পৃথিবীব্যাপী অসন্তোষ ও বিদ্রোহের প্রতীক।' এই চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভে সবচেয়ে বেশি আন্দোলিত স্পন্দিত বিক্ষুব্ধ হয়েছে সমাজের তরুণ সম্প্রদায় (angry generation) এই সম্প্রদায়কে নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন আমাদের লেখকরা: বিমল কর (যদুবংশ), রমাপদ চৌধুরী (এখনই), স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় (আঁধি), গৌরকিশোর ঘোষ (আমরা যেখানে—দু'টি পর্বে বিভক্ত: বাঘবন্দী ও তলিয়ে যাবার আগে) ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (স্রোতের সঙ্গে)। হতাশাক্লিষ্ট উদ্‌ভ্রান্ত ক্ষুব্ধ আত্মঘাতী সুস্থতাবিরোধী তারুণ্যের জ্বলন্ত ছবি এইসব উপন্যাস। 'যদুবংশে'র সূর্য, বুল্‌লি, মালা, 'এখনই'-এর উর্মি, টিকলু, অরুণ, রুণু, অথবা অপর তিন উপন্যাসের চরিত্রগুলি বিপথগামী তরুণ, একথা বলাই যথেষ্ট নয়। লেখকরা তাদের মাঝে জীবনানুরাগের স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে দেখেছেন। সূর্য বুল্‌লি টিকলু অরুণরা পুরোপুরি নষ্ট নয়, তারাও

অন্তরে অন্তরে সুস্থতা ও শুদ্ধতার প্রার্থী। সমাজের আত্মপ্রতারণা, অনাচার, ক্লীবত্ব ও মনুষ্যত্বের অবমাননার জ্বলন্ত ছবি 'আমরা যেখানে'। এ উপন্যাসে মনুষ্যত্ব বিবেকবুদ্ধি ও শুভবোধ প্রথম 'ক্যাজুয়াল্‌টি'। এই পঞ্চ-উপন্যাস সময়ের খরস্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে। আমরা এদের সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারি না, অথচ অস্বীকার করতে পারি না। 'এখনই' উপন্যাসের ফলশ্রুতি তারুণ্যের বিচ্ছিন্নতাবোধ, সেই সকল শুভবোধের অবসান। উপন্যাসের শেষে চরিত্রের মুখে এই সত্যই উচ্চারিত : "আমরা গাছ। কথা বলতে পারি না। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি। বনের মত, ঝোপের মত। এক হতে পারি না। আমরা কাছাকাছি থেকেই পরস্পরের অচেনা। কেউ কাউকে বুঝি না। লোকে বলে সমাজ সংসার প্রেম বিবাহ। সব মিথ্যে। আমরা সব সময়েই একা। প্রতিটি মুহূর্ত।"

'পথের পাঁচালী' বেরুবার পঁয়তিরিশ বছর পরে বেরুল রমাপদ চৌধুরীর 'বনপলাশির পদাবলী'। দু'য়ে কতো মিল, আবার কতো অমিল! বিভূতি-ভূষণের মোহমুগ্ধতা রমাপদর নেই, কাল ও বস্তুচেতনায় নির্ভরশীলতা আছে 'বনপলাশির পদাবলী'তে। পথের পাঁচালীর সঙ্গে বনপলাশির পদাবলীর নামে ও বিষয়ে কিছুটা মিল আছে কিন্তু ট্রিটমেণ্টে সম্পূর্ণ অমিল। গ্রাম নিয়ে লেখা এই উপন্যাসের আধুনিকতা লেখকের জীবনদৃষ্টিতে। এই উপন্যাস-টিকে ভুলতে পারি না। বার বার এর পরিবেশ ও চরিত্রগুলি মনে ভীড় করে আসে।

কিন্তু সন্তোষকুমার ঘোষ? তিনি জটিল কালের শিল্পী, পুরোপুরি আধুনিক শিল্পী। জীবনের সত্য তিনিও অন্বেষণ করেন। সন্তোষকুমার detection-এ আনন্দ পান, তা সরল জীবনের নয়, জটিল জীবনের। তাঁর শাণিত লেখনী নির্মোহ বিজ্ঞানীর বা নিরাসক্ত দার্শনিকের। মধ্যবিত্ত সমাজের মর্ম ও অস্তিত্বকে ঐ লেখনীতে ব্যবচ্ছেদ করেছেন। প্লটে অনাগ্রহ,—কি বয়নে, কি পরিণতিতে; আগ্রহ তীক্ষ্ণ সূচীমুখ বিশ্লেষণে। নিয়ত পরীক্ষায় অস্থির। তাই 'কিনু গোয়ালার গলি' বা 'নানা রঙের দিন' পেরিয়ে চলে আসেন 'মুখের রেখা'য়, সেখান থেকে 'জল দাও' 'ত্রিনয়ন', 'স্বয়ংনায়ক', 'শেষ নমস্কার'-এ। আধুনিক উপন্যাসের নিশ্চিত লক্ষণ তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস-গুলিতে বর্তমান—নিজেকে নিয়ে শিল্পবিচার, জীবনবীক্ষা, অস্তিত্বের অন্বেষণ, detection। 'ত্রিনয়নে'র নায়ক নিরঞ্জন সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধকে বিসর্জন

দিয়ে জীবনে উন্নতির চেষ্টা করছে, তার জন্য পত্নী ও প্রণয়িনীকে ব্যবহার করতে তার দ্বিধা নেই। কিন্তু সে কোথায় গিয়ে পৌঁছল? এখানেই লেখকের শিল্পদৃষ্টি, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের সূচীমুখে তিনি নিরঞ্জনের মানসত্তাকে ব্যবচ্ছেদ করে দেখিয়েছেন। 'স্বয়ংনায়কে'র শিল্পরীতি অভিনব। দীর্ঘ শিল্পবদ্ধ কাহিনী নেই, নেই স্থিরবদ্ধতা, আছে নাট্যবন্ধে গ্রথিত স্মৃতি-নির্ভর আলেখ্য-মালা। এই মালা গেঁথেছেন লেখক। আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে রচিত ও সুনির্দিষ্ট সময়ধারায় গ্রথিত আত্মরূপের বিচিত্র জটিল অধিকার। গল্পবয়নে লেখকের সামর্থ্য ও নাট্যরূপের আড়ালে আত্মগোপনের ছদ্মপ্রয়াস থেকে মনে হয় নানা অভিজ্ঞতাকে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে অন্বিত করা লেখকের অভি-প্রেত নয়। বিভ্রান্ত অস্থির নায়কের অন্মোদ্‌ঘাটনই লক্ষ্য। জীবনের শূন্যতা ও অন্ধকার, ব্যর্থতাবোধ ও আশাভঙ্গ এই উপন্যাসকে গ্রাস করেছে। এই অন্ধকার ও শূন্যতা সত্ত্বেও লেখক জীবনকে গভীরভাবে ভালবাসতে চেয়েছেন। এই উপলব্ধিতে এর সমাপ্তি। 'শেষ নমস্কার'-এর নায়ককে কখনই 'পথের পাঁচালী'-র নায়ক বলে ভুল হয় না, কারণ দু'জনের জীবনকে দেখার মধ্যে অমিল এত বেশি যে, মনে হয় দু'জনে দুই কালের অধিবাসী; ব্যবধান চল্লিশ বছরের নয়, কালান্তরের। প্রথমজনের রোমাণ্টিক জীবনদৃষ্টি থেকে দ্বিতীয়জন সরে গেছে, তার আছে অন্ধকার ও শূন্যতা।

'শেষ নমস্কারে'র নায়কের মাতৃ-অন্বেষণ ওরফে জীবনের সত্য-স্বরূপ অন্বেষণ কখনো শেষ হয় না। আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে রচিত এ উপন্যাসের শেষে নায়কের কণ্ঠে তাই শুনতে পাই আর্ত হাহাকার:

"সেই থেকে তোমাকে খুঁজছি। কোথায় নয়, বলো?...মা, সেদিন বিজয়া গেল, আজ কোজাগরী। মধ্যযামেও জেগে জেগে এই 'শ্রীচরণেষু'র পাঠশেষ করে দিচ্ছি...আসলে জানতাম না, এই লেখা শেষ না হলেও কোনও ক্ষতি ছিল না। 'শ্রীচরণেষু' পাঠটা এতই কি আবশ্যক ছিল, যার পাতায় পাতায় মায়ার সঙ্গে এত কালো কালো ছায়া, আত্ম-উন্মোচনের পর্বে পর্বে এত আত্মগ্লানি? যদি অসমাপ্ত থাকত? থাকতই বা।...জিজ্ঞাসার কাজ কী। বরং খুঁজে চলি। তোমাকেই কি? হয়ত না, একমাত্র তোমাকে না, তোমার সঙ্গে এক করে—তাঁকে। জীবনের যিনি মূল, আর মূলাধার যিনি, একসঙ্গে উভয়কে। 'সব স্তর পার হয়ে সবশেষে ওই একটা খোঁজাই বুঝি বাকী থাকে। মা তাই না?"

॥ পাঁচ ॥

তরুণতর গোষ্ঠীর ঔপন্যাসিকদের কথায় আসার আগে মনে পড়ে চারজন প্রবীণ স্বাতন্ত্র্যবাদীর নাম : কমলকুমার মজুমদার, অসীম রায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, দীপক চৌধুরী।

কমলকুমার মজুমদার নোতুন ভাষারীতি উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর ভাষারীতি নিয়ে তর্কের শেষ নেই। তা কি প্রগতি, না, পশ্চাৎগতি? ভাষা কি অলংকারপ্রসাধন, না, উপন্যাসের অবিচ্ছিন্ন অবয়বাংশ? পুরনো পদান্বয় ও বাক্যরীতির পুনরুজ্জীবনে যে চৎমকারিত্ব আছে, জীবনের জটিলতা ও আধুনিকতার উদ্‌ঘাটনে তা কতটা সাহায্য করে? 'অন্তর্জলী যাত্রা', 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক' উপন্যাসে কমলকুমার মৃত্যু ও জীবনকে যে শিল্পরূপ দিতে চেয়েছেন, তাতে এই ভাষারীতি অনিবার্যভাবে আবশ্যক কিনা তা বিচার্য।

অসীম রায় নিঃসন্দেহে সদর্থে আধুনিক। 'গোপাল দেব', 'রক্তের হাওয়া', 'শব্দের খাঁচায়' উপন্যাসগুলিকে অগ্রাহ্য করায় পাঠকের মূর্খতা প্রকাশ পায়, পরিণত বিচারবোধের পরিচয় দেওয়া হয় না। জীবন সম্পর্কে কেবল একটি দৃষ্টিভঙ্গি নয়, একটি বিশেষ দর্শন অসীম রায় উপস্থিত করতে চেয়েছেন।

অমিয়ভূষণ মজুমদার এমন এক বিশিষ্ট শক্তিশালী জীবনশিল্পী, যিনি নিয়ত অতৃপ্ত। 'নীল ভুঁইয়া' বা 'গড় শ্রীখণ্ড'-এ তিনি থেমে যান নি, 'মধু সাধু খাঁ ('সারস্বত প্রকাশ'-এ প্রকাশিত) নামক নভেলেট ও 'চাঁদ বেনে' নামক বিশাল ত্রিলেখ-উপন্যাসে (বসুধারায় প্রকাশিত ট্রিলজি) তিনি শিল্পসামর্থ্যের নোতুন পরিচয় দিয়েছেন।

দীপক চৌধুরী নাম করেছিলেন 'পাতালে এক ঋতু' (দু'খণ্ড) উপন্যাস লিখে। তা নিয়ে প্রচুর নিন্দা ও প্রশংসা পেয়েছিলেন যতটা না শিল্পসামর্থ্যের জন্যে তার চেয়ে বেশি বিষয়বস্তুর জন্যে। কমিউনিজম-বিরোধিতা এই উপন্যাসের থীম্। কিন্তু এতে লেখকের যে অসামান্য রচনাশক্তির পরিচয় আছে তা অবশ্যস্বীকার্য। পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে দীপক চৌধুরীর শক্তি তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত। 'এই গ্রহের ক্রন্দন', 'ললিতা প্রসঙ্গ', 'খড়িমাটির স্বর্গ' প্রভৃতি উপন্যাসকে লেখকের তীব্র সমাজবোধ. সুতীক্ষ্ণ জীবন-পর্যালোচনা ও গভীর জীবনবোধ ব্যক্ত হয়েছে তীক্ষ্ণ ভাষায়। দীপক চৌধুরীকে বলা

যায় মননদীপিত ঔপন্যাসিক, যিনি বর্তমান মুহূর্তে মানুষের সকল সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন।

অসীম রায়ের 'গোপালদেব' উপন্যাসে উপস্থাপিত জীবনদর্শন প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে লিখেছিলেন :

'ভাবছি এবারে অসীম রায় জীবনে ঝাঁপ দেবেন কোথায় কোন্ পাড় থেকে, একক ও ভীড়ের কোন্ সম্বন্ধপাতের বাঁকে কোন্ জোয়ার-ভাঁটায়? গোপালদেবের তীব্রতার রেশ মনে নিয়ে ভাবছি কেন সহস্রবাহু জীবন গোপালদেবকে, আমাদেরও, এড়িয়ে যায়—রেখে যায় শুধু নয়নের মতো আশ্চর্য করুণ একজোড়া মাত্র বাহু, যে নয়ন নায়কের কাছে দামিনীর মতো আশ্চর্য প্রাণশক্তির এক করুণ ব্যক্তিস্বরূপ?

'গোপালদেব' যেন 'একালের কথা'র অভিজ্ঞতা পার হয়ে এসেছে, কিছুটা জিতে, কিছুটা হেরে, কিছুটা পরিপাক করে, কিছুটা বাদ দিয়ে। সে চায় জীবনের চেহারাটা ধরতে, তার জীবনে ভীড় করে আসা জীবনের নানা দাবিকে মেটাতে, আত্মরক্ষা করে তার রূপটাকে ধরতে।' [মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা]

কমলকুমারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' পড়লে স্বীকার করতে হয় এই ভাষারীতি উপন্যাসের শিল্পবক্তব্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত। অষ্টাদশ শতকের জীবনযাত্রা ও মূল্যবোধের উপস্থাপন ও পুনর্মূল্যায়নে এই ভাষারীতি বিশেষ সহায়ক হয়েছে। বর্ণন ও কথোপকথনের মধ্যে বর্ণনা-অংশে লেখক চিত্র-রচনা করেছেন। এই চিত্রনির্মাণে পাঠকের কোনো ভূমিকা নেই, সে বাইরে থেকে ছবি দেখে। এই ছবি তৈরী করছেন লেখক তাঁর বর্ণ-সম্পাতে। কিন্তু চিত্রের খাতিরে কমলকুমার মজুমদার গদ্যের জাত খোয়ান নি। তিনি কাব্যধর্মী গদ্য লেখেন নি বা কথাভঙ্গির হুবহু নকল করেন নি। কথ্যরীতির ছন্দকে গ্রহণ করে চিত্রধর্মী গদ্য রচনা করেছেন এবং তা আপন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। এই উপন্যাসে আখ্যান ও সূক্ষ্ম অন্তর্মুখীন মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের স্থান নিয়েছে চিত্র। এই চিত্রের দ্বারাই কমলকুমার তাঁর শিল্প-উদ্দেশ্য হাসিল করেছেন—জটিল লোকাচার দৈববিশ্বাস ধর্ম-রহস্য ও জীবনরহস্যে ভরা এক জগতের দ্বার খুলে দিয়েছেন।

আঞ্চলিক উপন্যাসের ধারাটি সাম্প্রতিককালে থেমে যায় নি। তার প্রমাণ 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়), 'শতকিয়া'

(সুবোধ ঘোষ), 'কেয়াপাতার নৌকা' (প্রফুল্ল রায়), 'ওরা কাজ করে' (প্রভাত দেব সরকার), 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (সতীনাথ ভাদুড়ী)।

রোমান্টিক উপন্যাসের ধারা কি ফিরে এলো ? 'বালিকা বধূ' নভেলেট (বিমল কর), 'যার যা ভূমিকা' (সমরেশ বসু), 'তুমি কে ?' (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) পড়ে তা মনে হয়। তবু পুরনো রোমান্টিক উপন্যাস (মণীন্দ্রলাল বসু, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের প্রথম পর্বের উপন্যাস) থেকে এগুলি স্বাদে অভিজ্ঞতায় দৃষ্টিতে ভিন্নতর।

স্বাধীনতার ঠিক পরেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের নামে যেসব টানা বড়ো গল্প প্রকাশিত হচ্ছিল, ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে তার দম ফুরিয়ে যাচ্ছে। সেগুলির না আছে ইতিহাসে নিষ্ঠা, না আছে জীবনবোধ। অবশ্যই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, কনিষ্ক, বারীন্দ্রনাথ দাশ, রমাপদ চৌধুরী উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন।

॥ ছয়

যে তরুণতর গোষ্ঠী আজ বাংলা উপন্যাসক্ষেত্রে আবির্ভূত, প্রবীণদের দায়িত্বভার গ্রহণের উপযোগী জীবনবোধ ও শিল্পসামর্থ্য তাঁরা ইতঃমধ্যেই অর্জন করেছেন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু ঘোষ, কবিতা সিংহ, মহাশ্বেতা দেবী ইতঃমধ্যেই প্রমাণ করেছেন যে, তাঁরা বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করতে এসেছেন।

এদের সম্পর্কে প্রথম কথা, কেউ কারুর মতো লেখেন না, প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত, আপন জীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত। যে বিষয় নিয়েই তাঁরা লিখুন না কেন, তাঁরা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষভাবে বিশিষ্ট ও ব্যক্তিগত, মানসতার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। দ্বিতীয় কথা, উপন্যাসের প্রকরণ ও কাঠামো সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিজস্ব পথ আবিষ্কারে ব্রতী। জটিল মানবমনের চোরাগলিতে তাঁরা

আলো ফেলেছেন নিজস্ব রীতিতে। তৃতীয় কথা, এঁরা স্পষ্ট উপলব্ধি করেছেন, আধুনিক লেখকের আত্মপ্রকাশের সবচেয়ে শাণিত অস্ত্র উপন্যাস, কারণ এখানে তাঁরা প্রধান চরিত্র রূপে নিজেকে উপস্থিত করতে পারেন। আত্মাভিমানী, সমাজের সঙ্গে নিয়ত সংঘর্ষরত শিল্পীর অনিবার্য বিচ্ছিন্নতাবোধ ও শূন্যতাবোধ এবং তা অতিক্রমণের সংপ্রয়াস এঁদের অন্তর্মুখী করে তুলেছে। তার ফলে টানা বড়ো গল্প লেখায় এঁদের উৎসাহ নেই, নিটোল পরিণতি-বিশিষ্ট কাহিনীবয়নে আগ্রহ নেই, প্লটের জাদুতে ঔৎসুক্য নেই, ঔৎসুক্য আছে জীবনে, অস্তিত্বের চরিতার্থতা সন্ধানে, অন্তর্মনের গভীরে নিঃসঙ্গ অভিযাত্রায়।

এইসব লক্ষণ নিশ্চিতভাবে আধুনিক শিল্প সৃষ্টির লক্ষণ। বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, রমাপদ চৌধুরী, সতীনাথ ভাদুড়ী, সমরেশ বসু, কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাসে এইসব লক্ষণ পূর্বেই দেখা গেছে। তরুণতর লেখকদের মধ্যে তা আরো স্পষ্ট। এখান থেকেই তাঁদের যাত্রা শুরু, পুরনো রীতি-পদ্ধতি অতিক্রম করেই তাঁরা লিখতে শুরু করেছেন।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণপোকা' ও 'পারাপার'-এ এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত। এ দু'টি উপন্যাসে শীর্ষেন্দু প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, 'মানুষের চারদিকে যেমন একটা বাইরের জগৎ রয়েছে, ঠিক তেমনই বিপুল একটা জগৎ রয়েছে তার ভিতরেও। বাইরের জগতের কথাই হচ্ছে নিছক গল্প, আর ভিতরের জগতের কথা মনন।' এই মননকে তিনি শিল্পরূপ দিতে চেয়েছেন। আর সে কারণেই পুরনো রীতি, প্রকরণ বিন্যাস ও বিষয় ত্যাগ করেছেন।

তাঁর কাছে বহির্মুখীনতার চেয়ে প্রার্থিত অন্তরলোক। তাই তাঁর উপন্যাসে স্ব-কৃত আত্মপ্রতিকৃতির প্রক্ষেপ ঘটেছে। স্বীকারোক্তিমূলক আত্মকথনকে তিনি আশ্রয় করেছেন। 'ঘুণপোকা'য় যেসব চরিত্র দেখা দিয়েছে, তারা স্বীকারোক্তি ও আত্মমগ্নতার মধ্য দিয়ে আত্ম-আবিষ্কার করতে পেরেছে। তা স্পষ্টতর হয়েছে 'পারাপার' উপন্যাসে। ললিত রমেন বিমান তুলসী আদিত্য—এইসব চরিত্র আত্মসন্ধানে বেরিয়েছে। এরা প্রত্যেকেই অন্তর্মুখী। এদের চেতনাপ্রবাহে তির্যক বা বিকৃতভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে সমাজ ও বাস্তবের খণ্ডিত দৃশ্য, কিন্তু অন্তর-উন্মোচনই তাদের লক্ষ্য, সমাজ ও বাস্তব দৃশ্য নয়। ললিতের সঙ্গে রমেনের, কি তুলসীর সঙ্গে আদিত্যর, কি ললিতের সঙ্গে বিমানের কোনো মিল নেই, থাকতে পারে না, সমাজে তারা পরস্পরের

কাছাকাছি বন্ধু, কিন্তু অন্তরে তারা সবাই নিঃসঙ্গ। আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়াসই তাদের জীবনের প্রথম ও শেষ কথা। 'পারাপার' নামটিও ব্যঞ্জনাগর্ভ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শীর্ষেন্দুর তুলনায় অনেক বেশি লিখতে পারেন। 'যুবকযুবতীরা', 'আত্মপ্রকাশ', 'সুখঅসুখ', 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'হৃদয়ে প্রবাস', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'সরল সত্য', 'জীবন যে রকম'—বছর তিনেকের মধ্যে আটটি উপন্যাস। সুনীলের সৃষ্টিপ্রাচুর্য ও শিল্পসামর্থ্যের পরিচায়ক এই ঘটনা। এর মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ 'আত্মপ্রকাশ'—এর মূল কথা স্বীকারোক্তি—হারানো সরলতাকে ফিরে পাবার জন্য প্রয়াস এবং হাহাকার। নানা টুকরো ঘটনার বিচ্ছিন্ন স্রোতের মধ্য দিয়ে উপন্যাস এগিয়ে চলে; আখ্যান নয়, প্রসঙ্গের প্রাধান্য; সবকিছুকে টেনে চলেছে নায়ক। মানতেই হয়; সুনীল শীর্ষেন্দুর মতো সর্বাঙ্গীন আধুনিক নন, প্রকরণগত আধুনিকতা তাঁর উপন্যাসে নেই, প্রসঙ্গনির্ভর চরিত্রের মেলা আছে, ভাষার জাদু আছে, গল্পের টান আছে (স্বীকার না করলেও আছে), আর সেকারণেই সুনীলের উপন্যাস জনপ্রিয় হয়েছে, আরো হবে, যে জনপ্রিয়তা শীর্ষেন্দুর নেই। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি ছেলে কী ভাবে নির্মম হৃদয়হীন সংসারের সঙ্গে যুদ্ধে নিয়ত ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, তা 'আত্মপ্রকাশে' দেখা যায়। সূক্ষ্ম অনুভূতি, সারল্যের সততা, সৌন্দর্যের জন্য ব্যাকুলতা কীভাবে সমাজে দলিত পিষ্ট হয় তা'ই সুনীল দেখিয়েছেন। তাঁর পদ্ধতি স্বীকারোক্তিমূলক (confession), অভিজ্ঞতাই তাঁর প্রধান সম্বল তাকেই তিনি শিল্পরূপ দিয়েছেন। 'আত্মপ্রকাশে'র নায়কের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ও মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলার কাহিনীতে এমন একটা আন্তরিকতা ও টান আছে যা পাঠককে মুগ্ধ করে।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নিশীথ ফেরী'র আলোচনা পূর্বেই করেছি। নায়ক প্রকাশের অস্থিরতা, ত্রাস, চাঞ্চল্য—আগামী খুনের অগ্রিম প্রতিক্রিয়া—বরেন দেখিয়েছেন। দলীয় রাজনীতির আবর্তে ব্যক্তির দিশাহারা অবস্থাটি 'নিশীথ ফেরী'তে চিত্রায়িত। 'ব্যক্তির অন্তর্জগতের পঙ্কিলতা, অস্থিরতা, অস্তিত্বচিন্তা প্রভৃতির সঙ্গে বাইরের নিয়মের যে দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই ব্যক্তি স্পষ্ট হয়'—এই বিশ্বাস এখানে রূপায়িত।

সুনীলের মতো শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রধান সম্বল অভিজ্ঞতা। 'বৃহন্নলা', 'অনিলের পুতুল', 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসে মানুষের বিশ্বাস

হারানোর ও ফিরে পাবার অন্তর্মুখী কাহিনী। কুবেরের জীবনে স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্নকে সফল করার জন্য সারা জীবন ধরে সে চেষ্টা করেছে। যখন সে সাফল্যের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত তখন কুবেরের উপলব্ধি ঘটল, এ তার প্রার্থিত ছিল না। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে কুবের দোলায়িত হয়েছে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গ্রামাঞ্চলের মাটি থেকে সে উঠে এসেছে, বিচিত্র মানুষ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সে জীবনের সত্যকে অন্বেষণ করেছে। জীবনের মর্মমূলে সে পৌঁছতে চেয়েছে। শ্যামলের অন্বিষ্ট বিশ্বাস, তাকেই তিনি খুঁজে চলেছেন।

মতি নন্দী আর এক অন্তরান্বেষী তরুণ ঔপন্যাসিক। তাঁরও মূল কথা অন্বেষণ। 'দ্বাদশ ব্যক্তি', 'নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান' 'দুঃখের বা সুখের জন্য' উপন্যাসে মতি নন্দী সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছেন। শীর্ষেন্দুর মতো তিনি গভীরে যেতে চান, কিন্তু তাঁর পদ্ধতি স্বতন্ত্র। 'দুঃখের বা সুখের জন্য' উপন্যাসের নায়ক নিখিল। আধুনিক জীবনের জটিলতা, অনিশ্চয়তা ও সংশয় পদে পদে তাকে অংকুশাহত করেছে। আধুনিক জীবনের ট্র্যাজেডি লুপ্তপ্রায় মানবিক মূল্যবোধের পুনঃ প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াস—নিখিলের জীবনে 'হারানো পিলার' নোতুন করে স্থাপনের প্রয়াস। আধুনিক জীবনের বিচ্ছিন্নতাবোধ ও শূন্যতাবোধ মতি নন্দী এখানে নিপুণভাবে রূপায়িত করেছেন।

দিব্যেন্দু পালিত সর্বাঙ্গীন আধুনিক ঔপন্যাসিক। তার পরিচয় পাই 'সিন্ধু বারোয়াঁ', 'শীত গ্রীষ্মের স্মৃতি', 'মধ্যরাত', 'ভেবেছিলাম' উপন্যাসে। আধুনিক উপন্যাসের অনিবার্য লক্ষণ—ঔপন্যাসিকের আপন অস্তিত্বের চরিতার্থতা সন্ধান—দিব্যেন্দুর উপন্যাসে অনায়াসলক্ষণীয়। বিচ্ছিন্নতাবোধ ও শূন্যতাবোধ অতিক্রমণের ব্যর্থ প্রয়াস 'মধ্যরাত' ও 'ভেবেছিলাম'-এ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আসলে এ দু'টি উপন্যাসে, লেখকই প্রধান চরিত্র। 'মধ্যরাতে'র নায়িকা তপতী আসলে লেখক-চরিত্রের প্রতিফলন,-'ভেবেছিলাম'এ লেখক চরিত্র সরাসরি উপস্থিত। নির্মম উদাসীন সমাজপরিবেশে নায়কের ব্যর্থতা, বিদ্রোহ ও জীবনের অর্থহীনতা-উপলব্ধি এ উপন্যাসে সংযতভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। সংশয় ও ব্যর্থতাজনিত উপলব্ধির পটে নায়কের আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়াসরূপে 'ভেবেছিলাম' উল্লেখ্য উপন্যাস। সম্পূর্ণ ভিন্নতর দৃষ্টিতে ও রীতিতে ধনঞ্জয় বৈরাগী আত্ম-আবিষ্কারের আলেখ্য রচনা করেছেন 'নুনের পুতুল সাগরে' উপন্যাসে। এখানে নায়ক প্রতিষ্ঠিত লেখক তাঁর জীবনের সত্য

অন্বেষণ detection-এর পর্যায়ে উন্নীত, অপরদিকে উদ্ধত উদ্‌ভ্রান্ত তারুণ্য খুঁজে বেড়িয়েছে চরিতার্থতার ক্ষেত্র।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি। বিদ্রোহ, ক্রোধ, অস্বীকৃতি, সংশয়কে রূপ দিয়েছেন 'বন্যা', 'জলতরঙ্গ', 'কিংবদন্তীর নায়ক' উপন্যাসে। সিরাজ সময়কে স্পর্শ করে লেখেন, যেমন করেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। অথচ দু'জনের প্রকরণপদ্ধতি আলাদা। ঘটনাস্রোতে তিনি নিজেকে ঢেলে দেন না, ঘটনাকে ছাড়িয়ে চরিত্রের অন্দর মহলে অন্বেষণ করে ফেরেন সত্যকে। বাইরের ঘটনা তাঁর চোখে, নায়কের জীবন বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে, অন্য রূপ পায়। 'বন্যা', 'জলতরঙ্গ' নামের আড়ালে বস্তুপুঞ্জের আলোড়ন নয়, মনোগহনের গভীর আলোড়ন দেখা যায়।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিশিষ্ট তরুণ ঔপন্যাসিক। 'সমুদ্র মানুষ', 'বিদেশিনী', 'নগ্ন ঈশ্বর', 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে এক নোতুন অভিজ্ঞতার দুয়ার খুলে দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে এমন একটা স্বাদ আছে যা আর কোন সাম্প্রতিক উপন্যাসে পাই না। জীবিকার বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁকে সাহায্য করেছে। জাহাজী জীবন ও সমুদ্র-জীবন তাঁকে দিয়েছে বিশিষ্টতা। সেই সঙ্গে পূর্ববাংলার গ্রামজীবন সম্পর্কে সীমাহীন মমতা। আর, এক ঈশ্বরপ্রতিম প্রবীণ চরিত্র তাঁর উপন্যাসে ঘুরে ঘুরে দেখা দেয়, যাকে ঘিরে অগাধ রহস্য। জীবন সম্পর্কে সীমাহীন মমতা ও রহস্যবোধ অতীনের উপন্যাসে এমন এক বাতাবরণ গড়ে তুলেছে যা আমাদের কখনই অন্যমনস্ক থাকতে দেয় না। বিচ্ছিন্নতাবোধ বা নিঃসঙ্গতাবোধ ঐ ঈশ্বরপ্রতিম প্রবীণকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। অতীন এই ধরনের চরিত্রকে বাস্তব অভিজ্ঞতালোকের মাঝেই তুলেছেন।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ('তৃতীয় ভুবন'), দেবেশ রায় ('অস্তিত্বের গণিত'), শক্তি চট্টোপাধ্যায় ('কুয়োতলা'), তরুণতর গোষ্ঠীভুক্ত ঔপন্যাসিক রূপে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অপরদিকে অভিজ্ঞতায় ঈষৎ প্রবীণ শিল্পকর্মে নবীন শিল্পীরূপে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেন সুধাংশু ঘোষ (ফানুসের উপমা), মহাশ্বেতা দেবী (কবি বন্দ্যঘাটি গাঞির জীবন ও মৃত্যু, সুভগা বসন্ত, আঁধার মানিক), কবিতা সিংহ (সোনা রুপোর কাঠি, পাপ পুণ্য পেরিয়ে), লোকনাথ ভট্টাচার্য (ভোর)। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (নগর পারে রূপনগর), প্রফুল্ল রায় (এখানে পিঞ্জর)।

বাংলা উপন্যাসে নিশ্চিত পদক্ষেপে পালা বদল হচ্ছে, একথা জোর দিয়ে বলতে পারি। আধুনিকতার সমস্ত লক্ষণই ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছে। পূর্ণ সাফল্য এখনো অনায়ত্ত, কিন্তু তার দূরবর্তী মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। নবীন প্রবীণ ঔপন্যাসিকেরা নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছেন, লেখকের আত্ম-প্রকাশের সবচেয়ে শাণিত অস্ত্র উপন্যাস। সে অস্ত্রের ব্যবহারে নৈপুণ্য দেখা যাচ্ছে, তাতে আমার অন্তত সংশয় নেই।

স্বৈরবৃত্ত কাল, বাংলা ছোটগল্প

॥ এক ॥

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম পাদ অতিক্রান্ত হতে চলল। এই সময় বড়ো অস্থির, বড়ো চঞ্চল; তা কখনো উন্মার্গগামী, কখনো সুস্থতার অন্বেষী। এই স্বৈরবৃত্ত কালের ছোটগল্প স্বভাবতই চঞ্চল, অস্থির, জিজ্ঞাসু।

এই পর্বে কিছু লেখক বাংলা গল্পে খাত-বদলের প্রয়াস করেছেন। মানুষের চারদিকে যেমন একটা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ বাইরের জগৎ রয়েছে, তেমনি ভিতরেও একটা অচেনা বিপুল জগৎ রয়েছে। এ সম্পর্কে সচেতনতা এই পর্বের বাংলা গল্পে লক্ষ্য করা যায়। তাই বাংলা ছোটগল্পে আজ এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বহির্লোক থেকে ভিতর-দেহলিতে প্রত্যাবর্তনের এই প্রয়াস ছোট-গল্পকে করে তুলেছে অন্তর্মুখীন, মননপ্রধান, নিছক গল্প-উপাদান সম্পর্কে উদাসীন, অন্তর-উন্মোচনে ব্যাকুল। পঞ্চাশের ও ষাটের দশকের বাংলা গল্পের আলোচনায় এই পটভূমি মনে রাখতে হয়।

কিন্তু গল্পে খাত-বদলের প্রয়াস, আর সে প্রয়াসের সাফল্য—দুই এক নয়। এ দু'য়ের মধ্যে ফারাক বিস্তর। খাত-বদলের আগে জানা চাই পুরনো খাতের প্রকৃতি, চরিত্র, গভীরতা। তবে না নোতুন খাতে জীবনের তরণী ভাসবে!

নোতুনকে চেনার আগে চাই পুরনোকে ভালো করে জানা। সে পরিচয়ের উপর নির্ভরশীল নোতুনের সন্ধান।

১৯২১ থেকে ১৯৭০: অর্ধশতাব্দ যাবৎ যিনি গল্প লিখছেন, কল্লোল-গোষ্ঠীর সেই অক্লান্ত জীবনসন্ধানী রূপকার শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভাবনায় ছোটগল্প কোন্ রূপে ধরা দিয়েছে? তাঁর কথায়, তিনি লিখে চলেছেন সমস্ত খণ্ডকালকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে। ক্রমবাহিতার সঙ্গে তাল রেখে।

ছোটগল্পে কী পাই?

এ প্রশ্নের উত্তরে অচিন্ত্যকুমারের বক্তব্য:

"কী পেলাম—বাঁক বা বৃত্তরেখা, শেষের প্রতি আরম্ভের শাণিতাগ্র ধাবমানতা, বিস্তরবর্জন বা ভারলাঘব। রসের একক এবং অপ্রত্যাশিত বিস্ময়-সৃষ্টি। এবং সর্বশেষ চাই সেন্স অব্ ফর্ম বা আকার-চেতনা ; এই আকারের পরিমিতি থেকেই রসের সমগ্রতা আসে। আকারে যদি শৃঙ্খলা না থাকে, আনুপাতিক সৌষ্ঠব না থাকে, তবে রসে পড়ে ব্যাঘাত। প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে পরিশিষ্ট। অনেক গল্প শুধু এই বিন্যাসের সামঞ্জস্যের দোষে, প্রমিত সংস্থাপনার অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। গল্পের আর সব উপাদান পেলেই আমরা রচনায় প্রবৃত্ত হই। কিন্তু আকার সম্বন্ধে আমাদের কোনো পরিমাণজ্ঞান থাকে না। পরিমাণ জানলেই চলে না, পরিণাম সম্বন্ধেও সচেতন হওয়া দরকার। গল্পের ধর্মনাশ হয় শুধু অসংযমে বা রসদ্বৈধে নয়, বেশির ভাগ হয় এই কেন্দ্রচ্যুতিতে।

তাই রসসমগ্রতার জন্য চাই যথার্থ আঙ্গিক, লিখনশৈলী, পর্যাপ্ত ও সমীচীন ভাষা। শিল্পে রূপ না হলে রস হয় না। এই রসস্ফূর্তির জন্যেই রূপদক্ষতার প্রয়োজন। সৌষ্ঠব না থাকলে ঐশ্বর্যকে ধরবে কী করে?" [অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'শতগল্প'-এর ভূমিকা। ডিসেম্বর, ১৯৬৫]

এই সংজ্ঞা ও চাহিদা কি তরুণ গল্পলেখকরা মানবেন ?

কল্লোল-পরবর্তী যুগের অন্যতম প্রধান কথাশিল্পী শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গল্পকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, তার পরিচয়টুকু উপস্থিত করি। তাঁর মতে—

"ছোটগল্প গড়ে উঠছে দুটি জিনিসের মিশ্রণে। লেখকের নিজস্ব একটি জগৎ-জীবন মানববোধ আছেই—profound হোক আর না-ই হোক, তা-ই হল তাঁর দর্শন। আর জীবন থেকে নিজস্ব প্রবণতা-অনুযায়ী যেসব উপকরণ তিনি আহরণ করে নিচ্ছেন, তারা সেই দর্শনের দ্বারা বিরঞ্জিত হয়ে, শিল্প হয়ে উঠছে। তাই একালের ভালো গল্প কেবল কৌতূহল-সৃষ্টির জন্যে ঘটনা নির্মাণ করছে না, কোনো বিশেষ বক্তব্য প্রচারের জন্য গল্পকে বাহন করছে না (বক্তব্য তো লেখকের জীবন-দৃষ্টি থেকে স্বয়ং প্রকটিত হবে), আসলে তার একটিমাত্রই প্রবণতা : তা বস্তুনির্ভর হয়েও বাস্তবাতীত, তা দূরাচারী, তা প্রতীকী।" (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ছোটগল্পের সীমারেখা', ফাল্গুন, ১৩৭৬, মার্চ, ১৯৬৯)

ছোট গল্পের প্রতীকধর্মিতার উপর তিনি জোর দিয়েছেন। বাইরের উপকরণকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে স্বতন্ত্র রূপে তার জন্মান্তর ঘটানোর

মধ্য দিয়ে গল্প গড়ে ওঠে। এখানে মনোভূমিরই প্রাধান্য। আবার এর বিপরীতটাও যে ঘটে তাও তিনি লক্ষ্য করেছেন,—যেখানে বস্তুভূমিটি লেখককে আকর্ষণ করেছে, তাকেই প্রধানভাবে প্রকট করবার জন্য একটা গল্প মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে। নারায়ণবাবু প্রথম প্রকরণের উদাহরণ দিয়েছেন মোপাসাঁর 'La Horla', আর দ্বিতীয় প্রকরণের উদাহরণ দিয়েছেন ভিক্তর হ্যুগোর 'লে ত্রাভাইয়ে দ্য লা ম্যর' ('সমুদ্রে যারা কাজ করে')। বাংলা গল্পে প্রথম প্রকরণের উদাহরণ তারাশংকরের 'শ্মশানঘাট', দ্বিতীয় প্রকরণের উদাহরণ বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালচিতি'। তাই নারায়ণবাবুর সিদ্ধান্ত : "ঘটনা, চরিত্র, বিষয়—অবলম্বন যা-ই হোক, তাকে একটি নিজস্ব জীবন-বোধিতে, একটি দর্শনে, একটি স্বগত-ভাবলোকে পৌঁছে দেওয়াই ছোটগল্পের কাজ।" (ঐদেব)

আজকের তরুণ গল্পলেখক কি এই সংজ্ঞায় সায় দেন?

পঞ্চাশ দশকের শেষ ও ষাটের শুরুতে বাংলা ছোটগল্পে ঐতিহ্য-বিরোধী নোতুন আন্দোলন দেখা গেল, তার মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হল একটি পত্রিকা—'ছোটো গল্প, নতুন রীতি'। আর সে আন্দোলনে নেতৃত্ব করেছিলেন শ্রীবিমল কর, যিনি বয়সের দিক থেকে তখন আর ঠিক তরুণ নন। ছোটগল্প কি নিছক গল্প, না, আরো কিছু? তা কি বহির্জগতের ঘটনার বিবরণ, না, ভিতর-জগতের মনন? ছোটগল্পে 'গল্প' কই? এই আন্দোলন কি ধারা-বদলের বা নোতুন রীতির প্রবর্তনের ঝোঁকমাত্র, না, আত্ম-আবিষ্কার?

সেদিন শ্রীবিমল কর তরুণদের একটি গল্প-সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন। সংকলনের ভূমিকায় তিনি এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন।

তরুণ গল্পলেখকদের অন্যতম শ্রীশীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জবানীতে তরুণদের নিজস্ব ধারণাটি ব্যক্ত হয়েছে। নোতুন রীতির গল্পের কৈফিয়ৎরূপে তাঁর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"ধারা-বদলের কিংবা নতুন একটা রীতি প্রবর্তনের তীব্র ইচ্ছাতেই যে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা নয়। বরং এর মধ্যে আত্ম-আবিষ্কারের একটা প্রচেষ্টা ছিল। তৎকালীন তরুণ লেখকেরা কিংবা বিমল কর—কেউই চাননি বাংলা গল্পের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার থেকে নিজেদের বঞ্চনা করতে। বিদ্রোহ তাঁদেরই কারোরই অভিপ্রেত ছিল না বোধ হয়। তবু তাঁরা পুরোনো রীতি, প্রকরণ, বিন্যাস এবং বিষয় ত্যাগ করকে চাইছিলেন—বহির্মুখীনতার চেয়ে

তাঁদের কাছে স্বাদুতর ছিল নিজেদের অন্তর। তাই তাঁদের লেখায় স্ব-কৃত আত্ম-প্রতিকৃতির প্রক্ষেপ ঘটছিল বারংবার, পাওয়া যাচ্ছিল স্বীকারোক্তির আভাস, চেতনামগ্ন ভাবপ্রবাহে তির্যক কিংবা বিকৃতভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল সমাজ এবং বাস্তবের খণ্ডিত দৃশ্যাবলী। মানুষের ভিতরে অতি জটিল সূত্রে অন্তর এবং বাহির গ্রথিত হয়—স্বপ্নে এবং চিন্তায় তার অদ্ভুত প্রকাশ ঘটে।" ['মায়াবী নিষাদ', দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৬/১৯৬৯]

এই গোষ্ঠীতে আছেন: শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, দিব্যেন্দু পালিত, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী, কবিতা সিংহ, সত্যেন্দ্র আচার্য, প্রবোধবন্ধু অধিকারী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এখানেই কি আলোচ্যমান স্বৈরবৃত্ত কালপর্বে বাংলা গল্পে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবসান হয়েছে? না। এর পরে—ষাটের দশকে—তরুণতর গল্প লেখকরা এসেছেন। তাঁদের নোতুন রীতি আন্দোলন পূর্ব ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেছে। এঁরা চান 'শুদ্ধ গল্প'। এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর প্রধান মুখপত্র 'এই দশক'। এঁদের অন্যান্য পত্রিকা: 'ঈগল', 'স্বরান্তর', 'ক্রান্তিক', 'শিলীন্ধ্র', 'প্রত্যয়', 'আত্মপ্রকাশ'।

এই গোষ্ঠীর গল্পসম্পর্কিত শিল্পচিন্তার পরিচায়ক কয়েকটি ছত্র উদ্ধার করি।

১। "এককালে গল্পকারেরা একটি বস্তুর প্রতিটি স্পর্শকেই খুঁটিয়ে দেখতে ভালবাসতেন, এখন বরং পিণ্ডরূপই তাঁদের কাম্য। হয়তো এই অবস্থাবিপর্যয়ে কোনো কোনো গল্পকে গল্প বলে চেনা কঠিন। কবিতারও কি অবস্থার পরিবর্তন হয় নি? তবে কেন গল্পকে কবিতা বলে ভুল করবো?" [সুকুমার ঘোষের নিবন্ধ' 'গল্প ও কবিতা' 'ক্রান্তিক' সংকলন, শ্রাবণ, ১৩৭৫/১৯৬৮]

২। "পঞ্চাশের দশকে এদেশে 'নূতন রীতি' নামে একটা সাহিত্য আন্দোলন হয়ে গেছে। কিন্তু তার লেখকরা সবাই ছিলেন বহির্মুখী। তাঁরা জানতেন না যে সমস্ত বহির্মুখী সাহিত্যের রীতি মূলত এক, যা আজ একেবারে পুরানো হয়ে গেছে এবং তার আর নূতন হওয়ার উপায় নেই। আর জানতেন না বলেই ঐ আন্দোলন হাস্যকর ব্যর্থতা অর্জন করেছিল। বঙ্কিমবাবুর কাল থেকে এপর্যন্ত বাংলা গল্প-উপন্যাসের ইতিহাস এই বহির্মুখী জড়তার ইতিহাস। এমনকি বঙ্কিমবাবুর 'কপালকুণ্ডলা', রবি ঠাকুরের 'ক্ষুধিত

পাষাণ', বিভূতিবাবুর রচনাও এই ইতিহাসের সম্পূর্ণ বাইরে নয়। আজকের দিনের গল্প উপন্যাসে বহির্মুখী সাহিত্যের এই জড়তা আর থাকবে না।...দাস সাহিত্যের নানা লক্ষণ—বিষয়গত : দর্শন, তত্ত্ব, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ইতিহাস, সমাজনীতি, প্রেম, ঘৃণা, পাপ-পুণ্য, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, গঠনপ্রক্রিয়া সম্পর্কিত : গল্প আখ্যায়িকা চরিত্র ; কিছু অস্পষ্ট গালভরা শব্দ : মহৎ সাহিত্য, আঞ্চলিক সাহিত্য, নাগরিক সাহিত্য, জীবনবাদী সাহিত্য, আশাবাদী সাহিত্য, নৈরাশ্যবাদী সাহিত্য, বাস্তব সাহিত্য ইত্যাদি। আজকের দিনের গল্প-উপন্যাসে দাস-সাহিত্যের এই লক্ষণগুলি আর থাকবে না।...

কি থাকবে এর উত্তরে বলা চলে—হয়তো কেবল একটা বিশেষ আবহ থাকবে, হয়তো কিছুই থাকবে না। তাই আসল প্রশ্ন আজ কি থাকবে নয়, কেমন করে লেখা হবে। লেখক তাঁর নিজের মতো. করে লিখবেন, নিজস্ব শব্দে, নিজস্ব বাক্যে লিখবেন। লেখক কবিতার সাহায্য নেবেন, নাটকের সাহায্য নেবেন, গানের সাহায্য নৃত্যের সাহায্য নেবেন। এর বেশি আর কিছু বলা অবান্তর হবে।

ছোটগল্প ও উপন্যাসের মধ্যে কোথায় কোথায় পার্থক্য থাকবে, তাও যাঁরা লিখবেন তাঁরাই নিজের নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বুঝে নেবেন। কেননা, অন্তর্মুখী সাহিত্য যেহেতু লেখকের ব্যক্তিত্বের মৌলিক প্রকাশ এবং নিত্য-পরিবর্তনশীল, সেইহেতু এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা সেই জড় বুদ্ধিকেই প্রশ্রয় দেওয়া।" [অমল চন্দের নিবন্ধ : 'ছোটগল্প ও উপন্যাস'। তদেব]

৩। 'ছোটগল্পের ভাষার আমূল পরিবর্তন আনছেন ষাট দশকের ছোটগল্প লেখকেরা। এই লেখকগণ পৃথক পৃথকভাবে এবং যুক্তভাবে ছোটগল্প সম্পর্কে নতুন চিন্তার অবতারণার দ্বারা নতুন নতুন ভাষার উদ্ভাবন ঘটাচ্ছেন বা ঘটাবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। গল্পের কাঠামো ভেঙে দিচ্ছেন ব্যক্তকরণের ক্ষমতার দ্বারা। ব্যক্তকরণের ভাষাও আসছে অনুরূপভাবে। ছোটগল্প থেকে কাহিনী ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। তাই কাহিনীর নিজস্ব ভাষা অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে পুরনো ছোট গল্পে যেখানে কাহিনীর ভাষায় গল্পের ভাষায় অন্তরীণ ছিল, কাহিনী বিলুপ্ত হওয়ার জন্যে ছোট গল্পে গল্পের ভাষা মুক্তি পাচ্ছে। আন্তর জীবনের অভিব্যক্তিকে যেভাবেই প্রকাশ করা হচ্ছে। সেভাবেই সৃষ্টি হচ্ছে গল্পের ভাষা।', [শোভন রায়ের নিবন্ধ 'ছোটগল্প ও ভাষা', তদেব]

বিদ্রোহী গল্পলেখকদের এইসব ঘোষণা চমকপ্রদ, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার শিল্পসাফল্য বিচার্য।

॥ দুই ॥

বাংলা ছোটগল্পে সাম্প্রতিক পালা-বদলের শুরু কবে থেকে? কল্লোল কালি-কলম গোষ্ঠীর বিদ্রোহ আজ পুরনো হয়ে গেছে। 'বিচিত্রা'য় বিভূতি-ভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চমকপ্রদ আবির্ভাব আজ ইতিহাসের অধ্যায়-মাত্র। জগদীশ গুপ্তকে আমরা কবেই ভুলেছি! (দ্বিতীয় বিশ্বসমরের পর সমাজ ও দেশের চেহারা যখন ভিতরে-বাইরে আমূল বদলে যেতে লাগল, তখনি বোধহয় ছোটগল্পের জাত বদল হল, নোতুন গল্পলেখকরা এলেন নোতুন কলম হাতে নিয়ে। সতীনাথ ভাদুড়ী, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নবেন্দু ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, ননী ভৌমিক, সমরেশ বসু, বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী—সমরকালীন ও সমরোত্তর পর্বে বাংলা ছোটগল্পের জাতবদলে সক্রিয় অংশ নিলেন।) দ্বিতীয় বিশ্বসময়ের সূচনা থেকে পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্যন্ত বিশ বছর (১৯৩৯-৫৯) "সময়সীমার মধ্যে এযুগের একটি বিশিষ্ট চেহারা রূপ ও চরিত্র সুস্পষ্ট আকার পেয়েছে। (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে বারুদের বিস্ফোরণ এবং যার ধূমায়িত আগুন আজকের পৃথিবীতেও নেভে নি, সে বারুদের বিভিন্ন মশলা তার অনেক আগে থেকেই অবশ্য জমা হতে শুরু করেছিল কিন্তু সাহিত্য-চেতনার উন্মেষের সঙ্গেই এই প্রচণ্ড আলোড়নের যুগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় এই সময়সীমার লেখকদের-ই হয়েছে।) প্রথম চোখ খোলার সঙ্গেই তাঁরা বহ্নিবলয়-বেষ্টিত বিক্ষুব্ধ দিগন্ত দেখেছেন বলা যায়।

"উদ্‌ভ্রান্ত বিক্ষোভের জগতে সাহিত্যকার হিসাবে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দরুন তাঁদের সকলের রচনায় বারুদের গন্ধ লেগেছে একথা অবশ্য ভুল। অন্তরের যে নিভৃত ধ্যানলোকে সৃষ্টির সত্যকার বীজ অঙ্কুরিত হয় সেখানে বাহ্যিক আলোড়নের ঢেউ তাঁদের অনেকেই পৌঁছতে দেন নি, কিন্তু যুগের অশান্ত বাষ্পমণ্ডল তাঁদের দৃষ্টিকে কিছুটা রঙীন বা তির্যক বা অপ্রত্যাশিত দিকে তীক্ষ্ণ করে তুলেছে।"

(একটি গল্প-সংকলনের ('সিন্ধুর স্বাদ', ২৬শে জানুয়ারি, ১৯৬০) ভূমিকায় অগ্রণী কথাকার শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। ' যদিচ যুগমুকুর হওয়াই গল্পের শেষ লক্ষ্য নয়, কাল ও দেশাশ্রয়ী হয়েও দেশকালাতীত গহন কোনো শিল্পসত্যকে স্পর্শ করাতেই গল্পের পরম সার্থকতা, তথাপি সংকলক স্বীকার করেছেন, 'সুন্দরম্' (সুবোধ ঘোষ), 'বৈয়াকরণ' (সতীনাথ ভাদুড়ী), 'চোর' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী), 'কন্যা' (নরেন্দ্রনাথ মিত্র), 'শুভক্ষণ' (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়), 'শোক' (সন্তোষকুমার ঘোষ), 'ঈর্ষা' (রমাপদ চৌধুরী), 'অশ্বত্থ' (বিমল কর), 'ছেঁড়া তমসুক' (সমরেশ বসু), 'জবানবন্দী' (গৌরকিশোর ঘোষ) প্রভৃতি সংকলন-ধৃত গল্প অন্য কোনো যুগে লেখা সম্ভব ছিল না।

এখানেই স্বৈরবৃত্ত কাল তার সমস্ত বিক্ষোভ সংশয় অশান্তি ও জীবন-জিজ্ঞাসার স্বাক্ষর রেখে গেছে আমাদের চেনা কালের ছোটগল্পে। কিন্তু গল্পগুলি লেখকদের নিজস্ব শিল্পস্বাক্ষরিত, একথাও অবশ্যস্বীকার্য।

ছোটগল্প আজ লেখকদের কাছে আত্মপ্রকাশের তীব্র বাহন রূপে দেখা দিয়েছে। সংশয় অথবা বিদ্রোহ থেকে ছোটগল্পের জন্ম হতে পারে। তীক্ষ্ণ প্রশ্নমূলকতা তার নিশান। জীবন সম্পর্কে ছোটগল্পের কৌতূহল আর আগ্রহ অসীম।)

কিন্তু আজ এই প্রশ্ন, বিদ্রোহ, সংশয় ও কৌতূহলের জাত বদল হয়েছে। লেখকের আত্মপ্রকাশের—জীবনজিজ্ঞাসা ও দৃষ্টির—তীব্রতম বাহনরূপে দেখা দিয়েছে ছোটগল্প। তার সূচনা দ্বিতীয় বিশ্বসমরকাল থেকে।)

সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম্' গল্পটি তার নিদর্শন। ভদ্র মধ্যবিত্ত মনের নির্মোহ ব্যবচ্ছেদ করেছেন লেখক। কৈলাস ডাক্তারের ছেলে সুকুমারের জন্যে পাত্রীদেখা উপলক্ষ করে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের বর্ণাভিমান, বিত্তলোভ, দৈবভক্তি, ছেলের ছদ্ম বৈরাগ্য ও নারীমাংসে লোভ, মধ্যবিত্তের অসার সুন্দর-চেতনা—সবকিছুর অন্তরালে যে কুসংস্কার সক্রিয়, লেখক তাকে উদ্ঘাটিত করেছেন।) কৈলাস ডাক্তারের রুক্ষ উক্তি: "তোমাদের সুন্দরের তো মাথামুণ্ডু কিছু নেই।......চুল কালো হলে সুন্দর আর চামড়া কালো হলে কুৎসিত। এই কথাটা কি মহাব্যোমে লেখা আছে, শাশ্বত কালি দিয়ে?...... বর্বর আর গাছে ফলে? একটা বাজে টাবু ছাড়বার শক্তি নেই, সভ্যতার গর্ব করে? আধুনিক হয়েছে? যত সব ফাজিলের দল!"

কৈলাস ডাক্তার মারফৎ লেখক আমাদের মিথ্যাচারকে, সুন্দরের অভিমানকে তিরস্কার করেছেন। সেই তিরস্কার গল্পের শেষে তীব্র হয়েছে রূপসন্ধানী সুকুমারের অধঃপতনে—ভিখারী মেয়ে তুলসীর রক্তমাংসের প্রতি তার বর্বর লোভে; তা তীব্রতম হয়েছে—মৃত তুলসীর শবব্যবচ্ছেদক কৈলাস ডাক্তারের সহকারী যদু ডোমের তীক্ষ্ণ মন্তব্যে—'শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে।'

লেখকের এই ইঙ্গিতগর্ভ বিদ্রূপোক্তি আমাদের সুন্দর-অভিমানের গালে প্রচণ্ড চপেটাঘাত।

তিন

ভালবাসা ও দাম্পত্যের আদর্শটিকে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করেছেন আধুনিক গল্পলেখকেরা।

সুবোধ ঘোষের 'জতুগৃহ', অচিন্ত্যকুমারের 'কলঙ্ক', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাণ্ডারী', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'কন্যা', গৌরকিশোর ঘোষের 'জবানবন্দী', —এইসব গল্প আমাদের ভাবায়। ভালবাসা আর দাম্পত্যপ্রেমনিষ্ঠার সনাতনী আদর্শের আড়ালে কত-যে বিচিত্র চোরাগলি আছে, বাঁকের আড়ালে অন্ধকার আছে, কুটিলতা ও জটিলতা আছে, সে সম্পর্কে এইসব গল্প আমাদের সচেতন করে তোলে।

(মধ্যরাত্রে রাজপুর জংশনে ওয়েটিং-রুমে বিবাহবিচ্ছেদের পাঁচ বছর বাদে দু'জনের দেখা ('জতুগৃহ')। শতদল আর মাধুরী—একদিন প্রেমের পবিত্র বন্ধনে বাঁধা ছিল, তারপর পরস্পরের সঙ্গ দু'জনের কাছেই হয়ে উঠল অসহ্য, বিবাহবিচ্ছেদ হল, দু'জনে নোতুন করে আপন সঙ্গী নির্বাচন করল।

আজ আর শতদল-মাধুরীর মধ্যে নেই কোনো অভিমান, কোনো আশঙ্কা, কোনো ঘৃণা আর সংশয়। অতীত আজ মৃত, তাকে ভয় করার কিছু নেই। তাই ওয়েটিং রুমে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে, চা খেতে পারা সম্ভব হয়।)

"মানুষ মরে যাবার পর যেমন তার কথা মমতা দিয়ে বিচার করা সহজ হয়ে ওঠে, আর ভুলগুলি ভুলে গিয়ে গুণগুলিকে বড় করে ভাবতে ইচ্ছে করে, শতদল আর মাধুরী বোধহয় তেমনি করেই আজ তাদের মৃত অতীতকে

মমতা দিয়ে বিচার করতে পারছে। অতীতের সেই ভয়, ঘৃণা ও সংশয়ের ইতিহাস যেন নিজেরই জ্বালায় ভস্ম হয়ে সংশয়ের বাতাসে হারিয়ে গেছে। আজ শুধু মনে হয়, সেই অতীত যেন শত বছরের একটি রাত্রির আকাশ, তার মধ্যে ফুটে উঠেছিল ছোটবড় কত তারা, কত মধুর ও স্নিগ্ধ তার আভা। সে আকাশ একেবারে হারিয়ে গেছে। ভাবতে কষ্ট হয়, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না, ফিরে পেতে ইচ্ছে করে বৈকি।"

কিন্তু, না, তাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। দেবার কোনো সুযোগ নেই। নেই কোনো রোমান্টিক বেদনার আশ্রয়।

শতদল—তোমাকে আমি ভুলিনি,ভুলতে পারা যায় না।

মাধুরী—বিশ্বাস না করার কি আছে, চোখেই দেখতে পাচ্ছি।

—কিন্তু তুমি ?

—কি ?

—তুমি ভুলতে পেরেছ আমাকে ?

শতদলের এই প্রশ্নের জবাব মাধুরী দেবার আগেই ট্রেন আসার ঘণ্টা বেজে উঠেছে ঠন্‌ঠন্ করে। নিমেষে স্বপ্নাবেশ ভেঙে যায়। প্রবেশ করে তৃতীয় চরিত্র, মাধুরীর দ্বিতীয় স্বামী অনাদি রায়। এখানে শতদলের কোনো ভূমিকা নেই। তবু চলে যাবার মুহূর্তে শতদলের বিমর্ষ কণ্ঠে শোনা যায়,—বুঝেছি, তুমি উত্তর দেবে না।

—উত্তর দেওয়া উচিত নয়।

—কেন ?

—বড় অন্যায় প্রশ্ন।

—বুঝেছি ! ছটফট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় শতদল। মাধুরীই শতদলের অভিমানকে ভেঙে দেয় শান্ত পরিহাসে। হেসে ফেলে শতদল।

"বাজে কথার অভিমান আর দাবীগুলি যেন নিজের স্বরূপ চিনতে পেরে অট্টহাস্য করে উঠেছে। এতক্ষণে সত্যিই বুঝতে পেরেছে শতদল।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় দেখতে থাকে এবং দরজার দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারে শতদল, মাধুরী চলে গেল।

জতুগৃহে আর আগুনের স্ফুলিঙ্গ লাগলো না, লাগলো: উচ্চহাসির প্রতিধ্বনি।"

এই নির্মোহ বাস্তব দৃষ্টিই আধুনিক গল্পের মৌল উপাদান। এখানে

পূর্বেকার বাংলা গল্পের সমস্ত রোমান্টিক প্রেম ব্যাকুলতা লজ্জিত, পরাভূত।)

(অচিন্ত্যকুমারের 'কলঙ্ক' গল্পে এর অনুরূপ দেখি। বিশ্বনাথ আর শর্বানী। বিশ্বনাথ যত উচ্ছৃঙ্খল, শর্বানী তত শান্ত। বিশ্বনাথের সহস্র অনাচার আর অপমানেও শর্বানী স্ত্রীর অধিকার ছাড়তে রাজি নয়। বিশ্বনাথ শেষে অনুনয়ের পথ ধরল—'বিয়েটা ভেঙে দাও, তবেই আমি গ্রেসিকে বিয়ে করতে পারি।') অগত্যা শর্বানী রাজি, আপোসে বিচ্ছেদে রাজি। দু'জনে কোর্টে সংযুক্ত দরখাস্ত করল।

(আর দরখাস্ত যখন পড়েছে তখন দু'জনে একত্র বসবাস করা সম্ভব নয়। মেয়েকে মানুষ করতে হবে। শর্বানী আলাদা বাসা নিল মেয়েকে নিয়ে। ঠিক হল বিশ্বনাথ এক বছর একশ টাকা করে দেবে ভরনপোষণ বাবদ। এই এক বছর করতে হবে অসঙ্গবাস। আইন অনুসারে এই অসঙ্গবাসটাই চূড়ান্ত বিচ্ছেদের ভূমিকা।)

এক বছর শেষে আদালতের মধ্যস্থতায় চূড়ান্ত ডিক্রি হয়ে গেল, বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হল। মাসের শেষে শর্বানী পাবে এক শ পঁয়ত্রিশ টাকা। প্রতি মাসে ঠিক সময়ে টাকা এসে পড়ে।)

বিশ্বনাথের প্রেরিত চর জেনে গেল শর্বানীর কোনো কলঙ্ক নেই। নিষ্পুরুষ শর্বানী সন্দেহমুক্ত জীবন যাপন করছে। কোনো পুরুষের সঙ্গ করলেই খোরপোষের টাকা বাতিল হবে।

(হঠাৎ একদিন এলো বিশ্বনাথ! শর্বানী আর মেয়ে উর্মির জন্য শাড়ি আর জামা। হৈ-চৈ লাগিয়ে দিল। খাওয়া-দাওয়ার নানা আয়োজন করল। শীতের রাত। খাওয়া গল্প শেষ হল। বিশ্বনাথ তবু যেতে চায় না, শর্বানীর সঙ্গে শুতে চায়। কিন্তু শর্বানী কি তাতে রাজি?

(শর্বানী বললে, 'এবার তুমি চলে যাও।'

কনকনে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্বনাথ আর্তনাদ করে উঠল: চলে যাব?

স্পষ্ট স্বরে শর্বানী বললে, হ্যাঁ, চলে যাও। তোমার টাকা ক'টাই শুধু আসুক।")

এখানেই গল্পের শেষ। এখানে সমস্ত মোহের অবসান, সমস্ত রোমান্টিক ব্যাকুলতার পরাজয়। শর্বানী বিশ্বনাথকে দেখিয়ে দিল খোলা দরজা, মোহকে বাস্তব দেখিয়ে দিল চলে যাবার পথ।

বোধ করি, এই নির্মোহ জীবনদৃষ্টিই আধুনিকতা।

(গৌরকিশোর ঘোষের 'জবানবন্দী' গল্পে জীবন-জিজ্ঞাসার অন্য রূপ দেখি। বিপত্নীক নিঃসন্তান প্রবীণ অধ্যাপক ভবেশবাবু দয়া করে আশ্রয় দিয়েছিলেন একটি বাস্তুহারা মেয়েকে! মেনকা পেয়েছিল আশ্রয়, নিরাপত্তা। ভবেশ-বাবুকে প্রাণভরে সেবাযত্ন করেছিল! ভবেশবাবু শেষ পর্যন্ত মেনকাকে বিয়ে করেছিলেন। মেনকার ছেলে হলে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন, তাঁর জীবন ধন্য হয়েছিল।) কিন্তু সে ছেলের জনক কে? ভবেশবাবু জানেন, তিনিই জনক। আসলে তাঁর ছাত্র সুশীল ছেলের জনক। ভবেশবাবু যা দিতে পারেন নি, সুশীল মেনকাকে তা দিয়েছিল। মেনকা ভেবেছিল তার সন্তানকে ভবেশবাবুর সন্তান বলে চালিয়ে দেবে। সুশীল তাতে রাজি হয় নি। শেষে সুশীল-মেনকা তাদের সন্তান নিয়ে পালিয়েছে। এখন পুলিশের কাছে ধরা পড়ে তিনজনেই জবানবন্দী দিয়েছে।

ভবেশবাবুর বক্তব্য: মেনকা আমাকে সব দিয়েছিল। দিয়েছিল উজাড় করে। তাই আমিও ভাবলুম, প্রতিদানে আমার যা কিছু দেবার আছে সবই ওকে দেব। ওকে বিয়ে করলুম। বাচ্চাও দিয়েছি।...আমি মেনকার অতীত নিয়ে মাথা ঘামাই নি। আমি জীবন শুরু করেছি ওর বর্তমান থেকে। তাতে কি আমার দাবী খারিজ হয়ে যাবে?

সুশীলের বক্তব্য: ভবেশবাবুর প্রতি তার কোনো বিদ্বেষ নেই। অন্তত এখন। তাঁর অবস্থাও সে বুঝতে পারছে। বেচারা ভবেশবাবু! অনুকম্পা হল সুশীলের। কিন্তু মেনকার দাবি সে ছাড়তে পারে না। মেনকা তাকে প্রেম দিয়েছে। সন্তান দিয়েছে। সন্তানকে সে অবশ্য ভবেশবাবুর মত গুরুত্ব দেয় না। পিতার ভূমিকা ধাতস্থ হয় নি তার, মেনকার প্রেম তার কাছে বেশী দামী। মেনকা আছে, তাই আছে তার বাঁচারও অর্থ।

মেনকার বক্তব্য: 'ভবেশবাবুর পিতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য' ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা শুরু করলাম। তারপর বুঝলাম, শুধু প্রার্থনা করলেই পেটে ছেলে আসবে না। অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।...ধীরে ধীরে সুশীলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলাম। ফলও পেলাম হাতে হাতে।'

কিন্তু মেনকা পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না। ভবেশবাবুকে জানাল, তার ছেলে হবে। তিনি উল্লাসে নেচে উঠলেন। মেনকা সুশীলকে বোঝাল, সে ওটা ভবেশবাবুর সন্তান বলে চালিয়ে দেবে। কিন্তু সুশীল

রাজি হল না। জানাল, এমন অন্যায় সে করতে দেবে না। তার সন্তান, তারই সন্তান। মেনকাকেও দাবি করল সুশীল। আর সে দাবির কী জোর!

সেই দিনই মেনকা বুঝতে পারল যে, হিসেবে গোলমাল হয়ে গেছে। বুঝতে পারল, সুশীল তার গর্ভে সন্তানই শুধু দেয় নি, তার হৃদয়ে প্রেমেরও জন্ম দিয়েছে।

মেনকার এ এক নোতুন অভিজ্ঞতা, এ এক আনকোরা নোতুন আস্বাদ, মাধুর্যভরা এ এক নোতুন যন্ত্রণা। সে প্রাণপণে ভবেশবাবুর সংসার আশ্রয় আঁকড়ে থাকতে চেয়েছে, পারেনি। আজ সুশীলকে সে ফেরাতে পারে না।

তাই মেনকার কথা—"প্রেমে সুখ আছে, একথা মিথ্যে। সুখের জন্যে কেউ প্রেম করে না। ওটা নিদারুণ ভবিতব্য। মৃত্যু যদি যম-যন্ত্রণা হয়, প্রেম তবে জীবন-যন্ত্রণা। আর এই যন্ত্রণার আস্বাদ যখন থেকে টের পেয়েছি, সেইক্ষণ থেকেই আর সবকিছু তুচ্ছ হয়ে গেছে। কিছু ভাবিও নে। আর কিছুতে ভয়ও পাই নে। কি করব? আমার কি হাত আছে?"

তিন জনের তিন প্রশ্ন। তিন রকমের যন্ত্রণা। তিন রকমের দুঃখ। এই যন্ত্রণা ও প্রশ্নের উত্থাপনে যে অলজ্জ সততা ও সাহস, যে নির্মোহ জীবন-জিজ্ঞাসা ও অকুণ্ঠ বাস্তবানুরাগ, যে অন্তর্মুখী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তা কেবল শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই বাংলা ছোটগল্পে দেখা গেছে। এর পূর্বে এই দৃষ্টি ছিল না।

দাম্পত্য জীবনের সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাণ্ডারী'। আটচল্লিশ বছর বয়সের কুশ্রী অখিল বিয়ে করেছে তেইশ বছরের সুশ্রী অলকাকে। অখিল বেশী রকমের কুৎসিত, অলকা উজ্জ্বল সুশ্রী সঞ্চারিণীলতা। কাঠের ব্যবসায়ী অখিলের টাকার অভাব নেই, সেদিনও অলকাকে কলকাতা থেকে চার হাজার টাকা দামের হীরের আংটি এনে দিয়েছে। কিন্তু অলকা খুশি হয় নি, হবে না, তা অখিল ঘোষের অজানা নয়। সেই অখিলের ব্যবসায়ে কর্মী তারই জ্ঞাতিভাই প্রতাপ। উজ্জ্বল সুশ্রী যুবক, গানের গলা মিষ্টি, চমৎকার টেনিস খেলে। তবে কি অলকা প্রতাপকে ভালবাসে? অখিল ঘোষ তা জানে না, শুধু জানে অলকা এইবার তাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। প্রতাপের পাশে অখিলকে নিজের অজ্ঞাতেই অলকা মিলিয়ে নিচ্ছে তিলে তিলে। বিপজ্জনক পাহাড়ী পথে জীপ চালাতে চালাতে অখিলের

মনের মধ্যে এই সব চিন্তা ক্রূরভাবে পাক খাচ্ছিল। তার সঙ্গী অলকা আর প্রতাপ।

দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে লেখকের নির্মম বিশ্লেষণ অখিলের চিত্তে ঝল্‌সে উঠেছে। "সংসারে নিজের স্ত্রীর ভালবাসা পাওয়া বোধ হয় সব চাইতে কঠিন। অভ্যাসের মধ্য দিয়ে পরস্পরকে স্বীকার করে নেওয়া যায়—চুক্তি করা চলে। কিন্তু সেই আশ্চর্য জিনিস? যা আলোর মতো—স্পষ্ট কোন রূপ নেই অথচ যার জ্যোতির্ময় ব্যাপ্তি; যা শান্ত অন্ধকারের মতো—যার শীতল বিশ্রামের ভেতরে সমস্ত স্নায়ুগুলো গভীর শ্রান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তে চায়? অনিচ্ছুক দাম্পত্য জীবনের ভেতরে তাকে কোথায় পাওয়া যাবে?"

এই চিন্তা অখিলের ভিতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে। কী অর্থহীন অসহ্য যন্ত্রণা! সারাটা জীবন এমনিভাবে অখিলকে জীবন কাটাতে হবে। অলকার ছোঁয়া তার কাছে কঙ্কালের শীতল স্পর্শ মাত্র! এমন সময় অখিলের জায়গায় প্রতাপ বসল স্টিয়ারিঙে। আর তারপরই একটা বিপজ্জনক বাঁকের মুখে জীপ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে আকস্মিকভাবেই ফিরে এলো।

"প্রতাপ কাতরভাবে কী বলতে চেষ্টা করল, তার আগেই ঝঙ্কার দিয়ে উঠল অলকা। গলার স্বরে তখন মৃত্যুভয় রেশের মত কাঁপছে।

—তখুনি বলেছিলুম, ও আনাড়ীর হাতে গাড়ি দিয়ো না। খালি টেনিস খেলতে পারলে আর গান গাইলেই কি সব পারা যায় সংসারে? ও যার কাজ তার হাতেই দাও ঠাকুরপো।......

অলকা তার সাদা নরম আঙুলে অখিলের কালো মোটা হাতটা চেপে ধরল।

—তুমি ছাড়া কাউকে আমার ভরসা নেই—কারুকে বিশ্বাস নেই। তুমিই গাড়ি চালাও, তোমার হাতে স্টিয়ারিং থাকলে কোনও পথকেই আমার ভয় করে না।

অখিল তাকাল অলকার দিকে—এই প্রথম অলকার সঙ্গে সত্যিকারের শুভদৃষ্টি হল। নোতুন করে সে দেখল অলকাকে। অলকার হাতে একটা চাপ দিয়ে অখিল ঘোষ বলল, ঠিক কথা। গাড়িটা আমিই চালাব।"

বস্তুজগতের পাশে বহির্জগৎ, তার পাশে অন্তর্জগতের ভয়াল সুন্দর সত্য রূপ ধরা পড়েছে লেখকের কলমে। প্রতাপ অলকার অলস মুহূর্তের সঙ্গী হতে পারে, কিন্তু জীবনের কাণ্ডারী অখিল—আর কেউ নয়। এ কি

প্রেম? না, নিরাপত্তা, জীবনের সুদৃঢ় আশ্রয়? পূর্বের 'জবানবন্দী' গল্পে মেনকা ভবেশবাবুর প্রেম ওরফে নিরাপত্তা, আশ্রয়, মর্যাদা পরিত্যাগ করে সুশীলের প্রেম ওরফে জীবনস্বাদের মাধুর্য বা যন্ত্রণাকে গ্রহণ করেছে। এখানে অলকা তার বিপরীতটাই করেছে। অথচ দু'টিই সত্য।

(দু'টি গল্প জীবনকে গভীরভাবে সত্য করে দেখার ফল। দু'ক্ষেত্রেই জীবনের প্রতি যে দৃষ্টি, তা রোমান্টিকতাবর্জিত, ভাবালুতামুক্ত, নির্মোহ। এই দৃষ্টিটাই আধুনিক। এই দৃষ্টিতেই ছোটগল্পের জাত বদলেছে।

॥ চার ॥

নোতুন রীতির গল্প-আন্দোলনের অভিভাবক ও অধিনেতা বিমল কর ছোটগল্পের জাত বদলাতে বেশিরকম সাহায্য করেছেন, বোধ করি এ বিষয়ে এখন আর তর্কের অবকাশ নেই। ছোটগল্প যে মননপ্রধান লেখকের আত্ম-প্রকাশের তীব্রতম বাহন, এ সত্য বিমল করের লেখায় সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি বার বার স্বোপার্জিত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাকে পিছনে ফেলে নোতুন ক্ষেত্রে পদার্পণ করেছেন। অন্তর-উন্মোচনের দুঃসাহসী প্রয়াস করেছেন। 'পার্ক রোডের সেই বাড়ি', 'আত্মজা', 'উদ্ভিদ', 'আঙুরলতা', 'পলাশ', 'সুধাময়', 'আর এক জন্ম অন্য মৃত্যু', 'নিষাদ', 'টেলিগ্রাফ', 'এই দেহ অন্য মুখ', 'মানবপুত্র', 'দরজা,' 'উদ্বেগ', 'ত্রিলোচন নন্দীর নামে ছড়া', 'সোপান', 'জননী', 'অপেক্ষা'. 'পিতৃঘ্ন', বড়ো গল্প 'বালিকা বধূ'—বিমল করের এইসব গল্পের শিল্পমূল্য ও ইতিহাসমূল্য অবশ্যস্বীকার্য। 'ছোটগল্প নতুন রীতি' পত্রিকা সম্পাদনায় বা তরুণতর গল্পলেখকদের গল্প সংকলন সম্পাদনায় বিমল করের যে সচেতন শিল্পবোধ, সদাঅতৃপ্ত জীবন-জিজ্ঞাসা তার শিল্পরূপ তাঁর গল্প। গল্পের টান, গল্পের জাদু কখনই তাঁর কাছে শেষ কথা নয়, গল্পের মধ্যে মননকে, তীব্র তীক্ষ্ণ নির্মোহ জীবন-জিজ্ঞাসাকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। মানুষের অন্তরে যে জটিলতা, অন্তর ও বাহিরে যে সূত্রসম্বন্ধ, স্বপ্নে ও চিন্তায় তার যে অদ্ভুত প্রকাশ, নিঃসঙ্গ অন্তরজীবনের যে বেদনা ও অসহায়ত্তাবোধ—এইসব বক্তব্য বিমল করের গল্পকে এমন এক স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে যাকে কিছুতেই পূর্বতন ধারার অনুসৃতি বলে মনে করা যায় না। আত্ম-আবিষ্কারের শুদ্ধ প্রয়াস তাঁর গল্পে

পাই। স্ব-কৃত আত্ম-প্রতিকৃতির প্রক্ষেপে তাঁর আনন্দ। চেতনামগ্ন ভাব-প্রবাহে অবগাহন করে জীবনের গভীর তলদেশ পর্যন্ত দেখে নেওয়া ও তাকে প্রকাশ করার তাগিদ এইসব গল্পের মূলে আছে।

'আত্মজা' গল্প নিয়ে অনেক হৈ-চৈ হয়েছে, কিন্তু আমার মনকে টানে 'নিষাদ' বা 'অশ্বত্থ', বা 'পিতৃঘ্ন'-এর মতো গল্প। পূর্বতন ধারাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে অন্য পথে বিমল কর এগিয়েছেন এবং পাঠককে সে পথে যেতে বাধ্য করেছেন। তাঁর কোনো গল্পই সরল গল্প নয়, জটিল তাদের পথরেখা, অন্তরের গহনে তাদের যাত্রা, সংকেতময় তাদের পরিবেশ। 'নিষাদ' গল্পের বাচ্চা ছেলেটি, 'পিতৃঘ্ন' গল্পের নায়ক মানুষটি কিংবা 'অশ্বত্থ' গল্পের নায়িকা রেণু : এরা এতদিন কোথায় ছিল ?

'নিষাদ' গল্পের নায়ক বাচ্চা ছেলেটির আক্রোশ রেললাইনের উপর—কারণ রেলগাড়িতে কাটা পড়েছে তার প্রিয় ছাগলছানাটি। তাই অন্ধ আক্রোশে সে সারাদিন রেললাইনের উপর ঢিল ছুঁড়ছে। অথচ হত্যাকারী অন্য লোক, ছেলেটি তা জানতো না। ছেলেটি ক্রমশ এগিয়ে আসছে বিপজ্জনক রেললাইনের কাছে, সে মরবে, এই-ই তার নিয়তি। শেষ পর্যন্ত ছেলেটি রেলগাড়িতে কাটা পড়ল, তার প্রতিশোধকামনা অপূর্ণ রয়ে গেল। এই মৃত্যু অনিবার্য, এই-ই তার নিয়তি। অথচ গল্পের শেষে একটি শান্ত চিত্র লেখক দিয়েছেন—শেষ বেলায় চারদিকে মাঠঘাটে ছায়া পড়ছে। তবু ছেলেটি যেখানে রেলে কাটা পড়েছে সেখানে সামান্য একটু রোদ অপেক্ষা করছে। এই অসামান্য ইঙ্গিতেই গল্পের পরিণতি। কোথাও চিৎকার করে বলা হয়নি, তবু অনুভব করা যায়—নিয়তির কাছে মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণ-ই এই গল্পের বিষয়।

নিয়তির অমোঘতা, মৃত্যুচিন্তা, মানুষের নিঃসঙ্গতা, বিষণ্ণতাবোধ ও শূন্যতা-বোধ—বিমল করের গল্পের প্রিয় বিষয়। 'পিতৃঘ্ন' গল্পের নায়ক স্বীকারোক্তির সময়ে ভুলে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করেছে, পরমুহূর্তেই ভুল সংশোধন করে বলেছে—ও কিছু না, 'ঈশ্বর' শব্দটি কথার কথা মাত্র।

'অশ্বত্থ' গল্পের নায়িকা রেণুর সারাটা দিন আর কাটে না, স্বামী নবনী আপিসে, বাড়িতে সে একা, "রোদে তেতে ওঠা বেলা এবং দুপুর—সারাটা দুপুর, বিকেলের ছায়া ঘন হওয়া পর্যন্ত একা একাই কাটে।"

রেণু মধুপুরের মেয়ে। শহরের হৈ-হট্টগোল ভিড়-টিড়ের চেয়ে ফাঁকা-টাঁকা

তার খুব ভালো লাগে। তাই রিভারসাইড রোডের বাড়িতে রেণুর ভালই লেগেছিল। সারাটা দিন তার একা একাই কাটে। না, ভুল বললাম, আলো, হাওয়া, দুপুরের নানা শব্দ, পাখির গান, অশ্বত্থের ঝরে পড়া পাতা —এইসব নিয়ে তার দিন কাটে।

নবনী-রেণুদের কোয়ার্টার্সের ঠিক গায়ে এক বিশাল অশ্বত্থ। এই অশ্বত্থ সারাদিন রেণুর সঙ্গী।

“পিঠের ওপর খুলে-যাওয়া খোঁপার কাঁটাগুলো খুলতে খুলতে উপর পানে তাকাল রেণু। খোঁপার পাক খুলতে বিনুনিটা পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়ল। হাতের মুঠোয় তেল-তেল কাঁটাগুলো নিয়ে রেণু অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে থাকল। মাথার উপর অশ্বত্থগাছের একটা পাতা ভরা ঝাঁকড়া ডালের আগাটা তখন হাওয়ায় দুলছে, পাতাগুলো নড়ছে, রোদের খানিকটা সেই পাতায় পাতায়, খানিকটা রেণুর বুকের উপর ছুঁয়ে গড়িয়ে পড়েছে। শুধু বাড়ি নয়, এই গাছ, পাঁচিল টপকে অশ্বত্থের একটি শাখা তার প্রশাখা-পল্লব নিয়ে উঠনের মাথার উপর ঢলে পড়েছে, ঢেকে ফেলেছে—এইটুকুও বড় ভাল লেগেছিল রেণুর। প্রথম দিন উঠনে পা দিতেই রেণুর চোখে এ বাড়ির এই আশ্চর্য সম্পদটুকুই আগে চোখে পড়েছিল। আর রেণু অবাক হয়ে গিয়েছিল, মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। তখন পড়ন্ত বিকেল। স্তিমিত, শান্ত, অনুত্তাপ, সোনা গলার মত সুন্দর রোদ পাতার জাফরিতে উপচে পড়ছে। আশ্চর্য সেই রং, অপূর্ব সেই ছায়া-বোনা-বোনা পাতার চাঁদোয়া। শীর্ণ ডগাটা একটু একটু নড়ছিল, পাখি আসছিল উড়ে উড়ে—ডানার শব্দে, ডাকে ডাকে সমস্ত গাছটাই যেন হঠাৎ খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠল। রেণু এত তন্ময় হয়ে পড়েছিল যে, তার মনে হল, রেণুর পায়ের শব্দে গাছটা যেন কতকাল পরে কল্‌কল্‌ করে কথা বলে উঠল।”

একটি অনুচ্ছেদে লেখক রেণুর সঙ্গে অশ্বত্থের মনের মিতালি ঘটিয়ে দিলেন। লক্ষণীয়, সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদ জুড়ে ছবিটি—তার ডীটেলের কাজ অসাধারণ, শব্দ আর রঙের ব্যবহার নিপুণ,—সবটা মিলিয়ে লেখকের প্রচণ্ড নিজস্বতা। পড়তে পড়তে অজ্ঞাত সুখে, অজ্ঞাত দুঃখে পাঠকমন আন্দোলিত হয়। কারণ, এটা বিমল করের গল্প। নিঃশব্দ পদপাতে মৃত্যু এসে জীবনের দরজায় ঘা দেবে, অমোঘ নিয়তি মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করবে, অনিবার্য নিঃসঙ্গতাবোধে শিল্পী আক্রান্ত হবেন।

নবনী বুঝতে পারে না সারাটা দিন রেণুর কি করে কাটে, কি করে কাটবে। নবনীর পক্ষে তা অনুভব করা সম্ভব নয়, কারণ নবনী-রেণু দুই অনুভূতি জগতের লোক। নবনী চলে যাবার পর আর কি থাকে—কোন্ আকর্ষণ? লেখকের উত্তর—"থাকে, আকর্ষণ থাকে। এবং সুখও আছে।"

নবনী চলে যাবার পরই সদর দরজা রেণু বন্ধ করে না। একমনে শিউলি গাছের ঝোপটা দেখে, পাখিদের দেখে। "তারপর সদর ভেজিয়ে উঠনে এসে দাঁড়ায় রেণু। এতক্ষণে মাথার ওপর অশ্বত্থের ডালপাতার পাশ কাটিয়ে প্রথম শীতের সুন্দর রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে আধখানা উঠান জুড়ে। মুখ তুলে তাকায় রেণু। আগায় একটি-দু'টি কচি পাতা নিয়ে অশ্বত্থের একটি সরু ডাল পত্‌পত্‌ করে মাথা নাড়ছে। যেন কত খুশি! আর এক পাশে পাতায়-পাতায় আলুথালু, লম্বা মতন, রোগা একটা ডাল দোল খাচ্ছে! উড়ে আশা কাকের পায়ের চাপে, গায়ের ভারে। কোথাও বা একটুও কাঁপন নেই। পাতাগুলো সব আঁকা ছবির মত নিথর হয়ে আছে।

এরই মধ্যে টুপটাপ ক'টা পাতা উঠনে এসে পড়ল; আঙুলের মত শুকনো ছোট ডাল ফেলে উড়ে গেল কাক। আড়াল থেকে দুষ্টু কোনও পায়রা হয়তো মল ফেলে গেল। আরো কত কি—কুটোকাটা, মাছের কাঁটা, সাপের খোলস!

গাছটার দিকে তাকিয়ে রেণু একটু চোখ কোঁচকাল। মনে মনে বললে, দাঁড়াও, এখনই আমি ঝাঁটা হাতে করছি না। আগে একটু চা খাই, চুল খুলি —তারপর।"

তারপর ফুলঝাঁটা দিয়ে রেণু উঠন ঝাঁট দেয়। তারপর কাপড়-চোপড় কাচে, জল তোলে, উঠনে বসেই স্নান সারে, খাওয়া সারে, তারপর বারান্দায় মাদুরে লেপ-তোশক রোদে দেয়, বইটই নিয়ে একটু বসে।

"এর পর সারাটা দুপুর সেই নিঝুম, বিভোর, ঘুম-ঘুম, খড়-রং রোদে, এলোমেলো হাওয়ায় রেণু বসে বসে গাছের দিকে চোখ তুলে তুলে উলকাঁটা নিয়ে নবনীর সোয়েটার বোনে। তখন এই গাছ—গাছের পাতাই তার সব। তাদের সঙ্গে যত মনের চুপ চুপ অস্ফুট কথা, তাদের জন্যে একটু বা ঘাড় কাত করে হাসি, মাঝে মাঝে মিষ্টি মিহি গলায় গানের গুন্ গুন্।"

এভাবেই দুপুর কাটে, বিকেল কাটে, তারপর নবনীর সাইকেলের ঘন্টি বেজে ওঠে। রেণু আবার নবনীকান্ত রায়ের সুন্দরী স্ত্রী, সুপটু ঘরণী হয়ে ওঠে।

"হ্যাঁ, এই আশ্চর্য সুখ এবং এই গাছ, নরম কেমন এক অদ্ভুত মন নিয়ে মধুপুরের মেয়ে রেণু এমন ফাঁকা নির্জন বাড়িতে দিব্যি ছিল।"

তারপর এলো পাতা ঝরার দিন। এখন সারাটা দিন রেণুর কাটে নোতুন খেলায়। সারা দুপুর ভরে ঝরা-পাতা কুড়োনোর খেলা।

নবনীকে একদিন রেণু বলল—'কি যে জ্বালায় বাপু ওই অশ্বত্থ গাছটা, কি বলব। আর পারি না।'

নবনী হেসে জবাব দেয়,—'তোমারই ত গাছ! একটু জ্বলো!'

কথাটা রেণুর মনে লাগল। সত্যিই ত! নিজের রক্তমাংস থেকে একটা সেই গাছ যদি হত – এমনি করেই জ্বালাত।

ক্রমে ঝরাপাতার দিন গেল, নোতুন পাতার দিন এল, তখন রেণুও বুঝতে পারল তার জীবনে নোতুন অতিথি আসছে, নবনী-রেণুর মধ্যেও একটি নোতুন পাতা ফুটছে। তারপর বৈশাখ এল, শ্রাবণ এল, আশ্বিন এল। রেণু তার একান্ত একাকিত্ব, নবনীশূন্য সময় কি করে কাটিয়েছে? চুপচাপ ভেবে ভেবে। আর সারাটা দিন ঝাঁকড়া-ডাল অশ্বত্থকেই দেখেছে। পাতার শব্দ শুনেছে, পাতার জাফরিতে মধ্যাহ্নের আলো-ঝিলমিল ছায়া দেখেছে।

এরপর এক হেমন্তের অপরাহ্ণে রেণু ফিরে এল হাসপাতাল থেকে, তার কোলে একটি শিশু। শোনা যাচ্ছে শিশুর দুর্বল কান্না। এখন তাকে নিয়েই রেণুর সময় কাটে। এখন রেণু বিরক্ত হয় অশ্বত্থের প্রতি। ওর জন্যই যত পাখি-টাখি, নোংরা-টোংরা, রাজ্যের ময়লা।

রেণু জ্বলে যায়। অশ্বত্থের প্রতি তার বিরাগ প্রকাশ করে। 'যেদিন ছেলে কোলে এসেছে, ওটা যেন আমার সঙ্গে শত্রুতা করছে। ওই শত্রু একদিন আমার সব নেবে! আমি বলছি! তখন দেখব, তোমার কত হাসি থাকে!'

এই ভবিষ্যদ্বাণী 'নিষাদ' গল্পে উচ্চারিত, এখানেও উচ্চারিত। তারপর একদিন রেণুর পুরোনো বান্ধবী আরতির সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে বদলা-বদলি করে রেণু চলে যায় নোতুন বাড়িতে। এখানে অশ্বত্থ নেই, খড়কুটো নেই, ময়লা নেই, রাশি রাশি ঝরাপাতা নেই, পাখিদের অত্যাচার নেই। অবাধ রোদ-হাওয়া কিন্তু হঠাৎই একদিন রেণুর শিশুটি মারা গেল। রেণু চুপ, নবনী চুপ, নোতুন বাড়িটাও চুপ। "এক-একটা দিন কি দীর্ঘ এবং দুঃসহ, আর কি ভীষণ কষ্ট এই সময়ের ঢিলেঢালা চলনে, রেণু আস্তে আস্তে তা

বুঝতে পারছিল। তার সময় ফুরোয় না।"

অশ্বত্থ গাছটা তার শত্রু। তার খোকনকে ওই রাক্ষুসে-গাছটা সহ্য করল না। প্রতিশোধ নিল। "মনে মনে গাছটাকে কুটিকুটি করেও রেণুর আক্রোশ মেটে না।"

তারপর এক দুপুরে যখন আকাশ মেঘলা, মাঠ-ঘাট খাঁ-খাঁ করছিল, বেশ একটা তাপ ফুটছিল, রেণু যেন কখন সদর খুলে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থম্‌থমে রিক্ততা দেখছিল। পরক্ষণেই একটা পাক-খাওয়া বাতাসের ঢেউ এল। ধুলো উড়ল। আর ধুলোর সঙ্গে মিশে একটা শুকনো অশ্বত্থ পাতা এসে পড়ল রেণুর বুকে, বুকের মাঝটিতে শাড়ির ভাঁজে আটকে গেল। রেণু হাত দিয়ে ফেলতে গিয়ে চমকে উঠল। ওই তো দূরে সেই কোয়ার্টার্স, সেই অশ্বত্থ গাছ। সব যেন তাকে টানছিল—মেঘলা দুপুর, ঘূর্ণি, খাঁ খাঁ মাঠ-ঘাট, দূর অশ্বত্থের শাখা-প্রশাখা-পল্লব। ওর দিকে তাকিয়ে রেণু সব ভুলে গেল। শুধু গাছ—ওই অশ্বত্থই হাওয়ায় হাওয়ায় অদ্ভুত চুপ শিস্‌-শিস্‌ শব্দে তাকে ডাকছিল। রেণুর চেতন ছিল না। অদ্ভুত এক ঘোরে, নিশিতে পাওয়া মানুষের মতন ঘুমের আচ্ছন্নতায় রেণু পা-পা করে টলে টলে হেঁটে চলল। তারপর একসময়ে সেই অশ্বত্থের সামনে। গাছটার তলায়। মাটিতে পাথরে ঢিবিতে শিকড়ে একটু অদ্ভুত অন্ধকার স্তূপীকৃত হয়ে আছে।···অশ্বত্থের সেই ভারি কালো গুঁড়ির ফাটা, ঠুকরানো কঠিন দেহ কেমন এক জাদুতে খুলে গিয়ে খুব নরম এক হৃদ্‌পিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছিল।···রেণু জানে না, তার খেয়ালই নেই, কখন সে ধীরে ধীরে তরুতলে বসে পড়েছে, হাত দিয়ে গা ছুঁয়েছে—সেই তরুর, ঝুরি ধরে থেকেছে মুঠো করে। তারপর কখন অচেতনে বুক উপুড় করে আঁকড়ে ধরেছে সেই বিশাল তরুর গুঁড়িটা।"

তারপর আরতির ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে রেণু ফিরে যাচ্ছিল। "আর মনে হচ্ছিল, একদিন বুকের যে টন্‌টন্‌ ব্যথা তার অসহ্য—অসহ্য ছিল, আজ এখন সে ব্যথা যেন অনেক কমেছে।

সত্যি, অনেক কমেছে!

দুধ খাইয়ে। আর এক অবোধ শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে খুব নিশ্চিত মনে এবার ফিরেই যাচ্ছিল। তার সংসারের কাজেই যেন।"

এখানেই গল্পের শেষ। এখানেই বিমল করের স্বাতন্ত্র্য নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত। এ গল্প সাধনা-হিতবাদীর যুগে লেখা সম্ভব ছিল না, কল্লোল-

বিচিত্রায় না। ভারতবর্ষ-প্রবাসীতে না। এ গল্প শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে-ই লেখা সম্ভব হয়েছে। ইঙ্গিতময় ঋজুভাষা, সংকেতগর্ভ বাক্‌প্রতিমা, বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা, মননধর্মী দৃষ্টি, জীবন সম্পর্কে নিজস্ব গভীর প্রত্যয়—সবকিছু নিয়ে সাম্প্রতিক ছোটগল্পকে (এবং উপন্যাসকে) সবচেয়ে চিহ্নিত করেছেন যিনি, তাঁর পক্ষেই এ গল্প লেখা সম্ভব। বিমল করের নিজস্বতা এখানে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত। সেই অনিবার্য নিঃসঙ্গতা, মৃত্যুর চেতনা, মৃত্যুপটভূমিতে জীবন-বোধ, সেই তীক্ষ্ণ মনন, অন্তর্মুখীনতা, জীবনসন্ধানে সেই একাগ্রতা ও সদা অপরিতৃপ্তি, অন্তরলোকের চিন্তার সঙ্গে বহির্লোকের ক্রিয়ার জটিল যোগসূত্র আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা—সবকিছুই বিমল করকে বাংলা ছোটগল্পের এক অসামান্য শিল্পীরূপে, অন্যতম অধিনেতারূপে দাঁড় করিয়েছে।

॥ পাঁচ ॥

১৩৫০ থেকে ১৩৭০ বঙ্গাব্দ—বিশ বছরে তিয়াত্তরটি গল্প লেখেন। সংকলিত হয় "গল্প সমগ্র" গ্রন্থে। বছরে চারটি গল্প। এখন নাকি আরো কম—বছরে দু'টি গল্প। লেখকের নাম রমাপদ চৌধুরী। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে অভিনবত্বে বাংলা সাহিত্যের ভূগোলকে যাঁরা বিস্তৃত করেছেন, তাঁদের অন্যতম। কিন্তু এখন বৈচিত্র্য তাঁকে টানে না, 'ফর্ম' বা 'কনটেন্ট'-এর নোতুন পরীক্ষায় তাঁর আগ্রহ। রাঁচি-পালামৌ-মুরী-হাজারিবাগের পটভূমিতে লেখা গল্পগুলি প্রথম পড়ার সময় যে বিস্ময় ও আনন্দ, তা আজো সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। 'দরবারী,' 'রেবেকা সোরেনের কবর,' 'নারীরত্ন,' 'উত্তরাধিকার', 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী,' 'ভারতবর্ষ'—এই সব গল্পে অরণ্য আর অরণ্যহৃদয়ের চরিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। অরণ্যের আদিমতা মানুষকে যেভাবে গড়ে তুলেছে, তা আমাদের চেনা অভিজ্ঞতার বাইরে। সেই অচেনার বিস্ময়কে তিনি নিপুণভাবে এঁকেছেন।

অন্যদিকে পরিচিত শহুরে পটভূমিতে মধ্যবিত্ত মানসকে, তার সমস্ত আত্মপ্রতারণা ও বিবেকদংশনকে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের মুখে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানেই রমাপদ চৌধুরী আধুনিক মননের শিল্পী। 'আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া,' 'ঈর্ষা,' 'ফ্রিজ,' 'একটি মানিব্যাগ ও একফালি হাসি,' 'বন-বাতাস,' 'ঠগ,' 'মেকি,' হিসেবী, 'ঘুম,' 'তমোগাহন,' 'অঙ্গপালি,' 'জ্বালাহর,

'আতসী উজ্জ্বল,' 'স্ত্রৈণ,' 'সহযোগ, 'মনবন্দী', 'রুমাবাঈ'—এইসব গল্প মধ্যবিত্ত চেতনার বিচিত্র রূপকে বিশ্লেষণ করেছে।

রমাপদ চৌধুরীর কোন ধরনের গল্প আমাকে বেশি আকর্ষণ করে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হই। 'রেবেকা সোরেনের কবর' আর 'দরবারী' আমাকে একদিকে টানে, অপর দিকে 'স্ত্রৈণ' বা 'জ্বালাহর' টানে। আধুনিক মননেরই শেষ পর্যন্ত জয় হয়। 'জ্বালাহর' গল্পের নায়িকা দুই বোন শ্যামলী আর শিউলি। শ্যামলীর স্বামী ইন্দ্রনাথ প্রতি রাতে মত্তাবস্থায় বাড়ি ফেরে। ফিরেই স্ত্রীকে প্রহার দেয়, বেত মারে। শিউলি প্রতি রাতে শ্যামলীর কান্না শোনে, কিন্তু প্রতিকারের সামর্থ্য তার নেই। ভগ্নীপতি তার উপদেশে কর্ণপাত করে না, বরং শ্যামলীর লাঞ্ছনা বাড়ে।

"শেফালী আর শ্যামলী। দু বোন, বন্ধুও। আদরে আহ্লাদে ক্রোধে কান্নায় একসঙ্গে মানুষ হয়েছে। কৈশোরের ঘনিষ্ঠ বন্ধন। যৌবনের চঞ্চলতা। হ্যাঁ, ওদের একজনের প্রথম যৌবনের উৎসুক আবেশ আর ব্যর্থ বিহ্বলতা আরেকজনের কাছে গোপন থাকে নি।"

তাই শিউলি (শেফালী) ভাবে কী করে সে শ্যামলীকে সান্ত্বনা দেবে, অপমানের জ্বালা মুছে নেবে।

এক রাতে মত্ত ইন্দ্রনাথ বাড়ি ফিরে যে মুহূর্তে শ্যামলীকে প্রহারে উদ্যত সে মুহূর্তে "বাতাস চিরে চিরে ভেঙ্গে পড়লো একটা ভীতিবিহ্বল নারীকণ্ঠের চীৎকার।" চমকে উঠল শ্যামলী, ইন্দ্রনাথ। "শিউলির কণ্ঠস্বর। ওরা দুজনেই বুঝলো।" শুধু সেই রাত নয়, প্রতি রাত। ঠিক ঐ মুহূর্তে—যখন ইন্দ্রনাথ বাড়ি ফেরে। তা'হলে স্বামী সুরঞ্জনের হাতে শিউলি লাঞ্ছিত হচ্ছে? "মায়া হয়। বেদনা বোধ করে ইন্দ্রনাথ। শিউলির জন্যে। আর সুরঞ্জনের উপর ক্রোধ।" আর এ ঘটনা থেকেই মোড় ফিরে গেল ইন্দ্রনাথের জীবনে। বিকেলে আপিসের পর বাড়ি ফিরে আসে, সন্ধ্যায় নেশার টানে বের হয় না, শ্যামলীকে টুকিটাকি সাহায্য করে, রাত ঘন না হতেই দু'জনে খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে। "কিন্তু ঘুম আসে না শ্যামলীর চোখে। ও অপেক্ষা করে। প্রতিদিনই অপেক্ষা করে থাকে ও যতক্ষণ না শিউলির চীৎকারটা শুনতে পায়। তারপর। একটা দীর্ঘশ্বাস। ....শিউলির চীৎকারটা বড়ো অসহায় করে তোলে শ্যামলীকে। ঠিক ওদের সেই পুরোনো জীবনটাই যেন শিউলিকে ছুঁয়েছে। ......শ্যামলী মনে মনে ঠিক করলে সুরঞ্জনকে ও বাধা দেবে।......

পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল শ্যামলী, নিঃশব্দে। তারপর শিউলির ঘরের দিকে পা বাড়ালে। আর, ঠিক সেই মুহূর্তে চীৎকার করে উঠলো শিউলি।

ছুটে গিয়ে জানালায় উঁকি দিলো শ্যামলী। পর মুহূর্তেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল ও। দেখলে খিলখিল করে হাসছে শিউলি।

হঠাৎ কানে গেল শ্যামলীর—সুরঞ্জন বলছে, কি ছেলেমানুষি করো!

শিউলি হেসে উত্তর দিলো, শ্যামলী তো সান্ত্বনা পায়।"

এই অপ্রত্যাশিত চমকেই গল্পের সমাপ্তি। ঘটনার চমক নয়, অন্তরের চমক।

শ্যামলীর জ্বালা মুছে নেবার এই অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছে শিউলি। শিউলির ভালোবাসা ছলনার আশ্রয় নিয়েছে, তাতেই কাজ হয়েছে। উপদেশে যা হয়নি, আত্মাবমাননায় তা হয়েছে, ইন্দ্রনাথ আর শ্যামলী জীবনের সুস্থতায় প্রত্যাবর্তন করেছে; শুধু তাই নয়, শিউলি সুরঞ্জনকে করুণা করেছে। লেখকের তীক্ষ্ণ অন্তর্বিশ্লেষণ এখানে প্রতিষ্ঠিত।

মনোগহনের চোরাগলিতে যাঁর স্বচ্ছন্দ পরিক্রমা, মনোলোকের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম তরঙ্গভঙ্গের বিশ্লেষণে যিনি অভ্রান্ত, সন্দেহ সংশয় আবেগের রূপায়ণে যিনি নির্মম নিপুণ, সেই সতীনাথ ভাদুড়ী ছোটগল্পকে মনোবিশ্লেষণের বাহন রূপেই ব্যবহার করেছেন। 'বৈয়াকরণ', 'পত্রলেখার বাবা', 'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ', 'বাহাত্তুরে', 'কণ্ঠকণ্ডূতি', 'সাঁঝের শীতল', 'একটি কিংবদন্তীর জন্ম', 'পূতিগন্ধ', 'অভিজ্ঞতা', 'ধস'—এইসব গল্প মনোলোকের তরঙ্গভঙ্গের বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ এত নির্মম, এত নিপুণ, যে মনে হয় কোনো শল্য-চিকিৎসকের হাতের অভ্রান্ত ছুরি দিয়ে মনকে চিরে চিরে দেখা হয়েছে।

এর চমৎকার নিদর্শন "বাহাত্তুরে"। কৃপণ ধনী শ্রীদামবাবুর বিবাহিত জীবন পঞ্চান্ন বছরের। স্ত্রী এগারোটি সন্তানের জননী, হাঁপানি রোগে ভোগেন। বন্ধু নরেন ডাক্তার তাঁর স্ত্রীকে মেটে সিঁদুর ব্যবহার করতে বলেছেন শুনে শ্রীদামবাবুর মেজাজ বিগড়ে গেল। আসল সিঁদুর মুছে ফেলে মেটে সিঁদুর ব্যবহারের অর্থ স্বামীর অমঙ্গল সাধন,—এ কথাটাও কি তাঁর স্ত্রী বুঝবে না? স্ট্রোকের আক্রমণ সামলে ওঠার পরও ঐ বিষয়টি তাঁকে বিচলিত করেছে। তিনি উইল করে স্ত্রীর নামে মেটে সিঁদুরের দরুন মাসে ছয় আনা ধার্য করতে চেয়েছেন, কারণ "মেটে-সিঁদুর ইচ্ছা করলে বিধবারাও

ব্যবহার করতে পারেন। বিধবা হবার চেষ্টাতেও সধবারা ব্যবহার করতে পারেন—নিজেদের স্বার্থ থাকলে!" এখানেই তাঁর সমস্ত ক্ষোভ অভিমান দুঃখ প্রকাশ পেয়েছে। স্ত্রী যখনই একথা শুনে মেটে-সিঁদুর মুছে ফেলে আসল সিঁদুর পরতে দৌড়েছেন তখনি শ্রীদাম ভেবেছেন সেই সংকট-মুহূর্তের কথা—মেটে সিঁদুর মুছে ফেলে আসল সিঁদুর দেবার সময়ের মধ্যে যে ক্ষণিক ব্যবধান—সেইটেই তাঁর সংকট-মুহূর্ত। মৃত্যুভয়ে তিনি বিবর্ণ হয়েছেন আর সে আতংকেই সেই সংকট-মুহূর্তে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। শ্রীদামবাবুর ভয় অভিমান ক্ষোভ দুঃখের আশ্চর্য নির্মম বিশ্লেষণ "বাহাত্তুরে"।

মননঋদ্ধ জীবনদৃষ্টি আর যে দু'জনের গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে, তাঁরা হলেন শ্রীঅন্নদাশংকর রায় ও শ্রীঅমিয়ভূষণ মজুমদার।

'বিচিত্রা' পত্রিকায় অন্নদাশংকরের আবির্ভাব 'পথে-প্রবাসে' লিখে। চল্লিশ বছরে তিনি অনেক গল্প লিখেছেন, 'গল্প' সংকলনে তার অধিকাংশ গৃহীত হয়েছে। কল্লোল গোষ্ঠীর তারুণ্যকে তিনি মেনেছিলেন, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর পাশ্চাত্ত্য যৌবন-বন্দনা। তিনি সবুজপত্রে কখনো লেখেন নি, কিন্তু নিজেকে সবুজপত্রী বলে মনে করেন। প্রমথ চৌধুরীর আশীর্বাদ তিনি পেয়েছিলেন। এ কথার তাৎপর্য, তাঁর গল্প বুদ্ধিদীপ্ত, মননদীপিত। বুদ্ধি ও মননের সঙ্গে যৌবনবেগ ও হৃদয়ানুভূতির হরগৌরী মিলন হয়েছে তাঁর গল্পে। সমস্যার রূপায়ণে নয়, মননপ্রধান সমালোচনায় তাঁর আগ্রহ। গল্পের জন্য গল্প লিখতে তাঁর আগ্রহ নেই। 'স্ত্রীর দিদি', 'উপযাচিকা', 'রূপদর্শন', 'যৌবনজ্বালা', 'রানীপসন্দ' তাঁর উল্লেখ্য গল্প। শিল্পরূপের সমৃদ্ধি, বক্তব্যের ঋজুতা ও ভাষার পরিচ্ছিন্নতা—এইসব গুণ অন্নদাশংকরের গল্পকে এমন এক বিশিষ্টতা দিয়েছে যাকে কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া যায় না।

অমিয়ভূষণ মজুমদার নানা দিক দিয়ে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন। 'পঞ্চকন্যা' (১৯৬২) ও 'দীপিতার ঘরে রাত্রি' (১৯৬৫) সংকলনধৃত গল্পগুলি ছাড়া গত পাঁচ বছরে লেখা তাঁর এইসব গল্প সহজেই মনে পড়ে—'অনির্বচনীয়া', 'অহেতুক', 'ইনফরম্যাল ডিনার', 'ইলেকট্রনিক্স,' 'উরুণ্ডী', 'একটি অ্যাবসার্ড কলম', 'একটি গৃহত্যাগের গল্প', 'একটি দহের গল্প' 'একটি বিপ্লবের মৃত্যু,' 'এপস অ্যাণ্ড পিকক', 'কমিউন', 'চার্জ', 'নাথিং ডুয়িং', 'বিপ্লব', 'বিস্মিতা', 'মিস্টার ফমটি, 'মোহিত স্যানের উপাখ্যান', 'রীতিমতো গল্প', 'স্বর্গভ্রষ্ট,' 'মথুরার ফ্ল্যাট ও মিউজিয়ম', 'দ্য কাসেল'।

ভাষাব্যবহারে তাঁর অমোঘ তীক্ষ্ণতা ও অব্যর্থতা, গল্পকে অনাবশ্যক মেদবর্জিত করে অভিপ্রেত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার একাগ্রতা, বহু কৌণিক জীবনকে তির্যক দৃষ্টিতে দেখার শিল্পসামর্থ্য, সুতীব্র সমাজচেতনার সঙ্গে জীবনের গভীর রহস্যময়তার প্রতি অনিবার্য অঙ্গুলিনির্দেশ—এইসব গুণে অমিয়ভূষণের গল্প এক বিশিষ্ট স্বাদ বহন করে। 'ভূকম্পন' ('দীপিতার ঘরে রাত্রি'), 'সাদা মাকড়সা', (পঞ্চকন্যা), 'একটি দহের গল্প' ('এষা' পত্রিকায় প্রকাশিত), 'তাঁতী বউ' গল্প পড়লেই তা অনুধাবন করা যায়। তাঁর গল্পের উপসংহার ও প্রকরণগত উৎকর্ষ স্মরণযোগ্য।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অমিয়ভূষণ বলেছেন : "কাব্য উপন্যাস ছোটগল্প অথবা নাটক—সবারই একটা উদ্দেশ্য আছে। আপাতত তাকে ঈসথেটিক এন্টারটেন্‌মেন্ট বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ইমাজিনেশ্যনের সাহায্যে নিজেকে নিজের পরিস্থিতিতে জানবার চেষ্টা করা সেই গভীরতায় যেখানে ইনটেলিজেন্স আর দুইয়ে দুইয়ে চার করতে পারে না।"

গল্পকার অমিয়ভূষণের স্বাতন্ত্র্যকে অনুধাবন করা যায় "তাঁতীবউ" গল্পের উপসংহারে—"বর্ষণক্লান্ত আকাশে ভোরের পাখি ডেকে ওঠার আগে সে ফিরে এল। ঘরে তখনো প্রদীপটি জ্বলছে; যেমন সে জ্বেলে রেখে গিয়েছিল। ছেলেটি এখনই জেগে উঠবে। তার আগে একটু বিশ্রাম করতে হবে। স্নায়ুগ্রন্থিগুলো অন্তত একটু স্নিগ্ধ করতে হবে। কিন্তু গোকুলের মুখখানি দেখবার লোভ হল তার। ঘুমটা আজ ভালই হচ্ছে গোকুলের। কয়েকবিন্দু স্বেদ যেন দেখা দিয়েছে, আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিল তাঁতীবউ। এবার আবার কান্না পাচ্ছে। কিন্তু কাঁদলেও সময় নষ্ট হবে খানিকটা। সকলেরই বিশ্রাম নেবার অধিকার আছে এ পৃথিবীতে, তারও আছে।

মাটিতে শুয়ে দেখতে-দেখতে তাঁতীবউ ঘুমিয়ে পড়ল।"

এই অনিবার্য উপসংহার বিস্মৃত হবার নয়।

॥ ছয় ॥

বিচিত্রা পত্রিকাতেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম আবির্ভাব। জগদীশ গুপ্তের নির্মোহ বিজ্ঞানদৃষ্টি ও সমাজচেতনার উত্তরাধিকারী রূপে সেদিন

তিনি দেখা দিয়েছিলেন। আজ মানিক নেই, কিন্তু তাঁর প্রভাব তাঁর পরবর্তী-দের মধ্যেই কেউই অতিক্রম করতে পারেন নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের রহস্যময়তার অনুসন্ধান করেছিলেন, সমকালীন কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মতো বিদেশী প্রেরণায় তা করেন নি, জীবনের নিজস্ব আকর্ষণেই তা করেছিলেন। প্রত্যক্ষের আড়ালে জীবনের যে জটিলতা, যে রহস্যময়তা, তাকে তিনি জানতে চেয়েছিলেন। লেখক হিসেবে তিনি ছিলেন চরিত্রের প্রতি নিরাসক্ত, পক্ষপাতশূন্য, আবেগ বিষয়ে নির্বিকার। তাৎক্ষণিক থেকে চিরায়ত সমস্ত বিষয়ে প্রত্যক্ষের অন্তরালে জটিলতাকে আবিষ্কার করতে ও তার স্বরূপ সন্ধানে ব্যগ্র হয়েছিলেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই জীবনদৃষ্টিকে স্বীকার করে নিয়েছেন নরেন্দ্র-নাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও সন্তোষকুমার ঘোষ, কিছুটা সমরেশ বসু।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সমরেশ বসুর মিল কোথায়? একটিমাত্র, আর তা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে—দু'জনেই জীবনের গভীর নির্মম কঠিন অভিজ্ঞতার 'পরে নির্ভরশীল। সমরেশ বসুর ছোটগল্পে প্রথমেই যা পাঠককে টানে তা হল জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র সব চরিত্র। তারপরই টানে তাঁর গল্পের ভাষা আবেগনির্ভর অভিজ্ঞতাঋদ্ধ জীবনঘনিষ্ঠ। সমাজের নীচু তলার লোক, অন্তেবাসী, অবজ্ঞাত গরীব মানুষের ঘরের ছবি, ভেতরের জীবন, মুখের ভাষাসমেত তিনি সাহিত্যের দরবারে এনে দিয়েছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির তীব্রতা তাঁর গল্পকে দিয়েছে বিশিষ্টতা। 'আদাব', 'প্রতিরোধ', 'জলসা', 'জোয়ারভাঁটা', 'পসারিণী', 'অকাল বসন্ত', 'ধুলিমুঠি কাপড়', 'তৃষ্ণা', 'আলোর বৃত্তে', 'পাড়ি', 'আর একটি মানুষ', 'শানা বাউরীর কথকতা', 'তৃষ্ণা', 'সহযাত্রী', 'শেষ মেলায়', 'গুণিন', 'প্রত্যাবর্তন'—এইসব গল্পে জীবনকে, শুধু জীবনকেই জয়যুক্ত করা হয়েছে। মানুষের জীবন যত অধঃপতিত লাঞ্ছিত হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত জীবনেরই জয় হবে: এই পরম আশ্বাস এই সব গল্পে আছে।

অপরদিকে 'ক্রীতদাস', 'পাপ-পুণ্য', 'স্বীকারোক্তি,' 'আলোয় ফেরা', 'নটপুত্ত', 'মাঝখানে'—পরবর্তী পর্যায়ে রচিত ছোট গল্প। আধুনিক গল্পের আত্ম-আবিষ্কার ও আত্ম-জিজ্ঞাসা এখানে রূপায়িত। মানুষের অস্তিত্বের চরম সার্থকতা সংক্রান্ত প্রশ্ন এসব গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। ব্যক্তির ভয়াবহ শূন্যতা, যন্ত্রণা আর তা বরণে সাহসিকতা, জীবনসত্যের অন্বেষণে নির্মম

নিরাসক্তি—সমরেশ বসুর জীবনদৃষ্টিকে নোতুন রূপে উদ্‌ঘাটিত করেছে।

পঁচিশ বছরে (১৯৪৬-৭০) সমরেশ বসু দু'শ'র বেশি গল্প লিখেছেন। এইসব গল্পে জীবনের বৈচিত্র্য, জীবনের সংগ্রাম, এ দু'য়েরই প্রাধান্য। বিপুল জীবনঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা কল্পনাযোগে বিশ্বাস্য ও সজীব হয়ে উঠেছে। প্রগাঢ় মানবিক আবেগ ও দুর্মদ সহানুভূতিতে লেখক তাঁর সৃষ্ট বিচিত্র চরিত্রগুলির সঙ্গে সহজেই একাত্ম হয়ে যান, তাদের জীবনের বিচিত্র সুখদুঃখের অংশীদার হয়ে যান। আর সেইসব সুখদুঃখ প্রকাশে সমরেশ বসু বিচিত্র প্রকরণ আশ্রয় করেছেন—কখনো বিশাল ক্যানভাস, কখনো বিশেষ পরিধি-বেষ্টিত মঞ্চে নির্দিষ্ট আলোর বৃত্ত, কখনো বা পরিবর্তমান পটভূমি। কখনো চরিত্রের আত্মকথন, কখনো লেখকের প্রবল আবেগে কম্পিত বর্ণনা, কখনো বা নিরাসক্ত নির্লিপ্ত বর্ণনা ও বিশ্লেষণ। সবটা মিলিয়ে অনিবার্য 'এফেক্ট', যা সহজেই পাঠককে অভিভূত করে।

'আলোর বৃত্তে' গল্পের টগর আর কেদার, 'আটাত্তর দিন পরে' গল্পের ফটিক জীবনের স্বাদ পেয়েছে। সে স্বাদ লবণাক্ত, রক্তাক্ত। জীবনের সুন্দর তাদের জন্যে কেনা ছিল না। সুখ তাদের পোষা ময়না নয়। তবু হারতে হারতে মরতে মরতে লড়তে লড়তে তারা জীবনকেই জয়যুক্ত করেছে, জীবনকে হত্যা করে নি।

'আলোর বৃত্তে'র নায়ক গরীব নমঃশূদ্র কেদার, বয়স ২৬, নায়িকা তার স্ত্রী টগর, বয়স কুড়ি। টগরের সাত বছর বয়সে কেদারের সঙ্গে বিয়ে হয়। তারা উদ্বাস্তু, বস্তিবাসী। কেদারের হাতে কোনো কাজ নেই। সরকারী ডোল বন্ধ হয়ে গেছে। কেদার অনেক রকম কাজের ধান্দা করেছে, কিন্তু কিছু পায় নি। কেদার কখনো ঝাঁকা মুটে, কখনো মাল খালাসের কুলী। কিন্তু তাতে আর চলে না। মানুষ নামের পরিচয়টা ভুলেই গিয়েছে বোধ হয়।

তারপর এলো টগরের সাজবার পালা। সন্ধেবেলা সেজেগুজে পান খেয়ে ঠোঁট রাঙিয়ে বস্তী ছেড়ে বেরুত টগর। কেদারের মাথা থেকেই বুদ্ধিটা বেরিয়েছিল—'শুধু টোপ দেখিয়ে মাছ ধরা'। টগরকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেত বিষ্টু আর রতন। তারা থাকত দূরে দূরে। ফূর্তিলোভী একটি মানুষ আসছে। "শিকার সামনে। আস্তে চল। আরো আস্তে। তাকাও। একটু হাসো। বারে বারে তাকাও। অন্যদিকে তাকাবার অবসর দিও না। আর একটু হাসো। ভয় নেই, চোখ নামিও না। দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে পড়।"

ব্যস্, তারপরই জালের মধ্যে ধরা পড়ত শিকার। এগিয়ে আসত বিষ্টু আর রতন। শিকার বুঝে দরাদরি, টানাটানি। হাতের মুঠোয় ধাতু আর আর কাগজের মুদ্রা।

ভীত সন্ত্রস্ত টগর ফিরে আসত। শূন্য নিষ্পলক নত দৃষ্টি। মুখটা রক্তহীন ফ্যাকাশে। লজ্জায় সে মরে যেত '

"কেদার বলত, নে রাখ, এই নিয়ে আবার লজ্জা! এতে তোরই বা কি আমারই বা কি। তুই আর আমি তো সাচ্চা আছি।"

সেই কেদার আজ টগরকে সন্দেহ করে। টগরকে টেনে নিয়ে চলেছে রেললাইনের বাঁধের উপরে। আজ সে কস্‌বীকে খুন করবে।

"সাচ্চাগিরি দেখাচ্ছে আমাকে।

কেদার চাপা গলায় ফুঁসে উঠল। আর ক্রমাগত নিচু পথটার জল-কাদার ওপর দিয়ে ছপ্ ছপ্ করে এগিয়ে চলল। পরমুহূর্তেই দাঁতে দাঁত পিষে উচারণ করল, ঢেম্‌নি!

টগরের চোখেও যেন একটা হিংস্রতা দপ্ করে জ্বলে উঠল এবার। ঠোঁটে ঠোঁট আরও শক্ত করে চেপে বসল।······চাপা তীক্ষ্ণ স্বর শোনা গেল তার,—লজ্জা করে না।

—চুপ।

সজোরে কনুইয়ের ধাক্কা এসে লাগল পাঁজরে। কিন্তু টগর থামল না······ আবার উচ্চারণ করল, মুরোদ!

—চুপ বল্‌ছি!

প্রায় চেঁচিয়ে গর্জে উঠল কেদার।"

প্রথমে যা ছিল দুজনের বোঝাপড়ার খেলা, পরে তা হয়ে উঠল মর্মান্তিক। কেদার বলত, 'তুই আর আমি তো সাচ্চা আছি।' স্বভাবতই রতন আর বিষ্টু হয়ে উঠেছিল অন্তরঙ্গ। সাচ্চা প্রাণের ভয় কি! সাচ্চা প্রাণ, ঝুটা কাজ। ভয় কি!

তবু তো দু'জনের মধ্যে ব্যবধান গড়ে উঠল। রতন আর বিষ্টু আরো দূর অন্ধকার পথের সংকেত দেখাচ্ছিল। তাকে তো সাচ্চা প্রাণের মুখথাবড়ি দেওয়া যায় নি। টগরের প্রাণে অশুভ ছায়া। ব্যথা, হতাশা দেখা দিচ্ছিল। আর কেদার রুদ্ধবাক, স্তব্ধ, তার চোখে জ্বলন্ত বিতৃষ্ণা।

আজ রাতে কেদারের সেই অকারণ বিতৃষ্ণা স্তব্ধতা ক্রোধ ফেটে পড়েছে।

কেদার দাঁতে দাঁত পিষে বলল, অসৎ, কুলটা। টগরকে ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল। টগর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। কপালটা কেটেছে, রক্ত পড়ছে। চোখে আগুন আছে কিনা বোঝা যায় না, কিন্তু জল নেই এক ফোঁটা।

"হিংস্র চাপা গলায় দ্রুত বলে উঠল কেদার, এবার বুঝতে পারছিস, কোথায় নিয়ে আসতে চেয়েছি তোকে ?......

টগর নিচু স্পষ্ট গলায়, দূরে চোখ রেখে বলল, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু মিছে কথা বল না।

—মিছে কথা ? তুই কুলটা নস্ ?

—না ?"

কেদার, হিংস্র উন্মত্ত কেদার আবার টগরকে সজোরে আঘাত করল। টগর আবার ছিটকে পড়ল। চোখের কোলে রক্ত, মুখের পাশে কাদা, খোঁপা ভেঙে পড়েছে, চুড়ি ভেঙে গেছে। কিন্তু মুখ কঠিনতর। ঠোঁট যেন চির আবদ্ধতায় শক্ত।

"কেদারের গর্জন শোনা গেল, কসবী !

টগর মুখ না ফিরিয়েই আবার বলল, মিছে কথা বল না !

কেদার বলল, চুপ ! চুপ ! আমি জানি না ? আমি বুঝি না ? নষ্ট ছাড়া আর কারা এসব করে ?

—তুমি বলেছিলে ?

—তাই ? তাই বুঝি ? তা'হলে এই করেই তোকে চিনতে পেরেছি। বেশ্যা !

এবার সহসা যেন রুদ্ধশ্বাসে বলল টগর। ও কথাটা আর বল না।

—বলব !

বলেই টগরের চুলের মুঠি ধরে কয়েক পা অগ্রসর হয়ে ঠেলে দিল কেদার। বলল, চল। ওই উঁচুতে তোকে টুকরো করে রেখে যাব।"

টগর পড়ে গেল না। চলতে লাগল। বিদ্যুৎ সারা আকাশটাকে একটা ফালা দিল। বায়ু কোণ থেকে সারা আকাশে ঘন ঘন চমক লেগেছে। বদ্ধ বাতাস খুলে গেছে। এই প্রলয়ের অন্ধ আকাশতলে দু'টি নরনারী। আর দূরে একটি অস্পষ্ট আলোর ইশারা—ইঞ্জিনের ঝক্‌ঝক্ শব্দ এগিয়ে আসছে।

"ক্রুদ্ধ কেদার চাপা গলায় বিড় বিড় করে ওঠে, তোর চিহ্ন আমি শেষ

করব। লোপাট করব। আমি আর পারছি না। তোকে নিয়ে আমি আর……” “আর হঠাৎ কেদারের খেয়াল হল, টগর তার আগে আগে, দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এবং দেখতে দেখতে, টগর দৌড় দিল। ছুটল উঁচু রেখার দিকে, যেখানে তীক্ষ্ণ আলোর বৃত্তটা ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে, এগিয়ে আসছে। ধোঁয়া উড়িয়ে, ভারী মালগাড়ি বেগে মাটি কাঁপিয়ে ছুটে আসছে।

কেদার চকিতে একবার থমকে দাঁড়াল। এবং মুহূর্তে তার সমস্ত অনুভূতি কাঁপিয়ে, তার মুখ দিয়ে আপনি উচ্চারিত হল, ও মরতে যাচ্ছে।……

কথাটা মনে হতেই তার বুকের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা বিদ্যুতের মতো চিরে দিয়ে গেল। হঠাৎ ভয়ে এবং একটা তীর-বিদ্ধ কষ্টে সে চীৎকার করে উঠল, 'টগর! যাস্ না। টগর বড় কষ্টে……'

কথা শেষ হল না। কেদার ছুটল। আলোর বৃত্ত সামনে। সেই আলোর টানে যেন তীর বেগে ছুটেছে টগর। ইঞ্জিনের গর্জনে একটা ক্ষুধার চীৎকার উঠছে। এবং টগর, তখনো উচ্চারণ করছিল, বল না, ওগো বল না।

কেদার প্রাণপণ বেগে ছুটতে ছুটতে কেবল উচ্চারণ করছিল, টগর, আমাকে ফেলে যাস না। টগর তখন তোর সাত বছর……

আলোর বৃত্তটা পার হয়ে গেল। তারপরেই নিকষ অন্ধকারে, লাইনের বাইরেই সম্ভবত জড়াজড়ি করে পড়ে গেল দু'জনে।”

এখানে জীবনের জয় হল। টগর-কেদারের ভালবাসা সমস্ত ঘৃণা ক্রোধ অবিশ্বাস সংশয়ের উপরে জয়লাভ করল।

মানুষের জীবন যত অধঃপতিত লাঞ্ছিত হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত জীবনেরই জয় হবে : এই পরম আশ্বাসে গড়ে সমাপ্তি।

এই আশ্বাস, এই জীবনানুরাগ সমরেশ বসুর গল্পের প্রথম ও শেষ কথা।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পজিজ্ঞাসাকে পরিবর্তিত করে গ্রহণ করেছেন। প্রত্যক্ষ সরল থেকে অপ্রত্যক্ষ জটিলতায় মানিকের স্বচ্ছন্দ পদচারণা। জীবনের জটিলতার শিল্পী মানিক পরবর্তী কথাসাহিত্যকে প্রভাবিত করেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। নরেন্দ্রনাথের গল্পে তা সমর্থিত হয়। তবে নরেন্দ্রনাথ মানিকের মতো নিরাবেগ নিষ্ঠুর স্টোইক শিল্পী নন, বরং আবেগসমৃদ্ধ মমত্ববোধসম্পন্ন শুভ বিশ্বাসী শিল্পী। মিল এখানে যে, দু'জনেই মানুষের মনোলোকের জটিলতাকে দেখেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন।

সমাজবদ্ধ জীব মানুষ, অথচ সে ব্যক্তি হিসেবে সমাজ-শাসনের প্রবল অভিভব অস্বীকার করে। তা করে বলেই মানুষের বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে জটিলতা ও রহস্যময়তা থেকে যায়। তা আবিষ্কারের চৈতন্য ও শিল্পসামর্থ্য মানিকের ছিল, তা নরেন্দ্রনাথেও বর্তেছে। মানিক আরো অগ্রসর হয়েছেন; সমাজনীতি ও রাজনীতির পরিবর্তমান মূল্যবোধের পটভূমে মানুষকে দেখেছেন। নরেন্দ্রনাথ সে দিকে অগ্রসর না হয়ে মধ্যবিত্ত মানসকেই বার বার ঘুরিয়ে দেখেছেন। তাঁর এই দেখায় ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই। এই দেখা বাইরের দেখা নয়, তার চেয়ে কিছু বেশি: রক্তমাংসের উপাদানে গঠিত মানুষের কিছু অতিরিক্ত সংজ্ঞা ও পরিচয় তিনি দিতে চেয়েছেন। বাংলাদেশে কালান্তরের পর্বে (পঞ্চম দশকে) নরেন্দ্রনাথ লিখতে শুরু করেছেন। সমাজের ভাঙাগড়া, মূল্যবোধের ভাঙাগড়া সবই তিনি দেখেছেন, যেমন দেখেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু ও আরো অনেকে।

গরীব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নানা বৃত্তির নানা মানুষকে, তাদের বিভিন্ন সম্পর্ককে, পারস্পরিক সংঘাত ও অন্তর্সংঘাতকে নরেন্দ্রনাথ গল্পে ধরেছেন। কেবল সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত নয়, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির জীবনের জটিলতা নরেন্দ্রনাথের সূচীমুখ বিশ্লেষণে ধরা পড়েছেন। মধ্যবিত্ত মানুষের বৈধ-অবৈধ প্রণয় সম্পর্ককে তিনি নানা দিক থেকে খুঁটিয়ে দেখেছেন। দুর্জ্ঞেয় মনের রহস্য উন্মোচনে যে প্রখর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা সুলভ নয়। নরেন্দ্রনাথ হৃদয়ের নিপুণ বিশ্লেষক, জীবনের জটিলতার রূপকার।

তাঁর অজস্র গল্পের মধ্যে একটি বা দু'টি নির্বাচন করতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে যেতে হয়। সে ব্যর্থ প্রয়াস না করে একটি সাম্প্রতিক গল্পকে নেওয়া যাক: 'অভিসার' (শারদীয়া দেশ, ১৩৭৬)। নরেন্দ্রনাথের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এখানে প্রকট।

গল্পটির কাহিনীভাগ সামান্য, ঘটনাস্রোত মন্থর, চরিত্রসংখ্যা স্বল্প। নায়িকার অন্তর্সংলাপ ও আত্মকথনই গল্পকে ভরে রেখেছে। প্রাক্তন প্রণয়ী বর্তমানে টি. বি. রোগী সুবীরকে হাসপাতালে দেখতে যায় নন্দিতা। যাবার আগে সিঁদুর মুছে ফেলে, শাঁখা খুলে রাখে। সুবীরকে জানাতে চায় না যে, সে সম্প্রতি বিবাহিতা। কিন্তু এই ভাবে আর কতদিন নন্দিতা সুবীরকে ভোলাতে

যাবে? সে আর পারে না, তার দেহেমনে জমে উঠেছে ক্লান্তি।

বান্ধবী তপতীর বাড়িতে কুমারী সেজে, স্বামী-শাশুড়ীকে না জানিয়ে নন্দিতা মৃত্যুপথযাত্রী প্রাক্তন প্রণয়ী সুবীরকে হাসপাতালে দেখতে যায়। সহানুভূতি সান্ত্বনা ও ভালবাসা জানাতে যায়,—ছলনা করতে যায়। কিন্তু ক্লান্তিতে নন্দিতা আচ্ছন্ন।

তপতীর প্রশ্ন, 'ক্লান্তি লাগে তো আসিস কেন?'

"নন্দিতা এ কথার কোন জবাব দিল না। আসে যে কেন সে কি নিজেই তা জানে? শুধু আসাই তো নয়, ছলনা করতে করতে আসা, আবার এসেও ছলনা করা। এর মধ্যে যেটুকু ঝুঁকিই থাক আছে। ধরা পড়লে স্বামীর কাছেই কি কম কথা শুনতে হবে? সবই জানে নন্দিতা। তবু নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। সে যেন নিজে আসে না। বাইরের অন্য কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে টেনে আনে। তাকে দিয়ে যেটুকু যা করবার করিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেয়। মাঝে মাঝে এমনো মনে হয় নন্দিতার।"

চিররুগ্ন সুবীর মাঝে মাঝে অনুযোগ দেয়, রাগ করে, অভিমান করে। 'আগের মত তুমি আমাকে আর ভালবাস না।'

"এই অবুঝ চিররুগ্ন মানুষটিকে কী করে বোঝানো যায় ভালোবাসা প্রতি মুহূর্তে এক রকম থাকে না। রোজ এক রকম থাকে না। সেই স্রোতেরও জোয়ার-ভাঁটা আছে।"

শয্যাবন্দী সুবীর অনুযোগ দেয় চিঠি লিখে,—'নন্দিতা, তুমি যদি আমাকে আরো বেশি ভালোবাসতে, আগের মত ভালোবাসতে তা হলে আমি ঠিক সুস্থ হয়ে উঠতাম। আমি তা হলে ফের সব পারতাম নন্দিতা।'

"সুবীর নামযশের কাঙাল নয়, শুধু ভালোবাসার কাঙাল। ও কি জানে না কাঙালকে বেশি দিন ভালোবাসা যায় না। শুধু অনুকম্পা করা যায়, করুণা করা যায়। সেই স্নেহ প্রীতি করুণাও যে বেশি দিন স্থায়ী হয় না তাও তো নন্দিতা দেখেছে।"

কিন্তু এভাবে বেশি দিন চলে না, চলতে পারে না। নন্দিতা কলকাতা ছেড়ে চন্দননগরে স্কুলে চাকরি নিল। কর্মস্থলে খ্যাতি, প্রশংসা, আনুগত্য, স্নেহ তাকে বাঁধল। সুবীরকে দেখতে আসা কমে গেল, সুবীরকে সে দূরে ঠেলল। দু'জনের সম্পর্কের চিড় ধরেছিল আগেই, এবার ফাটল ধরল। সুবীরের অভিমান আবেগ উচ্ছ্বাস অভিযোগ প্রবল ও অবিরল হয়ে উঠল।

চিঠির পর চিঠিতে সুবীর নন্দিতাকে অতিষ্ঠ করে তুলল। 'তুমি এত নিষ্ঠুর এত হৃদয়হীন ?'—সুবীরের প্রতি চিঠিতে এই গঞ্জনা। এতে নন্দিতার সহৃদয়তা বাড়ল না। সে ভাবল এ কোন ধরনের পুরুষ যার বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান নেই, সব শেষ হয়ে গেছে শুনেও যে ছেড়ে দিতে চায় না। কী করে এই কারাগার থেকে নন্দিতা রক্ষা পাবে ? কোথায় তার মুক্তি ? কোথায় তার আশ্রয় ? শেষ পর্যন্ত আশ্রয় মিলল—মা-বাবার অনুনয়ে নন্দিতা এক মধ্যবয়সী কর্মব্যস্ত মানুষকে বিয়ে করল। স্বামী মণিময় সুবীরের বিপরীত, উচ্ছ্বাস উচ্ছৃঙ্খলতা আবেগসর্বস্বতা নেই, সে তার আপিসের কাজ নিয়ে সদাব্যস্ত, প্রায়ই ট্যুরে চলে যায়। মণিময় বস্তুবাদী কর্মব্যস্ত কর্তব্যপরায়ণ স্বামী।

নন্দিতা তার দুর্জ্ঞেয় মনকে চিনতে পারেনি। তাই এমন স্বামী পেয়েও সে সুখী নয়, অথচ রোগজীর্ণ সুবীরের প্রতিও তার আসক্তি আর নেই।

"এখানে (স্বামিগৃহে) এসে যেটুকু প্রয়োজন তা নন্দিতার মিটেছে। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেটুকু তা নাগালের বাইরেই রয়ে গেল। আর একজন ছিল অন্যরকম। প্রয়োজনের যে দাবি তার সিকির সিকিও তার কাছে মিটত না। সে দিত প্রয়োজনাতীতের সুধা। যা হাওয়ায় ভাসে হাওয়ায় মিলায়।

নন্দিতার কেন যেন মাঝে মাঝে মনে হয় এক নিগড় থেকে পালিয়ে এসে সে আর এক নিগড়ে এসে পড়েছে।"

তাই সে আবার হাসপাতালে মৃত্যুপথযাত্রী সুবীরকে দেখতে যায় কুমারী সেজে। কারণ বিবাহিতা বেশে গেলে সুবীরকে দুঃখ দেওয়া হবে। তার চেয়ে একটু মধুর মিথ্যায় তাকে শান্তি দিতে ক্ষতি কি। তাই সে কুমারী সেজে সুবীরকে সান্ত্বনা দিতে যায়। অথচ ক্লান্তি বোধ করে। হয়তো সুবীর সবই জানে। জেনেও চুপ করে থাকে। হয়তো নন্দিতার নিখুঁত অভিনয়টুকু উপভোগ করে। হয়তো নন্দিতার ছলনা সুবীরের কাছে ধরা পড়ে গেছে। এই সংশয় নিয়ে লুকোচুরিতে কি কোন মজা থাকে ?

মজা থাকুক আর না থাকুক নন্দিতা আর বেশিদিন এভাবে লুকিয়ে টি. বি. হাসপাতালে সুবীরকে দেখতে আসতে পারবে না। তাকেও এবার যেতে হবে হাসপাতালে—কোন অসুখের নয়, যেখানে শিশুর জন্ম হয়। এই ইঙ্গিতে গল্পের সমাপ্তি।

সম্পর্কের জটিলতা, মনের দুর্জ্ঞেয়তা আর বাস্তবের কঠিন দাবির প্রতি

আনুগত্য নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পকে দিয়েছে এক বিশিষ্টতা যা আমাদের ভাবায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক উত্তরাধিকারী, বোধ করি, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। তিনি জনপ্রিয় গল্পকার নন, সাধারণ পাঠকের ঔদাসীন্য দ্বারা তিনি সম্বর্ধিত। অথচ এঁর মতো আত্মসচেতন শিল্পঋদ্ধ জীবনশিল্পী বিরল, তাতে সংশয় নেই। মানুষের অন্ধকার জীবন, অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের প্রয়াস, ব্যর্থতা ও সাফল্য জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে নিপুণভাবে উদাহৃত।

মানুষের মনের গহনে আদিম প্রবৃত্তির লীলা চিত্রণে, সকল ধরনের মানুষ সম্পর্কে নির্মোহ নিরাসক্ত দৃষ্টি পোষণে, সমস্ত রকম ভাববিলাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায়, নির্মোহ বিজ্ঞানদৃষ্টি ও নৈর্ব্যক্তিক জীবনদৃষ্টির প্রতিষ্ঠায় গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কৃতিত্ব আজ অবশ্যস্বীকার্য। মানিকের মতো তিনি রাজনীতি সমাজনীতি সচেতন শিল্পী নন, বরং ব্যক্তিজীবনে ও সাহিত্য-জীবনে ইনট্রোভার্ট—বাস্তব দৃশ্য ছাড়িয়ে অন্তর্লোকে জ্যোতিরিন্দ্রর উত্তরণ। তবু মননধর্মিতায়, জীবনের জটিলতার শিল্পরূপায়ণে, ব্যক্তিমানুষের স্বভাব বিশ্লেষণে তিনি মানিকের মতোই নির্মোহ নিপুণ শিল্পী।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী অভিজ্ঞতানির্ভর লেখক, তাঁর গল্পে নরনারীকে তিনি প্রত্যক্ষ বস্তুজগৎ থেকে সংগ্রহ করেন এবং তাদের নিজস্ব শিল্পলোকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর চরিত্রেরা অন্তঃসন্ধানী, সমাজ থেকে নিজেদের বিশিষ্ট করে দেখতে চায়, অনেক সময়ই সামাজিক সম্পর্ক ও পরিবেশ থেকে সরে গিয়ে মূল্যবোধসমূহকে যাচাই করে। শ্রেণীভুক্ত মানুষ অপেক্ষা স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্ব সম্পূর্ণতায় বিশিষ্ট মানুষকেই তিনি দেখতে ও দেখাতে চান। তাই তিনি তথাকথিত বাস্তববাদী লেখক নন। তার চেয়ে কিছু বেশি। আসলে তিনি অন্তর্লোক উন্মোচনকারী শিল্পী। তিনি আরো কিছু। তিনি সৌন্দর্য-বাদী। সৌন্দর্যের সামগ্রিকতা ও ব্যক্তিনিরপেক্ষতায় তাঁর আগ্রহ আছে। প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে তিনি নারীর রূপ বর্ণনা করতে পারেন না। তাঁর শিল্পচেতনায় নারীর শরীর ভোগের উপাদান নয়, তা সৌন্দর্যের আধার ও চেতনা।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এই বিশিষ্ট সৌন্দর্যচেতনার প্রকৃষ্ট পরিচয়স্থল 'গিরগিটি' গল্পটি। এ গল্পকে যাঁরা বলেন অশ্লীল, জ্যোতিরিন্দ্রকে বোঝার সামর্থ্য তাঁদের নেই। সৌন্দর্য দর্শনের কথা তাঁর সব গল্পে পাই, যে সৌন্দর্য

সামগ্রিক, নিগূঢ়, সম্পূর্ণ। 'গিরগিটি' গল্পে বুড়োটা ভাড়াটে বাড়ির বৌটির স্নানের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ। কুয়োর ঠাণ্ডা জলে নিরাবরণ হয়ে ঐ যুবতী বৌটি স্নান করছে। বুড়োর দৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপারটা একটি পরিপূর্ণ প্রকৃতি-সংলগ্ন ছবি—নিরাবণ যুবতীর একাকিত্ব ও তার রূপ, নির্জন কুয়োতলায় পরিপূর্ণতা পেয়েছে—তার গায়ের মসৃণ চামড়ার উপর শুভ্র সাবানের ফেনার সৌন্দর্য দেখে বুড়োটা মুগ্ধ। এই মুগ্ধতার অন্তরালে যৌনবাসনা ক্রিয়াশীল নয়, সৌন্দর্য-দৃষ্টি ক্রিয়াশীল। আর ঐ যুবতী বৌটিও দেখে কুয়োতলার নির্জনতা, শ্যাওলা, রোদ, কচুগাছ, জলের ধারা, একটা প্রজাপতি, একটা গিরগিটি। সবটা মিলিয়ে একটি পরিপূর্ণ ছবি।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অনেক গল্পই আমাদের ভাবায়, চমকিত, ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত করে। 'সোনার চাঁদ', 'চোর', 'গিরগিটি', 'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা', 'আলোর পাখি', 'শালিক কি চড়ুই' প্রভৃতি গল্প তার প্রমাণ।

'চোর' গল্পের তিন প্রধান চরিত্র—কিশোর মিণ্টু, বাচ্চা চাকর মদন আর একটি পেঁপে গাছ। মিণ্টু স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তার নর্দমার ধারে শিশু-পেঁপে-চারা দেখে তুলে নিয়ে এনেছিল, বাড়ির বাগানে তাকে পুঁতে যত্ন করেছিল। তার সাহায্যকারী ছিল বাচ্চা চাকর মদন।

"পাঁচ দিনের মাথায় পেঁপে চারাটার আরো দুটো কুঁড়িপাতা দেখা গেল। সব মিলিয়ে ছ'টা ডাটি, আর পুতুলের ছাতার মতো ছোট ছোট দু'টা পাতা হয়েছে।" এই পেঁপে চারাকে ঘিরে মনিবপুত্র মিণ্টু ও বালকভৃত্য মদন এক প্রীতিলোক নির্মাণ করেছিল। দু'জনে খুব ভাব, এক বালিশে মাথা রেখে দু'জনে পাশাপাশি শোয়। সেই মদন একদিন বিশ্বাসঘাতকতা করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে মিণ্টুর বন্ধু সুকুমারদের বাড়িতে কাজে লেগে গেল, সেখানেই আগে সে কাজ করত। আর তিনদিন পর শেষ রাতে জোর বৃষ্টিতে ঐ পেঁপেচারা চুরি গেল।

ছ'মাস পরে শীতের দুপুরে বন্ধু সুকুমারদের বাগানে গিয়ে দাঁড়াল মিণ্টু। "তারপর দু'জন একটা গাছের কাছে এসে দাঁড়াই। দীর্ঘ কাণ্ড লম্বা ডাঁট সতেজ সবুজ ছড়ানো পাতা নিয়ে একটা সুন্দর পেঁপে গাছ। ফলতে আরম্ভ করেছে। 'ওটা এনে লাগিয়েছে মদন—আমাদের চাকর—এইটুকুন গাছ ছিল, দেখতে দেখতে কত বড়ো হয়ে গেল!' সুকুমার বলছিল।

তাকিয়ে তাকিয়ে আমি গাছটা দেখলাম। যেন কি বলতে গিয়ে থেমে

গেলাম।……বাড়ি ফিরে কথাটা মাকে বললাম না।

আমার মনে যে কষ্ট লেগে রইল, মাকে আর তার ভাগ দিয়ে কি হবে ভেবে চুপ করে রইলাম।……

তারপর যখনই সুকুমারদের বাড়ি গেছি আমি সরাসরি ছুটে গেছি ওদের বাগানে। সতেজ সবুজ যৌবনের লাবণ্যে মণ্ডিত দীর্ঘপত্র পেঁপে গাছটা আমাকে বড় বেশি টানতে লাগল। সকাল নেই বিকাল নেই সুকুমারের হাত ধরে পেঁপে গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি,…দেখে আর আশ মিটত না।……

একদিন দুপুরবেলা গাছটা দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার বুকের ভিতর কেমন ভয় ঢুকল।…আমি তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে এলাম।…আমার বার বার মনে হচ্ছিল পেঁপে চারাটাই মদনকে আমাদের বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে—কেবল মদনকে না, আমাকেও—না হলে আমাদের ছোট উঠোনে, টিনের ঘরে ছায়া-ঢাকা ডুমুর তলার কথা ভুলে গিয়ে আমি সারাক্ষণ সুকুমারদের বাড়িতে বাগানে পড়ে থাকব কেন।"

প্রকৃতির পটে অন্তর্লোকের জটিলতার উন্মোচনই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের বৈশিষ্ট্য। এখানে তিনি স্ব-প্রতিষ্ঠ, সুপ্রতিষ্ঠ।

সন্তোষকুমার ঘোষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারী কোন্ অর্থে? সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে, সমাজসচেতনতায়, নির্মম হৃদয়বিশ্লেষণে। মানিকের সমাজজিজ্ঞাসা উত্তীর্ণ হয়ে সন্তোষকুমার আরো অগ্রসর হয়েছেন।—মনন-চিন্তায়, আত্মজৈবনিক দৃষ্টিতে, ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে, ব্যক্তির অস্তিত্ব বিশ্লেষণে, তীক্ষ্ণ মার্জিত ইঙ্গিতধর্মী ভাষায় হৃদয়ের সূক্ষ্মতম অনুভব প্রকাশে সন্তোষ-কুমারের নৈপুণ্য সংশয়াতীত।

কিছুকাল আগে কথাসাহিত্যিক প্রাণতোষ ঘটকের মৃত্যুতে তিনি একটি ছোট লেখায় শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বলেছিলেন, এ শোক প্রাণতোষের জন্য নয়, নিজের জন্যই। "প্রতি সম-বা-নিকট বয়সীর মৃত্যু আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, পরের পালা আমাদেরও হতে পারে। আমরা আসলে কাঁদি আমাদেরই মৃত্যুশোকে।

এই আত্মজৈবনিক সুরটি সন্তোষকুমারের রচনার মূল সুর—তা মৃত্যুচেতনায় বিধৃত। সন্তোষকুমারে জীবনের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির 'পরে নির্ভর করে

নির্দিষ্ট সময় বৃত্তধৃত আত্মরূপের আবিষ্কারে যত্নবান। কলকাতার নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের অকিঞ্চিৎকরতার নির্মোহ চিত্রায়নে তিনি দ্বিতীয়রহিত। ডীটেলস্ ব্যবহারে তাঁর দক্ষতা অসাধারণ। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির দ্বারাই তিনি ছোটখাট ঘটনা, বিষয় ও চরিত্রকে স্মরণীয় করে তোলেন। গল্পের ভিতরে বক্তব্য স্পষ্ট রেখায়িত। আসলে বক্তব্যটাই আগে আসে, তাকে ঘিরে গল্পের ঠাস বুনন। তবে প্লটের প্রতি ঝোঁক নেই। টানা গল্প লেখায় আগ্রহ নেই। স্মৃতি বা তীব্র অনুভূতি গড়ে তোলে একটা আবহ, তা ডীটেলস্-এর চিকন কাজে প্রত্যক্ষ ও স্মরণীয় হয়ে ওঠে। লেখকের আত্মপ্রকাশের তীব্র বাহনরূপেই সন্তোষকুমার গল্পকে ব্যবহার করেন।

'শোক', 'কানাকড়ি', 'কস্তূরীমৃগ', 'যাদুঘর', 'একমেব', 'দ্বিজ', 'শনি', 'ধাত্রী', 'দিনপঞ্জি'—এইসব গল্পে তীক্ষ্ণনির্মম লেখনীমুখে সমাজের ব্যবচ্ছেদ। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, সমাজচেতন সহানুভূতি, বাস্তবজীবনের চড়াই-উৎরাইর প্রতি ব্যথাক্লিষ্ট বিদ্রূপের কশাঘাত, মূল্যবোধ ও সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সচেতনতা, সার্বিক শূন্যতা, অসহায়তা ও নিঃসঙ্গতার বেদনার শিল্পরূপায়ণ—সবকিছু মিলে সন্তোষকুমারের গল্প এক অনন্যসাধারণ স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত।

অপরের জন্য যখন শোক প্রকাশ করি, তখন আসলে নিজের জন্যই শোকার্ত হই।—আত্মজৈবনিক এই সুরটি সন্তোষকুমারের গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে তার প্রমাণ 'শোক' গল্পটি।

মৃত স্বামীর বন্ধু, সিতেশ ঠাকুরপোর মৃত্যুতে আজ শোক প্রকাশ করছেন সত্তরে উপনীত বৃদ্ধা। স্মৃতি আর অনুভবকে সম্বল করে সমস্ত জীবনটা পর্যালোচনা করে তিনি ফিরে আসছেন সমে, 'একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে আদি বিন্দুতে' উপনীত হয়েছেন। 'মৃত্যুর মুহূর্তে জন্মক্ষণটিকে ফিরে পাবার আশায়' তিনি অপেক্ষা করছেন। এমন সময় যৌবন প্রৌঢ়ির সঙ্গী বন্ধু সিতেশ ঠাকুরপোর মৃত্যু-সংবাদ এলো।

এ গল্পে কোনো প্লট নেই, থাকার কথাও নয়। এ কেবল মৃত্যুর সিংহদ্বারে উপনীত বৃদ্ধার জীবন-পর্যালোচনা। সে পর্যালোচনা কী তীক্ষ্ণ, কী পূর্ণ, কী অভ্রান্ত!

সিতেশ ঠাকুরপোর সঙ্গে এই বন্ধুত্বকে সংসার ক্ষমা করে নি। স্বামী বুঝেছিলেন, সম্পর্কটা ধরতে পেরেছিলেন—দু'টি সমবয়সীর সখ্য, রুচির মিল,

আবেগের হালকা রঙের প্রলেপ, তার বেশি কিছু নয়।

অনিল, সুনীল—দুই ছেলে এই বন্ধুত্বকে বোঝে নি, ঘৃণা করেছে, তিরস্কার করেছে। পাড়ার লোকে, ছেলেদের বন্ধুরা ঠাট্টা করত। অসূয়াপরায়ণ সংসারের সে আঘাত পেতে হয়েছে। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সুখের স্বাদ বদলে যায়, রুচি বদলে যায়, সুখদুঃখের চিন্তায় প্রকৃতি বদলে যায়। তাই বন্ধুত্বের সাহচর্যের প্রকৃতিও বদলে যায়।

"আজ একাত্তরে পা রেখে সিতেশ ঠাকুরপোর মৃত্যু ঘটল। আজ তাঁর জন্য দুঃখ করছি, এ কথাই ছেলেরা ভেবেছে।"—

এই আত্মজৈবনিক গল্পে নায়িকার জীবন-পর্যালোচনার প্রকৃতিটি শান্ত, ক্ষমাপরায়ণ, অসূয়ামুক্ত।

জীবনে আজ আর কিছু নেই। কোনো সামর্থ্যই নেই। কেবল ভাবার সামর্থ্য আছে।

"কতদিন ভেবেছি, দুঃখ পাবার ক্ষমতাটুকুও যেদিন থাকবে না, তার আগেই যেন আমার মরণ ঘটে। অথবা ঘটবার প্রয়োজনও বুঝি হবে না। কারণ ওই ক্ষমতাটুকু খোয়ানোরই আরেক নাম মৃত্যু।

"মৃত্যু আসলে আলাদা কোন ঘটনাই নয়। সলতে ফুরিয়ে আলো এক সময়ে নেবে। কিন্তু ঠিক তখনই কি নেভে? যে মুহূর্তে জ্বলেছিল সেই মুহূর্ত থেকেই তো নিবেও আসছিল। সলতেটা যখন জ্বলছিল, তখনই পুড়ছিল, একটু একটু করে নিবছিলও। আমরা যেমন এক একটি মুহূর্তের মধ্যে একটু একটু করে বাঁচি, সেই সঙ্গে তেমনই একটু একটু করে মরিও। আস্তে আস্তে করে ফুরোনর পালাও একদিন ফুরোয়। সে শূন্যতাকেই আমরা বলি শব। সব-শেষকে সব বিয়োগের যোগফলকে ঢেকে দিই সাদা চাদরে; সমারোহে সমাধি দিই।"

প্রবীণের এই উপলব্ধি এসেছে বহু অভিজ্ঞতা, স্মৃতি আর অনুভব থেকে। সুখদুঃখের স্বাদ বদলাচ্ছিল, রুচি বদলাচ্ছিল, প্রেয় ছেড়ে শ্রেয়তে মন যেতে চাইছিল, শিল্পকলা সাহিত্য থেকে ধর্ম, আত্মার কথায় মন চলে যাচ্ছিল।

আযৌবনের বন্ধু সিতেশ ঠাকুরপোর সঙ্গে দেখাশুনার পালাও একদিন শেষ হল। তিনি হৃদরোগে শয্যাবন্দী, আর প্রবীণা বাতে পঙ্গু। আসা-যাওয়াটুকুই কেবল ছিল। উনি লাঠি ঠুকে ঠুকে রকে বসতেন আর প্রবীণা উপরে শুয়ে সেই সাড়া, সেই ধ্বনি শুনতেন। সিতেশের মৃত্যুতে তাতে ছেদ পড়ল।

"আমি ভয় পেয়েছি, আকুল হয়েছি। আমি কাঁদছি।

সময় পূর্ণ হলে যারা যায়, সংসার থেকে অপ্রয়োজনীয় বলে খারিজের খাতায় যাদের নাম ওঠে, তাদের মৃত্যুতে কি কেউ কাঁদে ?

কাঁদে। বুড়োর শোকে বুড়িরাই কাঁদে।

সে কান্না শুধু বিচ্ছেদের কান্না নয়। প্রতিটি সমবয়সীর মরণ তাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে তাদেরও যাবার দিন এল বলে।

আমিও যাব। তাই কাঁদছি। আমি মরলে কেউ ত কাঁদবে না, তাই নিজের মরণের কান্না নিজেই কেঁদে রাখছি।

আমার ছেলে, ছেলের বউ ভুল বুঝেছে। ভাবছে আমি কাঁদছি সিতেশ ঠাকুরপোর শোকে। তা ত নয়, আমি কাঁদছি আমার নিজেরই মৃত্যু-শোকে।"

সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পে এই পরিণতি, জীবন-দৃষ্টি ও প্রজ্ঞা বার বার দেখা গেছে,—সময়ের শরীরে হাত রেখে তিনি সময়ের পুতুল মানুষকে, নিজেকে অনুভব করেছেন।

পঞ্চাশ দশকের শেষে ষাটের শুরুতে বাংলা ছোট গল্পে নোতুন আন্দোলন দেখা গেল, যার মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হল 'ছোটো গল্প, নোতুন রীতি।' সে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিমল কর, যিনি বয়সের দিক থেকে ঠিক তরুণ নন। সেদিন তরুণদের একটি গল্প-সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন বিমল কর এবং তার ভূমিকায় এই আন্দোলনসম্পর্কিত সংশয় ও প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়েছিলেন। সেদিনের তরুণ লেখকরা বহির্মুখীন না হয়ে অন্তর্মুখীন হতে চেয়েছিলেন। সেকারণে তাঁদের গল্পে স্ব-কৃত আত্ম-প্রতিকৃতির প্রক্ষেপ ঘটছিল বার বার, পাওয়া যাচ্ছিল স্বীকারোক্তির আভাস আর চেতনামগ্ন ভাবপ্রবাহে তির্যক বা বিকৃতভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল সমাজ ও বাস্তবের খণ্ডিত দৃশ্যাবলী। তাঁরা সচেতন বা অর্ধচেতনভাবে অনুভব করছিলেন যে, মানুষের ভিতরে অতি জটিল সূত্রে অন্তর বাহির গ্রথিত হয়, স্বপ্নে ও চিন্তায় তার প্রকাশ ঘটে।

বাংলা ছোট গল্পে ধারা-বদলের এই সূচনা হয়েছিল বিমল করের গল্পে। বিমল করের গল্পে ধারা-বদলের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ছোটগল্পে ধারা-বদলের সূচনা হয়েছে,—এই মন্তব্য কিঞ্চিৎ অতিশয়োক্তি মনে হলেও বস্তুত তা নয়। বিমল করের শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলনে স্পষ্টত দু'ধরনের গল্প গৃহীত হয়েছে।

'আত্মজা', 'মানবপুত্র', 'পার্ক রোডের সেই বাড়ি', 'উদ্ভিদ', 'পলাশ', 'পিঙ্গলার প্রেম', 'আঙুরলতা', 'যযাতি', 'শূন্য' প্রভৃতি গল্পে "প্রেম ও সমাজসত্যের, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের এবং মনোজগতের তীব্র বিশ্লেষণে তৎপর, ভাষা ও আঙ্গিকের নিত্যনতুন ব্যবহারে অক্লান্ত।" 'সোপান', 'জননী', 'অপেক্ষা', 'সুধাময়' গল্পে এক নোতুন বিমল করকে আবিষ্কার করি, যিনি প্রচলিত জীবনযাত্রা এ সংস্কার সম্পর্কে অসহিষ্ণু, গল্প সম্পর্কে প্রচলিত সংজ্ঞায় অতৃপ্ত, জীবনের কেন্দ্রবিন্দু সন্ধানে ও তাৎপর্য আবিষ্কারে নিয়ত অস্থির, ঈশ্বরচিন্তা, ধর্মবোধ ও নিয়তির রহস্যসন্ধানে ব্যাকুল, এক অনিবার্য বিষাদে আক্রান্ত। "শান্ত কাব্যময়তায় স্নিগ্ধ, পদবিন্যাসে পবিত্রতার আভাস-মণ্ডিত ভাষায় লেখা এইসব গল্প, কিন্তু অন্তর্নিহিত তীব্র, চঞ্চল, আশ্রয়-ভিখারী এক অসহায় যন্ত্রণা, অমোঘ মৃত্যুচেতনার দাহ, নবীনতর বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের বিকল্প সন্ধান গল্পগুলিকে একধরনের আশ্চর্য গতিবেগ দিয়েছিল।"

বিমল করের গল্পে পালা-বদলের ও সেই সঙ্গে বাংলা ছোট গল্পে ধারা-বদলের যে ইঙ্গিত এখানে দিয়েছি, তার সমর্থনে ইচ্ছে করে দু'জন তরুণ গল্প-লেখকের বিমল কর সম্পর্কিত মন্তব্য পূর্ব অনুচ্ছেদে গ্রহণ করেছি। এই দু'জন হলেন শ্রীদিব্যেন্দু পালিত ও শ্রীশীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। তরুণ গল্পকার-দের এই সব মন্তব্য থেকে অনুধাবন করা যায়, বিমল করের সাম্প্রতিক গল্প বাংলা ছোট গল্পের পক্ষে নোতুন অভিজ্ঞতা আর বিমল কর নোতুন গল্প-রীতির প্রবর্তক-নায়ক।

এই পালা-বদলের স্বাক্ষরচিহ্নিত গল্প 'সুধাময়'। বিমল করের 'ব্যক্তিগত' বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা, তাঁর সংশয় বিষাদ নিঃসঙ্গতা বিচ্ছিন্নতাবোধ শূন্যতা-বোধ এখানে ধরা পড়েছে। প্রেম, ধর্ম, উজ্জীবন, জীবনের পরিণতি বা সার্থকতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসায় আক্রান্ত, নিয়ত-অতৃপ্ত জীবনশিল্পী বিমল করকে শেষ পর্বের গল্পে ও উপন্যাসে ('খড়কুটো', 'পূর্ণ-অপূর্ণ', 'গ্রহণ') খুঁজে পাই। তারই চমৎকার নিদর্শন 'সুধাময়'। গভীর অভিনিবেশ, আত্ম-মুখীনতা ও রহস্যময়তা, আত্মজৈবনিক পদ্ধতির প্রতি আনুগত্য সবই এই গল্পে আছে।

সুধাময় মুক্তি ও আনন্দের আকাঙ্ক্ষায় জীবনের কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ছুটে, বেড়ায়, শেষ পর্যন্ত এই অন্বেষণ তাকে কিছুই দেয় না। নারী থেকে নারীতে, প্রেমে থেকে প্রেম, অভিজ্ঞতা থেকে অভিজ্ঞতান্তরে সুধাময় গিয়েছে,

কিন্তু শ্রেয়কে, অনশ্বরকে, পায় নি। তাই অনশ্বর বা শাশ্বত সম্পর্কে তার উপলব্ধি সংশয়ে পর্যবসিত—

"বিরাট সংশয় আমাকে কাঁটার মতো সর্বক্ষণ বিঁধছে। রাজেশ্বরীর মধ্যে তার দেহের বাইরে আলোর ভুবন খুঁজেছিলাম, পাইনি। হৈমন্তীর মধ্যে তার মনের আলোময় অস্তিত্ব অনুভব করে সারবস্তু পেয়েছি ভেবেছিলাম; কে জানত—তার দেহের সঙ্গে এত গভীর ভাবে সে-অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে। আমার ভালবাসা অন্ধকারের মতন, প্রদীপের কাছে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আলোকিত। একে ভালবাসা বলি না। যে আনন্দ এত চঞ্চল, ভঙ্গুর—সে আনন্দ মিথ্যে।"

এখানেই কি সুধাময়ের অন্বেষণে সমাপ্তি? না, সুধাময়ের নিরন্তর আত্মানুসন্ধানের এখানেই সমাপ্তি ঘটে নি। সে 'নতুন করে তার বিশ্বাসকে খুঁজতে বেরিয়েছে কিংবা তার সেই অদ্ভুত আনন্দকে।'

স্বভাবতই ছোটগল্পে ধারা-বদলের আলোচনায় এই পটভূমি স্মরণে রেখে আমাদের অগ্রসর হতে হয়। মানুষ নামক যে জীবটি নিজের সৃষ্ট জটিলতার শিকার, আমিত্ব সম্পর্কে কাতর ও অসহায়, পরিবেশ সম্পর্কে অসহিষ্ণু ও ক্রুদ্ধ, তাকেই তরুণ লেখকরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন। তাৎক্ষণিক, কিছু বা আপেক্ষিক, উপলব্ধিকে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ভিতর দিয়ে মননের গভীর স্তরে উত্তীর্ণ করে দিতে চেয়েছেন তরুণ গল্প লেখকরা। অবশ্য সাধ ও সাধ্যে, আশঙ্কা ও সাফল্যে সর্বত্র সেতু যোজিত হয় নি।

আত্মজৈবনিক পদ্ধতি সাম্প্রতিক বংলা ছোটগল্পের তরুণ শিল্পীদের পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সেই প্রতিশ্রুতিবান গল্পলেখক, যাঁর গল্পে এই পদ্ধতির সার্থক রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। 'আমরা' ও 'আমাকে দেখুন' গল্পে (যথাক্রমে শারদীয় আনন্দবাজার ১৩৭৬, শারদীয় দেশ ১৩৭৬-এ প্রকাশিত) পূর্বের অনুচ্ছেদে যেসব লক্ষণ নির্ণয় করেছি, তা নির্ভুলভাবে উপস্থিত।

বাইরের ঘটনাবহুল জগতের কথা এসব গল্পে গৌণ হয়ে যায়, প্রধান হয়ে ওঠে তাৎক্ষণিক উপলব্ধি। মানুষ নামক যে জীবটি নিজের সৃষ্ট জটিলতার শিকার, তার আমিত্ব সম্পর্কে কাতরতা ও অসহায়তা 'আমারা' ও 'আমাকে দেখুন' গল্পে চমৎকারভাবে রূপায়িত। 'আমরা' গল্পে দুটি মাত্র চরিত্র, নায়িকা অনু (গল্পের বক্ত্রী) ও তার স্বামী। আত্মকথনের পদ্ধতিতে গল্পটা বলা

হয়েছে। স্ত্রীর জবানীতে স্বামীর আত্মকাহিনী—আত্মানুসন্ধানের কাহিনী—অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে আত্মাবিষ্কারের কাহিনী এ গল্পে উপস্থিত। ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ থেকে সেরে উঠে স্বামী কেমন বদলে গেছেন। আসলে রোগটা শরীরের নয়, মনের। স্বামীর উক্তি "অনু, আমার মনে হচ্ছে একটা চেঞ্জের দরকার। শরীরের জন্য না, কিন্তু আমার মনটাই কেমন যেন ভেঙ্গে পড়েছে।" তাৎক্ষণিক উপলব্ধি থেকে আপেক্ষিক উপলব্ধিতে, বর্তমান মুহূর্ত থেকে সময়ের চেতনা ও অচেতনায় উত্তরণ বার বার দেখা দিয়েছে। স্বামীর উক্তিগুলি তাই গভীর অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। লোকটি ধীরে ধীরে অন্তর্মগ্ন হয়ে যাচ্ছে, স্নান করতে গিয়ে বাথরুমে চুপ করে বসে থাকে। ডাকাডাকিতে সাড় ফিরে পায়। সে স্বীকার করে, "আসলে আমার সময়ের জ্ঞান ছিল না। বাথরুমের ভিতরটা কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, জলে ভেজা অন্ধকার, আর চৌবাচ্চা ভর্তি জল ছলছল করে উপচে বয়ে যাচ্ছে খিলখিল করে—কেমন যেন লাগে! ঠিক বোঝানো যায় না। ঠিক যেন গাছের ঘন ছায়ায় বসে আছি, আর সামনে দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে—"

এইসব চিন্তার মধ্য দিয়ে আত্মমগ্ন মানুষটি ভেতরে ভেতরে বদলে যাচ্ছে। আপিস ভালো লাগে না, বন্ধুসঙ্গ ভালো লাগে না, কর্মে উন্নতির স্পৃহা নষ্ট হয়ে গেছে। কী রকম যেন আত্মমগ্ন, অন্তর্মুখী, অভিমানী। স্ত্রী অনু স্পষ্ট উপলব্ধি করে—"আমি সংসারের ভাল-মন্দর সঙ্গে জড়িয়েই ওঁকে দেখি। এর বাইরে যে একা মানুষটা, যার সঙ্গে অহরহ বাইরের জগতের একটা অদৃশ্য বনিবনার অভাব চলছে তার কথা তো আমি জানি না। নইলে উনি কেন লোকের ডাকে সাড়া দেন না, কেন চৌবাচ্চার জলে হাত ডুবিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকেন, তা আমি বুঝতে পারতাম।"

স্ত্রী অনুর চোখে তার স্বামীকে অচেনা মনে হয়েছে। এ সেই অচেনা, আউটসাইডার, যাকে আমরা সার্ত্র্-এর লেখায় পেয়েছি।

মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধু সত্যচরণকে দেখতে গিয়ে এই লোকটির জীবন-সম্পর্কিত ধ্যানধারণা বদলে গিয়েছে। সত্যচরণ বন্ধু, সংসারে তার প্রার্থিত সবকিছুই তার আয়ত্তে, তবু তার নিজস্ব প্রার্থিতকে সে পেল না, না পেয়েই মারা গেল। সত্যচরণ জানিয়েছিল, সে কী চেয়েছিল—"একটা কী যেন—কিন্তু সেটার তেমন কোনো অর্থ হয় না। যেমন আমার প্রায়ই ইচ্ছে করে একটা গাছের ছায়ায় বসে দেখি সারাদিন একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। অথচ ঐ

চাওয়াটার অন্ত মাথামুণ্ডু হয় না।”

এই চাওয়ার কোনো অর্থ প্রত্যক্ষ বস্তুলোকে নেই, কিন্তু তার বাইরে আছে, আছে অন্তর্লোকে, সেটাই এই কথক (স্বামীটি) ধরতে পেরেছে। পেরেছে নিজের মধ্যেকার উপলব্ধিতে আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে—“মানুষের মধ্যে সব সময়েই একটা ইচ্ছে বরাবর চাপা থেকে যায়। সেটা হচ্ছে সর্বস্ব দিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে। কোথাও কেউ একজন বসে আছে প্রসন্ন হাসিমুখে, তিনি আমার কিছুই চান না, তবু তাঁকে আমার সর্বস্ব দিয়ে দেওয়ায় কথা। টাকা-পয়সা নয়, আমার বোধবুদ্ধি লজ্জা অপমান জীবনমৃত্যু—সব কিছু।”

এটাই আসল, সর্বস্ব দেওয়ার ইচ্ছে, তার বদলে কিছুই মেলে না, শুধু তৃপ্তি মেলে। অস্তিত্বের মূলে, সব জিজ্ঞাসার শেষে পৌঁছলে তবে সবকিছু দিয়ে দেওয়া যায়। আধুনিক মানুষের জীবনজিজ্ঞাসার মূল কথাটি এগল্পে রূপায়িত। সমস্ত গল্পটার মধ্যে এমন একটা মমতা ও বিষাদের অন্তঃস্রোত প্রবাহিত যা পাঠকের মর্মমূলে চেতনার সাড়া জাগায়।

শীর্ষেন্দুর গল্প এই অর্থেই সর্বাঙ্গীন আধুনিক গল্প হয়ে উঠেছে। ‘আমাকে দেখুন’ গল্পটি আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে লেখা আর একটি আত্মসন্ধানী গল্প। এই পরবাসে, অপরিচিত সংসারে ব্যক্তি যখন অচেনার (আউটসাইডারের) মতো ঘুরে বেড়ায়, তখন অস্তিত্ব-সন্ধানে তার যে বেদনা ও ব্যাকুলতা এইসব গল্পে তা রূপায়িত।

আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে লেখা আর একটি অস্তিত্ব-সন্ধানী গল্পের উদাহরণ দিব্যেন্দু পালিতের ‘দাঁত’ (দেশ, ১৮ জুলাই, ১৯৭০ সংখ্যা)। দাঁতের জন্য নায়কের যে অস্বস্তি আসলে তা অস্তিত্বের উপলব্ধিজনিত সংকট। দাঁত নিয়ে তার কষ্টকে সংসারে কেউ বোঝে না, তাকে সবাই ভুল বোঝে—স্ত্রী, ডাক্তার, আপিসের বস্, বান্ধবী—সকলের কাছেই সে আজ অচেনা।

সংসারের চক্রে নায়কের নিজস্ব কোনো মূল্য নেই, নানাজনে তাকে নানাভাবে দেখছে এবং তাতে বাধা পড়ায় তার প্রতি ক্রুদ্ধ হচ্ছে। নায়ক ক্রমশ উপলব্ধি করছে—তার নকল দাঁতের পাটির মতো তার অস্তিত্বও যেন নকল। “এতকাল ধরে যা অভ্যাস করেছি, নকল হওয়া, এই নকল দাঁত-গুলোও আমার সেই স্বভাবের অংশ হয়ে গেল।”

লেখক নিপুণভাবে স্তরে স্তরে এটি দেখিয়েছেন। একদিন দাঁত বের করে নির্বোধ হাসি হেসে টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হয়ে বেশ কিছু পয়সা

নায়ক পেয়েছিল। দাঁত নিয়ে তার দেখা দিয়েছিল অহংকার, যা ক্ষণস্থায়ী। দাঁতের ব্যথায় সে কষ্ট পাচ্ছে। চুম্বনোদ্যতা স্ত্রী বাধা পেয়ে ভুল বুঝল, গাল দিল—'মদ মেয়েমানুষ আর পার্টিকেই যারা জীবন ভেবে নেয়, স্ত্রী সংসার তাদের ভালো লাগবে কেন!'

দাঁতের ব্যথা-ই আজ নায়কের ট্রাম্প কার্ড। ওর জন্যই শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনাটা আকস্মিকভাবে স্থগিত রাখা গেল। তারপর দাঁতের ডাক্তারের চেম্বারে অপেক্ষা। নায়ক দেখছে পথে জনস্রোত, অপেক্ষমান রোগীর দল, পড়ছে সংবাদপত্র—হামলার খবর, শ্রমিক মালিকের সংঘর্ষ। ভাবছে—"মানুষ বোধ হয় স্পষ্টই দুটো দলে ভাগ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।...আমি কোন দলে?" তখনি দাঁতের ব্যথাটা ফিরে আসছে, বেদনায় সে অস্থির হয়ে পড়ছে। দাঁতের ডাক্তারের অভিযোগ, আপনার কষ্টের কারণ আপনার কমপ্লেসেন্সি। দাঁত তুলে ফেলতে হবে, আরো আগে আসা উচিত ছিল। সেই মুহূর্তে টুথপেস্টের সেই বিজ্ঞাপন মনে পড়ল। যে দাঁতের জন্য গর্ব, আজ তা তুলে ফেলতে হবে। সেই বিজ্ঞাপন আজ তার প্রতিদ্বন্দ্বী, "আর, যুদ্ধ শুরু হবার আগেই বুঝতে পারলাম, আমি হেরে যাচ্ছি।"

সে হেরে যাচ্ছে স্ত্রীর কাছে, আপিসের বস্-এর কাছে। তার দাঁতের যন্ত্রণাটা কেউই বিশ্বাস করছে না, ভাবছে এটা তার চালাকি। অথচ তাকে প্রয়োজনে ব্যবহার করছে স্ত্রী (নীলিমা), ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। দাঁত তুলে ফেলার পর শালীর (অসীমা) মর্মান্তিক রসিকতা—'সত্যি, জামাইবাবু, আপনার দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না।'

নায়কের আত্মচিন্তা: "বিছানায় শুয়ে কিংবা খবরের কাগজে চোখ রেখে মাঝে মাঝেই আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাই। মুখের শূন্য গহ্বর জুড়ে হাওয়া খেলে। শূন্যতা ক্রমশ অধিকার করে নেয় আমাকে। আর তখনই মনে হয় এর চেয়ে যন্ত্রণা ভালো ছিল; যন্ত্রণা সত্ত্বেও দাঁতগুলো ছিল পরিপাটি, দাঁত নিয়ে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ। কিন্তু এখন? এখন কি! সামান্য কয়েকটি দাঁত থাকা না-থাকার হেরফেরে কি একটা মানুষের অস্তিত্ব জুড়ে ধ্বস নামতে পারে?"

এই আত্মজিজ্ঞাসায় নায়ক বিদ্ধ। কোথাও সে গৃহীত নয়, বরং অবিশ্বাসিত। স্ত্রী, আপিস-বস, ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ, স্টাফ, এমনকি তার বান্ধবী (নীনা—নায়কের ভাষায় 'দ্যাট ফ্যাবিউলাস বীচ')—সবাই তাকে

সন্দেহ করে। নকল দাঁতের সজ্জায় নায়ক যেন পুরনো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল, কিন্তু তার অস্তিত্বের সংকট কাটে নি ; একটি সূচীমুখ তীক্ষ্ণ প্রশ্ন তাকে নিয়ত খোঁচা দেয়—তার অস্তিত্বই কি নকল ? দাঁতগুলি কি তার স্বভাবের অংশ হয়ে গেল ? এতদিন নকল হওয়াই অভ্যাস করে এসে আজকে সত্যি সে নকল হয়ে গেল ? রাত আটটা থেকে নটা পর্যন্ত নীনার সান্নিধ্যে থেকে ঠিক সাড়ে নটায় ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সামনে উপস্থিতি—সবটাই অভ্যাস, সবটাই নকল ? এর থেকে মুক্তি কোথায় ? মর্মান্তিক হয়েছে স্ত্রীর মন্তব্য—"দাঁত গেল, স্বভাব গেল না !"

নায়ক বুঝতে পারছে ম্যানেজমেণ্ট তাকে ব্যবহার করছে। স্টাফরা তাকে খুঁজছে এবং তাদের শায়েস্তা করার ব্যাপারে সে-ই ম্যানেজমেণ্টের হাতের তাস। নায়কের উপলব্ধি : "এখন আমার আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই ; দু'পক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক অনুভূতিহীন নিরেট দেয়াল। এটা কী ঠিক হল ? এই স্বাতন্ত্র্য হারানো—আত্মগোপন করা।"

ম্যানেজমেণ্টের হুকুমে নায়ক বাড়ি ছেড়ে হোটেলে আত্মগোপন করে আছে, কারণ ইউনিয়নের সামনে সে-ই মালিক তরফের প্রতিনিধি। তার অসহায়তা, কাতরতা, নিঃসঙ্গতা, আত্মমগ্নতা ধরা পড়েছে রাতে দেখা স্বপ্নে। পিঁপড়ের দল তার দুপাটি দাঁতকে নিয়ে যাচ্ছে—যা আজ তার অস্তিত্বের সমার্থক। "একা ঘরে নিজের সঙ্গী বলতে এখন আমি নিজে। একা, ভয়ঙ্কর রকমের একা।" এই নিঃসঙ্গ অস্তিত্বের সংকটের আবর্তে নায়ক দিশেহারা। দাঁতের পাটি দুটিকে সে কিছুতেই বাগে আনতে পারছে না—অর্থাৎ অস্তিত্বের সংকট তাকে গ্রাস করছে—দাঁতের ডাক্তারের কথা মনে পড়ল, 'খুব দেরি করে ফেলেছেন'—সত্যি তাই, আজ এই পরবাসে অচেনার পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন, সে বুঝতে পারছে সে হেরে যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক বাংলা ছোট গল্প কতো সার্থক হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ দিব্যেন্দু পালিতের (জন্ম ১৯৩৯ খ্রী) এই গল্পটি। বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা ও মননের সঙ্গে নিটোল গল্পের টানকে বজায় রেখে আধুনিক গল্প লেখায় তরুণের সামর্থ্যের পরিচয় এখানে উপস্থিত।

পঞ্চাশের দশকের তরুণ তেজী গল্পলেখকদের লেখায় দেখা গেছে স্বকীয়তা—তা গল্পের ভাষায়, উপস্থাপনে, বক্তব্যে। তাঁদের যেসব গল্প মনে

রাখার মতো তার কিছু উল্লেখ করি—'সেই আমি সেই আমি', 'প্রিয় মধুবন' 'বিষাদসিন্ধু', 'পটুয়া নিবারণ', 'ক্রীড়াভূমি' (শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়), 'মৎস্যভেদ' 'রায়', 'কালবীজ' (সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ), 'বৃষ্টির আগে (অশ্লীল গল্প)' (অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়), 'নৌকাবিলাস', 'সহবাস', 'কফি হাউস' (বরেন গঙ্গোপাধ্যায়), 'আততায়ী' (শংকর চট্টোপাধ্যায়), 'পা', 'দুপুর', 'গোপাল এবং কলকাতা', 'পশ্চাৎভূমি' (দেবেশ রায়), 'বিজনের রক্ত-মাংস' 'বিপ্লব ও রাজমোহন' (সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়), 'লটারি' (মতি নন্দী), 'মুখাগ্নি,' 'মোমচোর' (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়), 'মৃত অমৃত' (আনন্দ বাগচী)' 'দাঁত', 'মৃত্যু' (দিব্যেন্দু পালিত)।

এমুহূর্তে এঁরা সকলেই প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তার ফলে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এদের উৎসাহ কমেনি। আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসামুখর গল্প রচনায় এঁদের ক্লান্তি ঘটেনি। এঁরা সকলেই গল্প সম্পর্কে প্রচলিত ধারণায় বিমুখ, ভাষা ও আঙ্গিকের ব্যবহারে অক্লান্ত, জীবনের মূল্যসন্ধানে সদাতৎপর। স্থানাভাবে একটি মাত্র উদাহরণ নিতে পারি—দেবেশ রায়ের গল্প। এই তরুণ লেখক গল্পে আস্তিকতা নাস্তিকতা এবং জীবনমৃত্যুরহস্যের অন্বেষণে রত। 'গোপাল এবং কলকাতা' ("দেবেশ রায়ের গল্প") গল্পের নায়ক গোপাল এতো বড়ো শহর কলকাতায় বাঁচার কোনো কারণ খুঁজে পায় নি। তার আত্মহত্যা করার কথা নয়, সুখ ভেবে নীল চশমা চোখে এঁটে দিয়েছিল। ওভারব্রিজের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে সে জীবনের অর্থ খুঁজেছিল। অথচ ওভারব্রিজ আর মাটির মাঝখানে শূন্যতায় পড়ে যাবার অব্যবহিত পূর্বমুহূর্তে সে ভাবতে চেয়েছিল—'আমার কোনো মানেই হয় না।' জীবনের জটিলতা ও অস্তিত্বের সার্থকতা অন্বেষণে দেবেশ রায় সদাতৎপর। তাঁর প্রকাশভঙ্গি একান্তভাবে নিজস্ব।

পঞ্চাশের দশকের আর একজন গল্পলেখকের উল্লেখ করি। তিনি মহাশ্বেতা দেবী, গল্পের নাম 'সাঁঝসকালের মা' (উল্টোরথ, আষাঢ়, ১৯৭০)। আমার মতে এটি অসাধারণ গল্প। মা ও ছেলে, জটি ঠাকুরনী আর তার ছেলে সাধন কান্দোরীকে নিয়ে গল্প। 'কেমন করে গর্ভধারিণী মা সাঁঝ-সকালের মা হয়ে গেল সে এক আশ্চর্য বৃত্তান্ত।' লেখিকা সেই আশ্চর্য বৃত্তান্ত অসাধারণ নৈপুণ্যে উপস্থিত করেছেন।

* জটি মেদিনীপুরের পাখমারা, যাযাবর। ওরা বলে ওরা জরা ব্যাধের

বংশধর। ঈশ্বরকে (কৃষ্ণকে) হত্যা করেছিল বলে ওরা অভিশপ্ত। সুদুর দ্বারকা থেকে ওদের চলে আসতে হয়েছিল। ওদের ঘর থাকতে নেই, ওরা পাখি ধরে পাখি বেচে। যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। সুবর্ণরেখার চরে শরবনে পাখি ধরতে গিয়ে সাধনের বাপ উৎসব কান্দোরীর সঙ্গে জটির দেখা। কান্দোরীর জাত-ব্যবসা চিকনপাটি বোনা, তারা ঘর বেঁধে বাস করে। পাখমারা সম্প্রদায় ঘর বাঁধে না, আপন সমাজের বাইরে বিয়ে করে না। তবু তাই ঘটল, উৎসব কান্দোরীর প্রেমের ডাকে যুবতী জটি সাড়া দিল। তার সঙ্গে পালাল, দূরে ঘর বাঁধল। জটির শুধু ভয়—এই ঘর, এই ভালবাসা থাকলে হয়। সে চির-অভিশপ্ত পাখমারা সম্প্রদায়ের মেয়ে, ঈশ্বরকে যারা হত্যা করে গোড়ালিতে বাণ মেরে, তাদের বুঝি ঘুরে ঘুরেই জীবন শেষ করতে হয়। জটি তো তা করে নি। যদি সেই রাগে জটির ঠাকুমা বাণ মারে! উৎসব তাকে সাহস দিত, ভরসা দিত। শেষে জটির কোলে ছেলে এলো—সাধন। উৎসবের ভারি ইচ্ছে জাতে ওঠে। পদবী বদলাবে, বড় শহরে ঘর বাঁধবে, স্টেশনে মোট বওয়ার কাজ করবে, তবে জাতে ওঠা হবে। তারা তখন খড়গপুরে। সাধনের মুখপ্রসাদ হল। খুব ভাত-খাসি খাওয়া হল। তারপর চোলাই মদ খেয়ে উৎসব মরে গেল। এখন পাঁচ বছরের ছেলে (সাধন) নিয়ে জটি কোথায় যায়? সে কি পাখমারাদের সম্প্রদায়ে ফিরে যাবে? কিন্তু তারা কোথায়? তারা তো এক ঠাঁই থাকে না? কে জানে পাখমারারা কোথায় চলে গেছে? এ বিপুল ভুবনে জটি কোথায় যায়?

নানা অভিজ্ঞতার পর অনেক ভেবেচিন্তে জটি হল ঠাকুরনী। অলৌকিকতা দিয়ে নিজের চারদিকে বর্ম না আঁটলে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না, একথা জটি বুঝেছিল। তখন সাধনের বয়স পাঁচ। সেই থেকে জটি দিনেমানে জটি ঠাকুরনী। সূর্য ওঠা থেকে সূর্য ডোবা অবধি ঠাকুরনীকে কেউ মা-বউ-বোন ভাবতে নিষেধ। ডাকতে নিষেধ।

'সাঁঝে আর সকালে তু মা। আর দিনেমানে তু ঠাকুরনী?'

'হ্যাঁ বাপো। আমি তোর সাঁঝ-সকালের মা।'

জটির কাছে সারাদিন প্রার্থীর ভিড়, ভক্তের ভিড়। জটি পুজো পেতো আর পাপী তাপীদের তাবিজ মাদুলী দিত। আঁতুড়ের মরাছেলের নখ, গোসাপের কণ্ঠহাড়, ধনেশ পাখির তেল, অচেনা গাছের শিকড়—এইসব দিত। পয়সা নয় কড়ি নয়, শুধু একপালি চাল নিত। নিজে না খেয়ে সাঁঝ-সকালে

ছেলেকে ভাত খাওয়াত। সাধনের বয়স তিরিশ কিন্তু সে নির্বোধ। তার মোষের মোত শরীরে পাকস্থলী ছাড়া আর কিছু নেই। আছে ক্ষিদে—প্রচণ্ড ক্ষিদে। জটি ঠাকুরনী তাকে খাওয়ায়। জটি ঠাকুরনী মাঁরা গেল যে রোগে, তার নাম অনাহার। না খেয়ে খুদকুঁড়ো সাধনকে খাইয়ে তার নাড়ী শুকিয়ে গিয়েছিল। ঠাকুরনী মারা গেল, মরবার পূর্বমুহূর্তে ছেলেকে বলে গেল ঘটা করে দানসাগর শ্রাদ্ধ করতে। সাধন তা-ই করবে। সে মা-কে গোরু, হাতি, ঘোড়া, ভুঁই, সোনাদানা বস্ত্র সব দেবে। এই তার প্রতিজ্ঞা। বন্ধু বলরামের সাহায্যে কালীঘাটের পুরুত বামুনকে ধরে আঠারো টাকায় শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন করল, সবকিছুরই মূল্য ধরে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হল। শ্রাদ্ধের চাল পুরোহিতের প্রাপ্য। সাধন তা ছাড়বে না। এক পালি চাল গামছায় বাঁধল। বন্ধু পুরোহিত—কারুর কোনো কথায় অভিশাপে সে কান দিল না। ঐ চাল নিয়ে সাধন বাড়ি চলল। বামুনকে গাল দিল শালা বলে। সে ত মূল্য ধরে দিয়েছে, চাল ছাড়বে কেন?

গল্পের শেষ তিনটি অনুচ্ছেদ মানবিক আবেগে সমৃদ্ধ, শিল্পনৈপুণ্যে ঋদ্ধ। "বুকের কাছে চালের পোঁটলা, সাধন হেলে-দুলে বাড়ি যায়। সাধন বাড়ি যাবে, উনোন ধরাবে, ভাত রাঁধবে।

ভাতের গন্ধ বড় ভাল গন্ধ। ভাতের গন্ধে সাধন তার মা-কে খুঁজে পায়। যতদিন ভাত রাঁধবে সাধন, তপ্ত ভাত খাবে, ততদিন ওর কাছে সাঁঝ সকালের মা বাঁধা থাকবে।

মায়ের কথা মনে করতে গিয়ে পুরুতের উপর দুর্ব্যবহারের অনুতাপে সাধনের চোখ জলে ভেসে গেল। মা, তুমি যেমন তেমন করে স্বর্গে যাও। সাধন এখন ভাত রেঁধে খাবে। তুমি দোষ নিও না।"

গানের কলির মতো এই বাক্যগুলি, শব্দগুলি ঝংকৃত হয়েছে। সাধনের মায়ের প্রতি ভালবাসা আর তপ্ত ভাতের প্রতি আসক্তি, এ দুইয়ে কোনো ব্যবধান নেই, ছেদ নেই। দুয়ে মিলে সাধন সম্পূর্ণ। তপ্ত ভাতের মধ্য দিয়ে সাধন তার মাকে বার বার ফিরে পায়। জৈবিক ক্ষুধাকে মহৎ মানবিক আবেগে উপনীত করার আশ্চর্য শিল্পরূপ 'সাঁঝ সকালের মা'। অনেক দিন ধরে মনে রাখার মতো গল্প। শিল্পীর নিপুণ তুলিকাপাতে একটি নির্বোধ পাকস্থলীসর্বস্ব যুবক মহৎ আবেগের মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

॥ আট ॥

ষাটের দশকে তরুণতর গল্পলেখকদের আবির্ভাব ঘটল। এঁরা চান 'শুদ্ধ গল্প' 'শাস্ত্রবিরোধী গল্প।' এই বিদ্রোহী গোষ্ঠী ছোটগল্পের প্রচলিত সংজ্ঞা ও ধারণা বদলে দিতে চান। এঁদের প্রধান মুখপত্র 'এই দশক'। এর সহযোগী পত্রিকা 'ঈগল', 'ক্রান্তিক', 'বিদিশা'।

প্রবন্ধ-সূচনায় গল্প সম্পর্কে এঁদের অভিমত উদ্ধার করেছি। এখন দেখা যাক তাঁদের গল্পে এইসব অভিমত কতটা সার্থক শিল্পরূপ পেয়েছে।

চিরকালই সব দেশে যখন তরুণদের আবির্ভাব হয় তখন তারা পূর্ববর্তীদের অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করতে চায়, 'স্থবিরের শাসন নাশন মানি' নোতুন পথে চলতে চায়। এই বিদ্রোহকে তারুণ্যের ঔদ্ধত্য বলে অস্বীকার করার মতো মূঢ়তা বা অহমিকা আমার নেই।

ষাটের দশকের সব গল্পলেখক 'এই দশক'-কেন্দ্রিক গোষ্ঠীভুক্ত, একথা মনে করলে ভুল হবে। 'এই দশক', 'ঈগল', 'ক্রান্তিক', গোষ্ঠীর বাইরে 'অন্বীক্ষণ', 'সহজিয়া', 'আত্মপ্রকাশ', 'কালক্রম', 'প্রত্যয়', 'শিলীন্দ্র', 'সংবর্ত', 'ঋক', 'গল্পকবিতা', 'অন্তর্বাহ', 'প্রান্তিক', 'প্রত্যয়', 'স্বরান্তর', 'ছোটগল্প',—নব-নিরীক্ষা 'পরিচয়', 'সম্প্রতি', 'মানস', 'এক্ষণ', 'চতুষ্কোণ', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি লিটল ম্যাগাজিনে খুশিমতো ভাঙাগড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিচয় ছড়িয়ে আছে। 'দেশ', পত্রিকাতেও অনেক নোতুন গল্প বেরুচ্ছে।

এঁরা সকলেই গল্পরচনার শিল্পসীমারেখাকে বদলাতে চেয়েছেন। গল্প সম্পর্কে মৌল ধারণাটাই এঁরা ভাঙতে চান। গল্পের নিটোল সম্পূর্ণতায় এঁদের কোনো আগ্রহ নেই, গল্প বলার পদ্ধতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্ম-জৈবনিক এবং স্বীকারোক্তিমূলক, গল্প আর যেন জীবনের pointed finger নয়, বরং নির্লিপ্ত ধারাবাহিক সংলগ্ন বা অসংলগ্ন দৃশ্যসমবায় মাত্র, বাস্তব দৃশ্য ও নির্বস্তুক দৃশ্যের সমাহার মাত্র, জীবন যেন পরিশীলিত নির্লিপ্তি দৃষ্টির ছবি।

'এই দশক' পত্র-কেন্দ্রিক শুদ্ধ গল্পের আন্দোলনে জড়িত যেসব গল্পলেখক তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : অমল চন্দ, আশিষ ঘোষ, কল্যাণ সেন, বলরাম বসাক, রমানাথ রায়, শেখর বসু, সুব্রত সেনগুপ্ত, সুনীল জানা, নীরেন্দ্র গুপ্ত,

সুনীল মিশ্র।

এঁদের যে-সব গল্প আমার চোখে পড়েছে, মনে ধরেছে, সেরকম কয়েকটি গল্পের নাম : 'সুব্রত সেনগুপ্ত' (সুব্রত সেনগুপ্ত), 'কোঁকো 'গ' (রমানাথ রায়), 'পরের স্টেশন', (নীরেন্দ্র গুপ্ত), 'হাত', 'যদি' (আশিস ঘোষ), 'দরজা বন্ধ' 'টুথব্রাস' 'নাগরদোলা' (বলরাম বসাক), 'সিগারেট' (সুনীল জানা), 'নিজস্ব দর্পণ' (সুনীল মিশ্র), 'সন্ধিক্ষণ' (অমল চন্দ), 'ঘুমের আগে' (কল্যাণ সেন), 'সমতল' (শেখর বসু)।

'এই দশক'-গোষ্ঠী-বহির্ভূত যেসব তরুণ প্রতিশ্রুতিবান লেখক ষাটের দশকে প্রথম গল্প লিখেছেন তাঁদের যে-সব গল্প আমার মনে পড়ছে, সেগুলির নাম : 'ছাগল', 'সুখের কথামালা', 'শীতের বৃষ্টি', 'যে কোন নিশীথে' (অশোক-কুমার সেনগুপ্ত), 'নোয়ার নৌকা', 'অসুখের অন্ধকার' ও 'অটোমেশন', 'রতনের ঘর', 'বর্ণ পরিচয়' (সমরেশ দাশগুপ্ত), 'অস্থি' (স্মরজিৎ বন্দ্যো-পাধ্যায়), 'ময়নাডাঙ্গের রূপকথা', 'সময়ানুপাতিক নামচা' (তুষার রায়), 'সাপ', 'জল-বায়ু' (তুষারাভ রায়চৌধুরী), 'জন্মের ভূমিকা', 'ঘোড়াপূজা', 'এমব্রয়ডারী' (যীশু চৌধুরী), 'অভিমন্যুর আত্মসমর্পণ', 'রসিক', 'সচিত্র পরাণকথা', 'কুসুমিত জীবনবাহার' (চণ্ডী মণ্ডল), 'হীরামানিক রজকের উপাখ্যান', 'অশরীরী কণ্ঠের কাছে নতজানু', 'মুখ', 'স্বয়ংচেতনার আলোকন', 'অঙ্কুশের উপকথা', 'ফরিয়াদী শচীবিলাস সেনের উপাখ্যান' (প্রলয় শূর), 'সনকার স্বেদ ও শোণিত', 'নিরাপদ বাড়ী আছো' (সুনীল দাশ), 'নিরস্ত্রী-করণ' (রবীন্দ্র গুহ), 'বাস্তুসাপ', 'মাটি', 'কালবীজ', 'মৎস্যভেদ', 'ইন্দিপিসী ও ঘাটবাবু' (সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ), 'একজন দ্বাররক্ষীর স্বপ্ন', 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (অজয় গুপ্ত), 'বিনয়ের সুখ', 'পাশাপাশি', 'গল্পকল্প' (প্রলয় সেন), 'যীশুর ঈপ্সিত কুসুম', 'সবুজ অন্ধকারে' (শংকর দাশগুপ্ত) 'স্টেশন ও সেই বৃদ্ধ মানুষটি', 'বৃষ্টির আগে' (অশ্লীল গল্প) (অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়), 'আততায়ী' (শংকর চট্টোপাধ্যায়), 'ছুরি' (নির্মল চট্টোপাধ্যায়), 'রাজা আর রানী', 'উপদ্বীপে', 'স্মরণ বিস্মরণ', 'জীবনের দিকে', 'পাখির দেশ', 'মানুষের অসুখ এবং বাংলাদেশ', 'সময়ের ভিতরে' (বাণীব্রত চক্রবর্তী), 'যাদুকর' (অসিত ঘোষ), 'সাধারণ' (বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়) 'সব হিসেবের বাইরে' (কবিতা সিংহ)। [অবশ্য অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও কবিতা সিংহ পঞ্চাশের লেখক, তবে ষাটের দশকেই এঁদের প্রতিষ্ঠা।]

শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আজকের গল্প' সংকলনে (ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯) যাঁদের গল্প আছে তাঁদের নাম : অজয় গুপ্ত, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল চন্দ, অরুণেশ ঘোষ, অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত, আশিষ ঘোষ, উদয়ন ঘোষ, কবিতা সিংহ, কল্যাণ সেন, কালিদাস রক্ষিত, তুষার রায়, দেবাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলচন্দ্র সরকার, প্রলয় সেন, বলরাম বসাক, বুদ্ধদেব গুহ, মিহির মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিত রায়চৌধুরী, রবীন্দ্র দত্ত, রমানাথ রায়, শুদ্ধশীল বসু, শেখর বসু, সত্যেন্দ্র আচার্য, সমীর রায়চৌধুরী, সুব্রত সেনগুপ্ত, সুভাষ সিংহ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।

এখানে প্রায় পঁচিশটি লিটল ম্যাগাজিন ও প্রায় পঞ্চাশ জন তরুণ গল্প-লেখকের গল্পের নামোল্লেখের মধ্যে দিয়ে অনুধাবন করা যায় নোতুনদের অস্বীকারের প্রয়াস মূর্খতা।

ষাটের দশকের গল্পের পরিচয় গ্রহণে যে-সব অসুবিধা ঘটে, তার প্রধান হল এখানে প্রথাসিদ্ধ প্লটের ও পরিণতির অনুপস্থিতি। এসব গল্প 'সিচ্যুয়েশন' ও 'মুড্'-প্রধান, আবহনির্ভর। 'গল্প' তৈরি করায় এঁদের আগ্রহ না থাকায় গল্পের সার এখানে উপস্থিত করা যায় না। আত্মজৈবনিক ও স্বীকারোক্তিমূলক এইসব গল্পে সচেতন বা অচেতনভাবে একটি শিল্পসত্যকে স্বীকার করে নেয় যে, আধুনিক গল্প লেখকের আত্মপ্রকাশের অন্যতম প্রবল বাহন। তা'ছাড়া নির্বস্তুক দৃশ্য, অসংলগ্ন চিত্রকলা এবং বিছিন্ন বর্ণনার সমবায়ে গঠিত এসব গল্পের যাত্রা অন্তর্লোকে, বহির্লোকের ঘটনার প্রতি এদের আগ্রহ নেই। নিখুঁত বাস্তব দৃশ্য রচনায় দুঃসাহসিক পারদর্শিতা। মনো-গহনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরের রূপায়ণে নির্বস্তুক ইমেজ ব্যবহারে নৈপুণ্য, মানসিক অবস্থার বর্ণনায় অসংলগ্নের কুশলী প্রয়োগ আমাদের অভ্যস্ত গল্পসংস্কারকে বিপর্যস্ত করে দেয়। বিমল করের 'সুধাময়', 'সোপান' 'জননী' 'অপেক্ষা গল্প যে ধারাবদলের সূচনা, তা নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। স্বকীয়তা ও 'ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য'—নোতুন গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

গল্পের সিচ্যুয়েশন বর্ণনার কৌশলটি দেখা যাক।

"আইক ডেকে উঠলো ঘাউ ঘাউ ঘাউ—পরিতোষ চাপা গর-র গর-র শব্দ করতেই শূন্যে আইক লাফিয়ে উঠলো প্রবলভাবে, মাটিতে পড়েই শিখার জানুর কাছে এক পলক ছুটোপুটি করে আবার লাফিয়ে উঠলো। পরিতোষ

মেয়েটির টিন-খোলা মাখনের মতন তকতকে ঘাড়ের দিকে চেয়ে তার সবকটা দাঁত বের করে হাসলো। তারপর মেয়েটির হাত ধরে বললো, শিখা, এসো। মেয়েটি নাচের ভঙ্গিতে দ্রুত ঘুরে যেতেই স্প্যানীশ নর্তকের মতন সাবলীল ভঙ্গিতে তার কোমর ধরে হেলিয়ে নাচের আর একটি মুদ্রা দেখিয়ে বললো, আমিও তোমাকে ভালবাসি। অন্তত এই মুহূর্তে—তারপর ওরা তিনজনে নাচতে লাগলো। সন্ধেবেলার সূর্য থেকে মোটাসোটা লাল শিখা নেমে আসছে, মেয়েটির শাড়ী উড়ছে ঘাঘরার মতন, পরিতোষ আর আইক ঘুরছে তার দু'পাশে, নদী থেকে উঠে আসছে আলো-ছায়াময় হাওয়া, গাছের প্রত্যেকটি পাতার ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে সন্ধ্যা, ঘরে ফেরার পাখির ডাকে ঝংকৃত হয়ে গেল নিখিল বিশ্বের আবহ তাল।" ('কুকুরের ভাষা', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'গল্পকবিতা,' বর্ষশেষ বর্ষ শুরু, ১৯৬৮)

প্রেমাসক্তি ও আবেগের বর্ণনায় সমস্ত প্রথাসিদ্ধ রীতিকে এখানে অস্বীকার করা হয়েছে। প্রকৃতি-বর্ণনায় একই অস্বীকৃতি। তাৎক্ষণিক্ উপলব্ধি থেকে সরে যাবার নিগূঢ় ইঙ্গিত এখানে ব্যঞ্জিত। একটি যুবক, একটি যুবতী, একটি কুকুর—তিনজনে ঘুরে ঘুরে নাচছে, সান্ধ্যসূর্যের মোটাসোটা লাল শিখা নেমে আসছে, নদী থেকে উঠে আসছে আলোছায়াময় হাওয়া, চুঁইয়ে পড়ছে সন্ধ্যা, ঘরে ফেরার পাখির ডাকে নিখিল বিশ্বের আবহসংগীত ধ্বনিত হচ্ছে। সমস্তটা মিলিয়ে একটা ছবি, কবিতার মতো, গানের মতো, ঝংকৃত হয়ে উঠছে। গল্পকে কবিতার অনুভূতিক্ষেত্রে নিয়ে যেতে কোনো দ্বিধা, কোনো সংকোচ, কোনো বাধাকে মানা হয় নি।

॥ নয় ॥

মানসিক অনুভূতির প্রকাশে, ব্যক্তিজীবনের চিন্তাসংকটের অভিব্যক্তিতে আপাত-অসংলগ্ন বিচ্ছিন্ন ইমেজের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় নিয়মখুত গল্পে। নায়ক হাসপাতালের সিনিয়র হাউস সার্জেন সত্যেন, যার এখন ব্যাটারিডাউন মেজাজ। মেজাজকে টপগীয়ারে তোলার পক্ষে সহস্র জাগতিক বাধা। আর. এস. ছুটিতে, নার্স ডাক্তার কম, অপারেশন-রোগীর কমতি নেই, ছুটি নিয়ে মা-বোনের কাছে যাবার সুযোগ নেই, একটু বেরুবার উপায় নেই, হুড়মুড়

করে বৃষ্টি এলো। ফলে নায়ক সত্যেনের দেহ মন এখন তার নাগালের বাইরে। 'সব হিসেবের বাইরে' গল্পে এই নাগালছাড়া মনের কাহিনী। গল্পের নামটি তাৎপর্যপূর্ণ। সত্যেন ডাক্তার অপারেশন থিয়েটরে একটা অ্যাকসিডেন্ট করা রোগীর পা কাটার উদ্যোগ করছে। সমস্ত গল্পটা জুড়ে তার স্বগত কথন—অন্তর্লোকের চিন্তাপ্রবাহের মন্থরগতি। অপারেশন শেষ হবার আগেই লোকটা টেবিলেই শেষ হল। সত্যেনের একার হাতে, এই প্রথম একজন, অপারেশন টেবিলে মরে গেল।

সেই সদ্য মৃত রোগীকে অবলম্বন করেই সত্যেন তার অন্তর্লোকের আবর্তে পাক খেতে লাগল। চোখের সামনে সব দুনিয়া উল্টে যাচ্ছে।

লোকটা অপারেশনের আগে মিনতি করেছিল—হম্‌কো লওটনে হোগা বাবুজি। সত্যেন তখন বলেছিল, জরুর। তবে কী হল? ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে সত্যেন ডাক্তারের হাত সরছিল না। সে যে লোকটাকে কথা দিয়েছিল। এখন লোকটার মিনতিমাখা শব্দগুলি উল্টে পাল্টে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—জি-বু-বা গা-হো নে-ট-ও-ল কো-মহ—

আপন অস্তিত্বের সংকটাবর্তে সত্যেন আজ আবর্তিত হচ্ছে। সেই চিন্তাবর্তে সত্যেনের সমস্ত জীবন, সমস্ত ব্যক্তিগত সমস্যা, সমস্ত মূল্যবোধ আবর্তিত হচ্ছে। সময়চেতনা ও স্থান-কালগত উপলব্ধি বদলে যাচ্ছে।

যে লোকটা মরেছে তার জন্য কি সত্যেন দায়ী? এই চিন্তা তাকে ক্রমাগত ধাক্কা দিচ্ছে।

"যখন গ্যাস দেয় তখন নির্জ্ঞানের ওপারে পৌঁছে দেবার আগে সে যে ঈশ্বরের অনুপস্থিতির সুযোগে ইশ্বর সেজে লোকটাকে ফিরিয়ে আনবে বলেছিল।

কিন্তু অচৈতন্যের অপেক্ষাঘরে মাত্র গচ্ছিত লোকটাকে ফিরিয়ে আনতে পারলে না সত্যেন।...হঠাৎ হার্ট থেমে গেল কেন?

অলিন্দ নিলয়ের সেই সুবিখ্যাত তিনপাল্লা দুপাল্লা দরজা?

আমার কোনো ত্রুটিতে?

লোকটাকে নির্জ্ঞানের মধ্যে আমি কি আমার ঘুমের অবিকল বে-আন্দাজ ঠেলে দিয়েছিলাম?

......সত্যেন যেন দেখতে পেলে।

তার চোখের সামনে ভীষণ উদ্‌ভ্রান্ত বেগ তাকে ঠেলা দিয়ে একটা

অন্ধকার টানেলের মধ্যে পাচার করে দিচ্ছে। লোকটা পাঁচফুট থেকে এক ফুট হয়ে পরে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

তার দৃশ্য শেষ হয়ে যাবার পরও তার ধ্বনি টানেলের পাথরে প্রতিধ্বনিত হতে হতে পরে শূন্য হয়ে মিলিয়ে গেল।"

চেতন থেকে অচেতনে, বস্তুলোক থেকে নির্বস্তুক লোকে, সময়চেতনা থেকে নিঃসীম কালস্রোতে সত্যেন আবর্তিত হয়। এ তার আত্মসংকট, যেখানে বাইরের সাহায্য পৌঁছয় না। প্রণয়িনী বাসন্তী তাকে বুঝতে পারে না। প্রশ্ন করে, 'তুমি নাকি সাত রাত ঘুমোও নি ? তা'ছাড়া—'

বাকিটা বাসন্তী বলে না। 'কী চেপে গেলে বাসন্তী ?'

সত্যেনের মনে হয়, বর্তমান ভীষণ বেগে দু'পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। ঘড়িটা দেখলে, মিনিট সেকেণ্ডের কাঁটা বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে। একদিন মানে কি চব্বিশ মিনিট ? অন্তর্লোকে সত্যেনের স্বগত চিন্তা, স্বগত কথন।

"পৃথিবীতে কোথাও কোনো একটা বিন্দু ঠিক করে নিয়ে আমরা সেখানে পৌঁছতে চেষ্টা করি। তার সঙ্গে একটা সময়ের যোগসাজস আছে। লোকটা যোগসাজস ঘটবার আগেই বোধ হয় বিন্দুটায় পৌঁছতে চেয়েছিল।" কিন্তু তা হয় না, হতে পারে না।

সেই মৃত লোকটাই সত্যেন ডাক্তারকে 'হাণ্ট' করছে। লোকটা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। সত্যেন বললে, 'যেও না' দাঁড়াও। বিশ্বাস কর। তোমাকে আমি মারি নি। মারতে পারি না। সত্যি বলছি, তুমি ত সময়ের অঙ্কটা জানতেই না। তাই আগে এসে গিয়েছিলে।...এই শক্ত কঠিন নিশ্চিন্ত পৃথিবীতে আজ তুমি, আজ আমি বর্ম চর্মের অভাবে নাকে মুখে রক্ত তুলে ফেটে মরে যাচ্ছি।"

সেই অন্তর্লোকে অন্ধকার কালস্রোতে ভেসে যেতে যেতে সত্যেন দেখলে অন্ধকার টানেল। আসলে সেটা তার অস্তিত্বের প্রতীক।

সত্যেন আর পারে না। আত্মহত্যার চেষ্টা করে। এমার্জেন্সীতে গাড়ি-চাপা-পড়া সত্যেনকে আনা হয়েছে। সহকর্মী বিনোদ তার মুখে গ্যাসের ফানেলটা পরিয়ে দিলে। সত্যেন বলতে চাইল—দিস্‌ না, দিস্‌ না বিনোদ। তখন অন্তশ্চেতনার স্রোতে ভেসে যেতে যেতে সত্যেনের উপলব্ধি—

"তখনই তোমার অন্ধকার টানেলটা দেখতে পেলাম।

দশ, নয়, আট, সাত, ছয়, পাঁচ, চার, তিন, দুই।

আমি শেষবারের মত ফিরতে চেষ্টা করলাম।"

সত্যেন বুঝতে পারলে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে যতটা যাবার সে তার চেয়ে অনেক বেশি ভিতরে চলে যাচ্ছে।' [সব হিসেবের বাইরে, কবিতা সিংহ, আজকের গল্প।]

এখানেই গল্পের সমাপ্ত। আধুনিক গল্পের সামান্য লক্ষণগুলি—নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা, অপরিচয়ের অনুভূতি, অস্তিত্বের সংকট, স্বীকারোক্তির মাধ্যমে সে সংকট উত্তরণের প্রয়াস—এখানে নির্ভুলভাবে ধরা পড়েছে।

শ্রীমতী কবিতা সিংহের এই গল্পের প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে মনে পড়ে আর একটি গল্প যার বিষয়বস্তু একই—ডাক্তারের নির্জ্ঞান চিন্তাস্রোত, আত্মকথন, স্বীকারোক্তি, আত্মবিশ্লেষণ। সেটির নাম 'মৃত অমৃত' (দেশ ৪ জুলাই, ১৯৭০), লেখক শ্রীআনন্দ বাগচী। আমার মতে এটি বহুদিন স্মরণে রাখার মতো গল্প, ফিরে ফিরে পড়ার মতো গল্প। তরুণ গল্পলেখকদের হাতে গল্প কতো নিপুণ শিল্পরূপ পেয়েছে তার উজ্জ্বল উদাহরণ 'মৃত অমৃত'। নামটি তাৎপর্যপূর্ণ।

হাসপাতালের ডাক্তার অমৃতকান্তি আর. এস। রাতদুপুরে টেলিফোনে ডাক আসে এমার্জেন্সী অপারেশনের। যেমন এসেছে এই রাতে। অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের রোগিনী, বয়স পঁচিশ, সেক্স ফিমেল, নাম—? 'নেম? ননসেন্স' কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু যে মুহূর্তে অচৈতন্য রোগিনীর পেট চিরেছে অমৃত ডাক্তার সেই মুহূর্তে চোখ পড়েছে রোগিনীর বুকের দিকে।

"ওপরে শ্যাডোলেস লাইট তীব্র চোখে ঝুঁকে আছে। সেই আলোর বৃত্তের বাইরে স্টেরাইল শীটের স্ক্রীনের আড়ালে পেশেন্টের মুখ মাথা নিয়ে বসে আছেন অ্যানাস্থেটিস্ট।......রোগিনীর ওপাশে তার (অমৃত ডাক্তারের) মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ফার্স্ট অ্যাসিটান্ট, সিনিয়র হাউস সার্জেন, তারই বাঁ পাশে দাঁড়িয়েছে নার্স। অমৃত হাত বাড়ালো। স্ক্যাল্‌পেল চলে এলো সঙ্গে সঙ্গে হাতের মধ্যে। কিন্তু তুলির দীর্ঘ দ্রুত টানের মত ছুরির প্রথম আঁচড়টি দিতে গিয়েই হাতটা কেঁপে গেল তার, বুকের মধ্যে আচমকা ধক্ করে কি এসে লাগলো। থমকে থেমে গেল সে, নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। মাখনের মত উজ্জ্বল নরম নিকোনো ত্বকের ওপরে বুড়ো আঙুলের টিপ ছাপের মতই সেই বাদামী লাল জরুলটা, এবং তার আধ ইঞ্চি তফাতে বিসর্গ চিহ্নের মত দুটি কালো তিল। অবিস্মরণীয়।

লোয়ার রাইট প্যারামিডিয়ান ইন্‌সিশানের লাইন বরাবর যেন আগের জন্মের অতি চেনা ট্রাফিক সিগন্যাল দেখতে পেয়ে তার হাত অনড় হয়ে গেল।…কি হলো ? এনিথিং রং ?…অ্যানাস্থেটিস্ট জানাল—অল রাইট।…"

অমৃতের আত্মকথনের অন্তঃস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে—"এখন নামে আর কি এসে যায় ? আমি এখন অনেক দূরে চলে এসেছি। তোমার থেকে অনেক দূরে। কিন্তু তবু তোমাকে আমার হাতেই ফিরে আসতে হল, আমার হাতের মুঠোয়, আমার আঙুলের ডগায়। তোমার ফিরে না যাওয়ার মালিক এখন আমি। তোমার জীবন-মৃত্যুর। আমি এখন ইচ্ছে করলেই—"

এ রোগিনী অমৃতের প্রণয়িনী মমতা। বোম্বাই সমুদ্রতটে রক্তাক্ত সূর্যাস্তের পটে সেদিন অমৃতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এই মেয়ে, আজ সে তার ছুরির তলায়, তার কৃপায় মমতার জীবন!

"তুমি যদি সজ্ঞানে থাকতে আমার ছুরির নিচে নির্ঘাত এতক্ষণে শিউরে উঠতে, তুমি তো আমাকে বিশ্বাস করো নি। কিন্তু তুমি কবেই বা জ্ঞানে ছিলে। আমার ঘেন্না করছে এখন তোমাকে ছুঁতে।"

চিন্তার অন্তঃস্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তেমনি আর. এস. অমৃতের নিপুণ হাত কাজ করে চলেছে। স্ক্যালপেল, ফরসেপস, ক্যাটসাট। ছুরি কাঁচি চলছে—দু'ভাগ হল অচেতন যুবতীর দেহ। মুণ্ডহীন, কারণ মাথা আছে স্ক্রীনের আড়ালে। সার্জনের নিপুণ হাত কাজ করছে। সমস্ত বর্ণনার মধ্যে আছে ডিটেলস আর গানের ধুয়ার মতো একটি বাক্য—'নামে কি এসে যায় ?'—বারবার বেজে উঠছে। সার্জন অমৃতের বিরাম নেই, নেই মনের, নেই চিন্তাস্রোতের।

"'আমাকে ছুঁয়ো না' ঘেন্না করে।" মমতা সমুদ্রতটে বসে ঘৃণাভরে বলেছিল অমৃতকে। পায়ের কাছে মুহুর্মুহু ছলকানো সমুদ্র, পিছনে রক্তাক্ত সূর্য। অমৃতর নিপুণ হাত কাজ করছে—টাওয়েল, ক্ল্যাম্প নিচ্ছে, ব্যবহার করছে। আর তার চেতনাস্রোত নিশ্চিত গতিতে ধাবিত হচ্ছে—অন্তর্সংলাপ অশ্রুত স্বরে উচ্চারিত হচ্ছে।

"আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি ? আমার কবিতা মনে পড়ছে এই মুহূর্তে। এখন একটু হাত পিছলালে বিপদ। একটি ফস্কা গেরোয় মৃত্যু। জানি, তবু জানি। নারীর হৃদয় প্রেম শিশু গৃহ নয় সবখানি। অর্থ নয় কীর্তি নয় স্বচ্ছলতা নয়—আরো এক বিপন্ন বিস্ময়। আমাদের 'নিডল্'। এনি হাউ,

আমি আর ফিরতে পারি না। ফেরা মানেই বেড-রিডন্ হওয়া। নো উইমেন, নো মোর বেড প্যানস আই ওয়ান্ট। ভিজে কাঁথা মাঝ রাত্তিরের ফিডিং বট্‌ল্, পোর্টেবল, বেবি, সিনেমা হল। এ সহবাসে রবে কে? এস্‌টাব্লিসমেন্ট, অশ্লীলতা, সুখ। ল্যাবরেটারী গিনিপিগ্‌স। এই নষ্ট পৃথিবীতে, এই বারোয়ারী তলায়, পরীক্ষামূলক বেঁচে থাকায়, মর্গে গুমোটে। যন্ত্রণা, যন্ত্রণা, অন্ধ যন্ত্রণা। আদর্শ বিশ্বাস প্রেম, অ্যাকিউট অ্যাডাল্‌টারি। কভারিং স্টিচ দিয়েই ঘুমোতে যাবো, মাথাটা কেমন যেন টলছে।...হোমসিক মানুষ তোমার কীসের যন্ত্রণা? দুনিয়া জুড়ে ফলস পেইন। ফ্যান্টাম পেইন। আমরা সবাই এই ভূতুড়ে যন্ত্রণায় ভুগছি। ফ্যান্টাম পেইন।"

আত্মবিশ্লেষণ ও স্বীকারোক্তির এই চরম মুহূর্তে সার্জন অমৃতকান্তি মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

সমস্ত গল্পটা এই অন্তর্সংলাপ ও স্বীকারোক্তির সুরে বাঁধা। জীবনানন্দের কবিতার লাইনের মধ্য দিয়ে নায়কের নিঃসঙ্গতাবোধ ও বিচ্ছিন্নতার বেদনা আশ্চর্য সুরসঙ্গতি লাভ করেছে। এই অন্তর্সংলাপের স্রোতেও এসেছে নিঃসঙ্গ নায়কের জীবনোপলব্ধি : "প্রেম বিবাহ সংসার। সেক্স, সিকিউরিটি সাকসেস সফলতা বিফলতা। কি এসে যায়, হোয়েন নোবডি রিটার্নস। আমরা সবাই যাচ্ছি। তিল তিল করে, নিঃশব্দে, নিরুপায়, নিরন্তর। কেউ কোথাও থাকছি না, ফিরছি না। না কৈশোরে, না যৌবনে। সঙ্গম-স্মৃতি-সুখ-ভালোবাসা, ব্লেড, নিডল্, ক্ল্যাম্প, ফরসেপস্ কিছুই তোমাকে বেঁধে রাখতে পারে না! গোয়িং টু ফাস্ট, নো ব্রেকজার্নি অ্যালাউড।"

আধুনিক জীবনের সমস্ত বিচ্ছিন্নতা, বিষাদ ও নিঃসঙ্গতা এখানে শিল্প-রূপে সংহত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্যের জীবনোপলব্ধি আজ আমাদেরও জীবনোপলব্ধি।

॥ দশ ॥

ষাটের দশকে যাঁরা লেখা শুরু করেছেন সেই তরুণতর গল্পলেখকদের কীর্তি বিচারের সময় এখনো আসে নি, তার কারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর উত্তীর্ণ হয়ে পায়ের তলায় নিশ্চিত উপলব্ধির মাটি তাঁরা এখনো পান নি।

তবু তাঁদের গল্পকে তাচ্ছিল্য করা মূঢ়তা। এঁদের যেসব গল্প বিশ-পঁচিশটি লিটল ম্যাগাজিনে পড়েছি তাদের উল্লেখ একটু আগেই করেছি। এই নোতুন গল্পের স্বল্প পরিচয় নিয়ে এ আলোচনায় ছেদ টানি।

প্রলয় শূরের 'অশরীরী কণ্ঠের কাছে নতজানু' (অন্বীক্ষণ, শারদীয়, ১৩৭৬) তাঁর এযাবৎ লেখা গল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

নাটকে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন লখিন্দর সেন। এগল্প তাঁরই কাহিনী। অভিনেয় নাটকের দৃশ্যের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত নায়কের জীবনের দৃশ্যনিচয়। চলতি বাংলা ও সাধু বাংলা গদ্যভাষার সমান্তরাল ব্যবহার এ দুই জগতের ব্যবধানের ইঙ্গিতসূচক। সহজিয়া ওরফে মণি নামক যুবতীর সঙ্গে লখিন্দর সেন ওরফে লখির প্রণয় সম্পর্কের বিশ্লেষণ আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে রচিত। সেই অনিবার্য নিঃসঙ্গতাবোধ ও বিচ্ছিন্নতার বেদনায় আক্রান্ত লখি সেন। লখিন্দরের অস্তিত্বের সংকট, তার স্বীকারোক্তির আন্তরিকতা ও নিঃসঙ্গতাব বেদনা এখানে নির্ভুলভাবে ব্যক্ত। মণি ও লখির অসংলগ্ন সংলাপ আসলে তাদের অস্তিত্ব উদ্‌ঘাটনের বিবরণ।

"মণি, সনকা নামে কাউকে কোনদিন আমি চিনতাম একথা সম্পূর্ণ মিথ্যে। তোমাকে যেমন চিনি ঠিক তেমনি করেই আমি সনকাকে চিনি।

কিন্তু তুমি অসুখের কথা বলেছিলে.........

কিন্তু হ্যাঁ, আমার অসুখ আমার সনকা আমার সহজিয়া আজ সমস্ত কিছু একসঙ্গে আমার সব কেমন গোলমাল করে দিচ্ছে। মণি, সনকাকে তুমি ঈর্ষা করো আমি বুঝতে পারি, তাই তার অস্তিত্বকেই তুমি স্বীকার করতে চাও না।

লখি, আমি তাহোলে একটু ঘুরে আসি ?

না, বোসো।

না, আমার সময় নেই।

আমারও কি সময় আছে মণি ?

যদি না থাকে বসতে বোলছো কেন ?

এর সঙ্গে সময়ের কোন সম্পর্ক নেই। আমার শরীরের কোথায় যেন একটা ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কখনো মাথার সামনে, সমস্ত কপাল জুড়ে, কখনো মাথার পেছনে, কখনো দুই হাঁটুতে

কখনো বুকে কখনো বুকের প্রত্যেক হাড়ের ভেতরে কখনো শিরদাঁড়াটার ওপর নীচে, কখনো সমস্ত শিরায় শিরায় একটা অসহ্য যন্ত্রণা আমাকে চার-পাশ থেকে হত্যা করার জন্যে কেমন একটা শয়তানের ফাঁদ পেতেছে।"

নায়কের এ যন্ত্রণা তার অস্তিত্বের সংশয়জনিত যন্ত্রণা। এই গল্পে আর কিছু নেই, অস্তিত্বের সার্থকতা-অন্বেষী এক ক্লান্ত মানুষের যন্ত্রণা লিপিবদ্ধ। মানসিক অবস্থার বর্ণনায় এক ধরনের অসংলগ্নতাকে এখানে রীতি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

আর একটি গল্পে অসংলগ্নতা মানসিক অস্থিরতার প্রকাশক।

"—নাঃ, দাঁড়ান।

লোকটা আলো নিবিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল, হঠাৎ চারদিক অন্ধকার, চেয়ারের হাতল ঠাণ্ডা টেবিলের পাথর ঠাণ্ডা।

গলার মধ্যে—এমন সময় মাথার কাছে দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল।

—শুনুন কোনটা ওর নিঃশ্বাসের শব্দ।

ঘরের মধ্যে ঝড়ের শব্দ উঠল। ঝড় কি? ঝড় কি এত মৃদু, এত গম্ভীর, ছোট, এত সহসা।

চোখ বুজলে, বোধ হয় বুজলাম। কী তীব্রভাবে মনে পড়ছে, কতবার ঘরে বাইরে, দিনে রাতে, অথচ ঠিক কোনটা বা কোনগুলো……"

['অথচ', শেখর বসু, দশটি গল্প]

তাৎক্ষণিক উপলব্ধি, অস্তিত্বের সংশয় উত্তরণের প্রয়াস, আত্মোপলব্ধির জন্য অন্তর্লোকে যাত্রা স্বীকারোক্তির পথে প্রকাশিত। ভাষা তীক্ষ্ণ অর্থবহ। বাক্য ছাঁটা ছাঁটা। শব্দপ্রয়োগ তির্যক। উপমা ও ইমেজে অ-সাধারণতা। নির্বস্তুককে বস্তুরূপে আনার প্রয়াস ও বস্তুলোকের অভিজ্ঞতাকে নিরবয়ব করার প্রচেষ্টা এই নোতুন রীতির গল্পে লক্ষণীয়। কখনো ডিটেলের প্রতি ঝোঁক, কখনো সাবজেকটিভ বর্ণনা। সবটা মিলিয়ে আত্মজৈবনিক পদ্ধতির অনুসৃতি। এখানে বহির্লোকের ঘটনার প্রতি উপেক্ষা ও চেতনার অন্তঃস্রোতের প্রতি মনোযোগ অনায়াসলক্ষণীয়। দুয়েকটি উদাহরণে তা প্রমাণিত হয়।

"দিনরাতের সময়েরা হাঁটে। অভিমান ভাঙে ও গড়ে। রাতের বিছানায় শুয়ে কুমু সহসা একটুকরো মেঘ হয়ে যায়। সরল শাদা গাভীর মতো

পলাতক মেঘ, জলভারে ঈষৎ আনত, উড়ু উড়ু, পালাই পালাই, চোখের জলে বালিশ ভিজে কাঠ। এখন চারিদিকে অন্ধকারেরা, সময়েরা হাঁটছে। শরীর এখন মেঘ নয়। নেবুর পাতা পুড়লে গন্ধ ওড়ে, শুকনো ছাই মিশে যায় পৃথিবীতে, বৃষ্টি পড়বে পড়বে এমনি একটা ভাব নিয়ে চারিদিক থমথমে। কপালের কাঁচপোকা টিপ খুলে ফেললে, নিজের নাম কত নিঃশব্দে উচ্চারিত হয়। আমার নাম কুম্‌কুম্‌। বাইরের চুপচাপ বারান্দায়, একা একা বাগানের মাথায় আকাশ, তারাফুল ভাসছে, প্রাকৃতিক আলোয় শরীর ভিজে যাচ্ছে। এক বালতি জলের উপর নিজের মুখের ছায়া। এককালে বুক উজাড় করা ভালবাসা কুমু সমর্পণ করেছিল।" ('জীবনের দিকে', বাণীব্রত চক্রবর্তী, 'অন্তর্বাহ', সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮)।

সেই ভালোবাসার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কুমু নিজেকেই বিশ্লেষণ করছে। এ গল্প সেই অন্তর্বিশ্লেষণের পরিচয়। কুমু তার যন্ত্রণার পরিস্থিতির বাইরে, সব কিছু পেরিয়ে, একা একা, বেরিয়ে যেতে চায়। প্রেমপাত্র অবনীভূষণের সঙ্গে কোথাও যেতে চায়। এই বাসনায় উপনীত হতে গিয়ে কুমু যেভাবে নিজেকে দেখেছে, এ গল্প তারই পরিচয়স্থল।

এই নোতুন রীতির আরেকটি উদাহারণ নিই। লেখক বলরাম বসাক, 'শাস্ত্রবিরোধী গল্প' আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। এর গল্প 'দরজা বন্ধ'-এ (তদেব) পূর্বধৃত লক্ষণগুলি বর্তমান।

"কিছু একটা ফেলে এসেছে মনে করে সে ফিরল। দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজায় টুক্‌টুক্‌ শব্দ করল। তারপর আবার দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দরজার আকৃতি দেখল। চারকোণা আকৃতি। আয়তক্ষেত্র। মাঝখানে বর্গক্ষেত্র। বর্গক্ষেত্রে বৃত্ত। বৃত্তে বিন্দু। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসংখ্য বিন্দু দেখতে লাগল। বিন্দুর রঙ সবুজ। অসংখ্য সবুজ। বৃত্তটা সবুজ। অসংখ্য বৃত্ত। বর্গক্ষেত্র সবুজ।......"

এইভাবে নানা রঙ বিন্দু আয়তনের সমাহার যোগবিয়োগের মধ্য দিয়ে অনামা নায়ক 'সে' মানসিক অস্থিরতাকে প্রকাশ করেছে। চার পৃষ্ঠার এই গল্পে ঘটনা এগোয় নি, কারণ ঘটনা এখানে গৌণ। মানসিক অনুভবই সব-কিছু। গল্পশেষে—নায়কের উপলব্ধি একটি বিন্দুতে গিয়ে বাধা পেয়েছে—সে বাধাটাই গল্প।

"—এখানে কি কোনও কিছু ফেলে গেছিলাম?

—না তো।

—ফেলে যাই নি? ও। আচ্ছা ধন্যবাদ। সে মাথা নামাল। ফিরে দাঁড়াল। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল। রাস্তায় নেমে এলো। হঠাৎ মনে পড়ল চোখটা ফেলে এসেছে। সে তাড়াতাড়ি ফিরে এলো। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে। সে উবু হল। চোখটা পেল না। চোখটা হয়ত গড়িয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে গেছে। দরজা বন্ধ, চোখটা দরকার। দরজা বন্ধ। সে আবার দরজায় শব্দ করল। শব্দ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে.........।"

॥ এগার ॥

'লাস্ট বাট নট দ্য লীস্ট' কমলকুমার মজুমদার। তিনি একক, স্বতন্ত্র, উগ্রভাবে স্বকীয়। তাঁর রচনারীতি আধুনিক কোনো লেখক অনুসরণ করেন না। তাঁর গল্প অসাধারণ, আক্ষরিক অর্থে অ-সাধারণ। 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্প সংকলন ও 'সুহাসিনীর পমেটম' গল্পের জুড়ি নেই। তিনি কোনো গোষ্ঠীর নন, দলের নন, পথের নন। অথচ তিনি আধুনিক, প্রচণ্ডভাবে আধুনিক। তাঁকে বাদ দিয়ে আধুনিক বাংলা গল্পের কোন আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

'সুহাসিনীর পমেটম' বড়ো গল্প, সর্বাংশে ভিন্ন স্বাদের গল্প। কমলকুমারের ভাষারীতির স্বাতন্ত্র্য প্রথমেই চোখে লাগে, কানে লাগে।

এ গল্পের সূচনাটি দেখুন—

"সে আপনকার অতীব শ্রীযুক্ত মুখমণ্ডলের খাসা সীম বীজ নাসার বেসর সেখানে ঝুটাপান্না—মনোলোভা পান্নার ইহকালের অচীন সুদীর্ঘতা বহু সন্তরণে অতিক্রম করত আসিয়া স্থির মূর্ত, উহাতেই দোমনা অঙ্গুলি প্রদান করে এবং এই অঙ্গুলিতেও নির্ঘাত, অবশ্যই, তাহার, সুহার—সুহাসিনীর দগ্ধ তীক্ষ্ণ রাত্র যাহা মেঘগর্জনের উন্মাদ দাপট ও যুগপৎ ভেককুল আর ঝিঁঝিঁর পরম্পরা ডাক মিশ্রিত ত্রাহি করা দুর্যোগ ফলে, এ কারণে, এহেন ঘোরঘটা যামিনীর মাড়ি পীড়নজড়িত যখন এমনও যে উহার, বালিকার, ডাগর কালীয়া চতুর দেহ সুতপ্ত—এখন, যদ্যপি সে অল্পবয়সী তত্রাচ তাহার শরীর বৈভব সুকুমার লাল, পুরুষ অভিমানী—আরও যে, এই অবয়ব যাহার কক্ষস্থ লণ্ঠনের

হেতু দশাসই রুদ্র মখমল পট্টছায়া, মশারী তবু, দর্শনে প্রকৃতই বিশেষ মীনগন্ধ-বৈধ বাসনায় উচ্ছ্বসিত হওয়া স্বভাবত যে সম্ভব, যে তথাপিও কোনক্রমেই বুঝে না—উপরন্তু, অথচ এই হয় যে, পার্শ্ববর্তী ভাঁড়ার ঘরের, যাবতীয় কিছুর হইতে ছোটলোক, নিম্নশ্রেণীর, মাথার কিটকিটে সুলভ বাসের সহিত শিকে-তোলা হাঁড়িতে জাওলা মাছের কচিৎ চাঞ্চল্য প্রসূত ঘর্মাক্ত তৃপ্তিদায়িনী রতিসুখ আপ্লুত শব্দ উত্থিত হয়, তৎব্যতিরেকেও" –

এখানে বাক্য শেষ হয়নি, তা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। বোঝা যায়, এই ভাষারীতি সচেতনভাবে নির্মিত। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এই অনন্যসাধারণ গদ্যভাষারীতি গড়ে তুলেছেন। ভাষার ক্ষেত্রে পরাগতি বলে একে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গল্পের বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনে একে ব্যবহার করা হয়েছে।

কমলকুমারের গল্পে পুরনো গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ, অন্ত্যজ পতিত, দেশী খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের জীবনকাহিনী, ধ্যানধারণা, লৌকিক অলৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রভাব রূপায়িত হয়েছে। কমলকুমারের গল্পলোক এক অ-সাধারণ রূপলোক, সেখানে বিচিত্র চরিত্রের মিছিল, অনেক ভুলে-যাওয়া মানুষের পদধ্বনি, অনেক বিস্মৃত সামাজিক প্রথা আচারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বিচার।

বট ও বেল জোড়াগাছের তলে পঞ্চাননতলায় মঙ্গলবারে শৈবালীর 'ভর' হয়। তার বর্ণনাটি বিস্মৃতপ্রায় অলৌকিক সংস্কার-ধারণায় পূর্ণ জগতে আমাদের নিয়ে যায়। মানবমনের বিচিত্র রহস্য ও জটিলতা নিপুণ তূলিকাসম্পাতে বর্ণোজ্জ্বল হয়ে ওঠে :

"শৈবালী এলোচুলে বসিয়া, দুই জানুতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ—করস্পর্শ যুক্ত মুষ্টিবদ্ধ হাত—খানিক অনাবৃত জঙ্ঘা প্রতীয়মান যেখানেই, এখানে ন্যস্ত; চোখ দুইটি বিরাট। ইহাতে অনেকের অন্ধকার; অধুনা অর্দ্ধ নিমীলিত, তেলা গায় মাঝে মধ্যে কিয়ৎক্ষণ স্থায়ী রোমহর্ষ আর যে ইহাতে রমণীর শিথিল অঞ্চল নিমেষেই স্খলিত তৎকালে উহার নিরাভরণ তুমুল বক্ষদ্বয় অপ্রকৃতিস্থ লক্ষ্য হয়, এবম্বিধ ভরের প্রতি বালকের পলকমাত্র ঔৎসুক্য নাই তত্রাচ এখন সুহার সহিত বাক্যালাপ মধ্যেই অচিরাৎ বাজনার তারতম্য শ্রবণে, তাহারও দেহে, বাদ্যের দ্রুত লয় প্রতিধ্বনিত হয়, উহার কল্পনায় পঞ্চাননতলার ছবি—শৈবালীর উদর ঊর্ধ্বে, গাত্র, শিয়র, ক্রমবর্দ্ধমান আবেগে চক্রাকার, ঘুরিতেছে;

রমণীর কেশদাম অসংখ্য কৃষ্ণবিদ্যুৎ, কিছু কাঁধে খানিক উপস্থিত আঁচলখসা নিটোল বুকে যাহা ইদানীং তাম্রাভ রক্তিম; রমণীর ওষ্ঠ হইতে কখনও বা জোরে পরক্ষণেই 'বাবাঃ! মাতঃ!' শব্দ নির্গতবান, দর্শনার্থীরা মুহুর্মুহু পঞ্চানন উদ্দেশ্যে ঘোরনাদে জয়ধ্বনি করি উঠে ; ঢাকিরা উন্মত্ত পদবিক্ষেপে, সানাই-ওয়ালা কচি-খেমটাভঙ্গে অর্থাৎ ভয়াবহ নৃত্যের কেয়ারিতে শৈবালীকে পরিক্রমণ ফলে, এতেক নিকট হইতে ঢাকের বিদীর্ণকারী আওয়াজে, সে হতচৈতন্য মাতাল—উহাতে এক অনৈসর্গিক বীজগণিতাত্মক সূক্ষ্ম আভাস, কে জনমানুষের অন্ধকারে নিশ্চিতকে মন্থর করে, এখনও রমণী গভীরে, সে যখন ইত্যাকার সঞ্চালনে দেহ অল্প পশ্চাতে হেলায়-চিৎয়ায় সেক্ষণে বক্ষদেশস্থ গাঢ়লাল ওতপ্রোত, ঝটিতি উহার—আকণ্ঠ নিশ্চিত সকল লইয়া—উঠিয়া দাঁড়াইবার চরম মুহূর্তটির জন্য প্রত্যেকেই উদ্বেগে আকুল, উন্মুখ !"

কমলকুমার মজুমদারের গল্পের ভাষারীতি বাইরের পোশাক নয়, তা গল্পের সঙ্গে অচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত। কমলকুমারের গদ্য চিত্রধর্মী গদ্য, কাব্যধর্মী নয়, পদ্যধর্মী নয়, তা কথ্যরীতির অন্ধ অনুসৃতি নয়, কথ্যরীতির ছন্দোনির্ভর। এখানে অনুপ্রাস ও গুরুচণ্ডালির সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। যেকথা ঘটনা বর্ণনার দ্বারা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার দ্বারা বলা হয়, কমলকুমার তা চিত্রের মাধ্যমে বলেছেন। এই ভাষারীতির মূল্য অবশ্যস্বীকার্য।

কমলকুমারের চিত্রধর্মী গদ্যরীতি সম্পর্কে নিম্নধৃত অভিমত প্রণিধানযোগ্য—

"এতকাল বাংলা গদ্যে চিত্র যোজনা অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়েছে, কিন্তু চিত্র-রচনা হয় নি। গদ্যের ক্রমবিকাশের ফলে এখন বাংলা গদ্যে চিত্র-রচনাও আর অসম্ভব নয়। এবং যতদূর জানি কমল মজুমদারের 'জল' নামক গল্পটি চিত্র-রচনার দৃষ্টান্ত হিসাবে অগ্রগণ্য। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'সাহিত্যপত্র' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায়, কার্তিক, ১৩৫৫ সালে। সমগ্র গল্পটি একটি নিখুঁত চিত্র তথা ভাব ও আবেগের নিখুঁত মূর্তি। এত ভাল গল্প বাংলায় খুব কমই দেখা গেছে।......তিনি ভাষাকে বদলেছেন, বাক্যরচনা-রীতির বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন, এক কথায় তিনি একটি প্রায় স্বতন্ত্র ভাষাই তৈরি করেছেন, তবু বাংলার মন, ভাব, রস, আবেগ তথা চিত্র বিকৃত হয় নি।......একটি ছোটগল্পের মধ্যে এতখানি বর্ণাঢ্য, ভাষার বৈচিত্র্য আর কোনো বাংলা গল্পে পড়েছি বলে মনে পড়ে না।......একদিকে কারিগরের হাত ও অন্যদিকে মহৎ শিল্পীর ব্যঞ্জনা এত স্বল্প পরিসরের মধ্যে দেখতে

পাওয়া আজকাল বিরল।" ['বাংলা গদ্যে চিত্র', শ্রীচঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, চতুরঙ্গ, বৈশাখ, ১৩৫৮, পুনর্মুদ্রণ, এক্ষণ—এপ্রিল, ১৯৬৮ পৌষ-চৈত্র ১৩৭৪]।

নিজস্ব ভাষারীতিতে কমলকুমার মজুমদার তাঁর গল্পলোকে অসাধারণ রূপলোক গড়ে তুলেছেন। তাঁর চিত্রলোক আমাদের এক নোতুন অভিজ্ঞতার স্তরে উত্তীর্ণ করে দেয়—যেখানে জীবনের রক্ত গাঢ়, রহস্য গভীর, লৌকিক-অলৌকিকে মেশামেশি।

বাংলা ছোটগল্পের এই প্রদক্ষিণে জীবনোপলব্ধির অনেক ফলবান মুহূর্ত বর্তমান লেখকের অন্তরে সঞ্চিত হল, যা বারবার ফিরে ফিরে দেখার যোগ্য।

শহুরে সভ্যতা, সমাজের রূপান্তর : কথাসাহিত্যে প্রতিফলন

আধুনিকতা, ব্যক্তির বিকাশ

আধুনিক কালের মানুষের সঙ্গে মধ্যযুগের মানুষের পার্থক্য কোথায়? এই প্রশ্নটি একালের সমাজতাত্ত্বিকদের ভাবিয়েছে। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন, সভ্যতার রূপান্তরে সমাজ বদলেছে, পুরানো মানবিক মূল্যবোধের অবসান ও নোতুন মূল্যবোধের উদ্ভব হয়েছে এবং অনিবার্যভাবে সাহিত্যে, বিশেষ করে সমাজনির্ভর কথাসাহিত্যে, পালাবদল হয়েছে।

এই প্রশ্নের উত্তরে সমাজবিজ্ঞানী জেকব বুর্খার্ট বলেছেন, These modern men···were born With the same religious instincts as other Mediaeval Europeans. But their powerful individuality made them in religion, as in other matters, altogether subjective. (Jacob Burckhardt, 'The Civilisation of the Renaissance in Italy', part, vi, p. 303). ব্যক্তির উপরে গোষ্ঠীর প্রভাব অপসৃত হয়েছে, ধর্মীয় নৈতিক সামাজিক শাসন শিথিল হয়েছে, ব্যক্তির দৃষ্টিতে বিশ্ব নবরূপ লাভ করেছে। আধুনিক মানুষের এই নব পরিচয় তার সাহিত্যে ধরা পড়েছে।

শহুরে সভ্যতা

শহুরে সভ্যতা (urban cvilisation) ব্যাপারটাই দুনিয়ার ইতিহাসে নোতুন। পূর্বে শহরের তেমন প্রাদুর্ভাব ছিল না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের পৃথিবীতে শহর ছিল না তা নয়, কিন্তু তার সামাজিক অভিঘাত ছিল না। রোম, আথেন্স, কার্থেজ, কনস্টান্টিনোপল, আলেকজান্দ্রিয়া, উজ্জয়িনী, পাটলিপুত্র, বারাণসী, কাঞ্চীপুর ছিল। কিন্তু এই সব প্রাচীন শহরের সামাজিক অভিঘাত ছিল না। কেননা, সমাজবিজ্ঞানীর ভাষায় তারা ছিল কেন্দ্রীভূত ও বিবর্ধিত গ্রাম মাত্র। শহর বলতে আমরা যা বুঝি, তার বিচিত্র

সভ্যতা, তার আলাদা সংস্কৃতি, আলাদা চালচলন ও সমাজ-ব্যবস্থা, আলাদা অর্থনৈতিক কাঠামো—এসব কিছুই ছিল না। প্রাচীন ও মধ্যযুগে urban centres হয়তো ছিল, কিন্তু urban civilisation ছিল না।

শহরের লক্ষণ

সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবর শহরের লক্ষণ নির্দেশ করে বলেছেন—

(ক) শহরের সীমার বাইরের প্রদেশ থেকে তার বিচ্ছিন্নতা ;

(খ) শহরে লোকদের মধ্যে 'ব্যক্তিগত পারস্পরিক আলাপপরিচয়ের অভাব' ;

(গ) কৃষির বদলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর অধিক নির্ভরশীলতা ;

(ঘ) অর্থনৈতিক তথা জীবিকাক্ষেত্রের বৈচিত্র্য ;

(ঙ) স্থায়ী বাজার (মার্কেট)—অর্থাৎ ব্যাপকতম অর্থে ব্যবসায়িক ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময় ক্ষেত্রের প্রাদুর্ভাব। (Max Weber, 'The City', Collier Books, 1962, pp. 71-74).

শহরজীবনের এই সব লক্ষণ মানুষকে গ্রাম থেকে, গোষ্ঠীজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনল।

প্রাচীন পৃথিবীতে—ইয়োরোপে এশিয়ায়—প্রায় একই ধরনের গ্রামীণ সভ্যতা বজায় ছিল। ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়ের পর দেখা দিল ধনতান্ত্রিক সভ্যতা, দেখা দিল বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ শহুরে সমাজ। গ্রামীণ সভ্যতার উপর ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাতে সমাজের চেহারা বদলে গেল।

ভারতের গ্রামীণ সভ্যতার উপর ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত : অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার ভাঙন

আমাদের গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, সেই জন্য গ্রামের সমাজও ছিল দৃঢ়বদ্ধ। শ্রেষ্ঠীকুল বন্দরে বন্দরে নৌকা বাঁধতেন, সার্থবাহ চলত এশিয়ার বিভিন্ন মরুপ্রান্তরে। কিন্তু সমগ্র সমাজের দিক থেকে দেখলে এদের সংখ্যা বেশি নয়। অর্থাৎ social mode বা pattern-এর দিক থেকে বলা যায়, গ্রাম ছিল মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সমাজ সে হিসেবে ঘনসম্বদ্ধ। দূর-দূরান্তরে লোকের চলাচল খুব কম ছিল, সুদূর দেশের বাজারের ('মার্কেট') জন্য পল্লীগ্রামে কেউ জিনিস উৎপাদন করত না—যা-ও বা করত (যথা মসলিন)

তা-ও মুঘল আমলের শেষদিকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তেমনই সামাজিক ক্রিয়াকর্মে চাদরটা কাঁধে ফেলে একবার এপাড়া ওপাড়া সকলের দ্বারস্থ হলেই চলত—এখনকার মতো আত্মীয়-স্বজন দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে ছিল না। সকাল থেকে সন্ধ্যে দেখা হ'ত পরস্পরের সঙ্গে, হাজাশুকো হলে সকলেই সমান উদ্বিগ্ন, বান ডাকলে সকলেরই সমান সর্বনাশ, দোলদুর্গোৎসবে সকলেরই সমান আনন্দ। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আক্রমণে আমাদের এই mode বা pattern-টাই গেল ভেঙে (যেমন ভেঙে গিয়েছিল ইয়োরোপে)। অথচ তার জায়গায় নোতুন বলশালী ধনতান্ত্রিক সভ্যতারও উদয় হল না (যেমন উদয় হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের ইয়োরোপে)। তার ফলে জন্ম নিল এক পঙ্গু বিকলাঙ্গ কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ। এক শতাব্দী আগেও কার্ল মার্কস বুঝতে ভুল করেন নি যে, রেলপথ বিস্তার করে ইংরেজ ভারতবর্ষে এক সুদূরপ্রসারী বিপ্লব ঘটাচ্ছে। গ্রামগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং সেইসঙ্গে সমাজের ঘনিষ্ঠ বাঁধন গেল ভেঙে। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম উপন্যাসে এই ভাঙনের, পালাবদলের ছবিটি চমৎকার ধরা পড়েছে। চেষ্টা করেও এই ভাঙনকে রোধ করা যায় না, ইচ্ছে থাকলেও পূর্বেকার আত্মীয়বোধ ফিরিয়ে আনা যায় না,—তা উপন্যাস দু'টিতে দেখানো হয়েছে।

গ্রামীণ শ্রেণীবিন্যাসের পরিবর্তন

গ্রামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেমন ভেঙে গেল তেমনি গ্রামীণ শ্রেণিবিন্যাসও বদলে গেল।

"গ্রামের অবস্থা ক্ষয়িষ্ণু হতে আরম্ভ হল। যা কিছু কুটিরশিল্প ছিল তা সব নষ্ট হয়ে সমস্ত লোক কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ল। অন্তত ১৮২৫ সাল হতে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ পড়তে লাগল অত্যধিক। জমির সন্ধানে এমন কি জেলা ছেড়ে বাইরে যাওয়া কিছুকালের মধ্যে আরম্ভ তো হলই (১৮৫০ সাল নাগাৎ সুন্দরবন হাসিল আরম্ভ হয়েছে), সেইসঙ্গে বাংলাদেশ ছেড়ে বাইরে যাওয়াও যে শুরু হয়নি তাও নয়। হাণ্টার সাহেব লিখেছেন, ১৮৭০ সালেও বাঁকুড়া থেকে আসামে কুলি চালান হচ্ছিল।

সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্রামীণ শ্রেণিবিন্যাস অন্যরকম হয়ে গেল। মুসলমান আমলে সরকারী তহবিলের একমাত্র সম্বল ছিল ভূমিরাজস্ব, অন্য রাজস্ব থাকলেও তার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ছিল না। কাজেই যতই

অত্যাচার অবিচার থাক না কেন, শেষ পর্যন্ত স্বর্ণডিম্ব-প্রসবিনী মুরগীটা কোনরকমে বেঁচে থাকে সে চেষ্টাটুকু না করলে চলত না। এর একটা পরিচয় পাওয়া যায় তকশীম আর হস্তবুদের তফাতে। মুসলমান আমলের প্রথমদিকে ছিল তকশীম, অর্থাৎ চাষী কর্তৃক উৎপন্ন ফসলের উপর রাজস্বের নিরিখ নির্দেশ। ফসল না হলে বা কম হলে চাষীর গায়ে লাগত না। তারপর ব্যবস্থা বদলে গেল। স্থাপিত হল হস্তবুদ, অর্থাৎ চাষীর মোটামুটি আন্দাজী আয়ের উপর স্থায়ী নিরিখ। বস্তুতঃ লাভ হোক আর নাই হোক, কর দিতেই হবে। ইংরেজ এই হস্তবুদ ব্যবস্থা তো প্রচলন করলেনই, সেইসঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং বিভিন্ন প্রজাস্বত্ব আইন এমনভবে জুড়ে দিলেন যে, গ্রামাঞ্চলের সমস্ত চেহারাই গেল বদলে। পূর্বে জমির উপর শোষণকারী শ্রেণী বহু ছিল না—দু'একটি মাত্র ছিল। এখন বহু শ্রেণী গড়ে উঠল। দ্বিতীয়ত, চাষী খাজনা ইত্যাদি দেওয়ার পরও যদি কোথাও সামান্য লাভবান হত সেইটুকু কেড়ে নেবার ব্যবস্থা হয়েছিল ১৮৫৯ সালের রেণ্ট অ্যাক্টে।

এসবের সোজা ফলটা হল এই যে, গ্রামে যেসব নতুন নতুন শ্রেণী জেগে উঠল তাদের আর কোনোক্রমেই একটা বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যেও এক করা গেল না। খাদ্য-খাদকের সম্পর্কে পড়ল ক্ষুরধার শান। উদ্দেশ্য উপায় লক্ষ্য আশা আনন্দ আর একমুখীন রইল না। চোরের আনন্দ রাত্রিকালে, মহাজনদের ও খাজনাপ্রাপকদের আনন্দ অনাবৃষ্টি-অজন্মায়। তাহলেই বাকী খাজনার দায়ে জমি ছাড়িয়ে অন্য লোককে চড়া সেলামীতে বন্দোবস্ত করা যাবে। তা ছাড়া পূর্বে জমিদারেরা যতখানি সামন্ততান্ত্রিক ছিলেন এখন আর ক্রমেই তা রইলেন না। জমিতে বণিকবৃত্তিই হল কর্নওয়ালিশী ব্যবস্থার নীট্ ফল। তার মধ্যে সামন্ততান্ত্রিকতার ভেজাল যতই থাক না কেন, ক্রমে সেই বণিকবৃত্তি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে লাগল। বিশেষতঃ যখন জমিদারেরা শহরমুখী হলেন, প্রজাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রইলকেবল টাকা দেওয়া-নেওয়ার ; (সামন্ত-তান্ত্রিকতার) হাতের মার বন্ধ হয়ে দেখা দিল (কর্নওয়ালিশী বণিক্‌বৃত্তির) ভাতের মার, উপর স্তরে এল শহুরে সভ্যতা অথচ নীচের স্তর রয়ে গেল গ্রামীণ, তখন আর ভাবের ঐক্য, আর্থিক সমাজের ঐক্য, কোন কিছুই রইল না। গ্রামীণ সমাজ ভেঙে গেল। দোল-দুর্গোৎসব-আনন্দও ক্রমশ গেল মরে। প্রাণের আনন্দ না থাকলে তা মরবেই।" (বিমলচন্দ্র সিংহ, 'সংস্কৃতির রূপান্তর' প্রবন্ধ)।

শহুরে সভ্যতার সূচনায় বাংলাদেশ

শুরু হল শহুরে সভ্যতা। কাল্‌চারের কেন্দ্র নবদ্বীপ হতে সরতে সরতে ভাটপাড়া হয়ে শেষ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত হল শোভাবাজারে মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের ছত্রচ্ছায়ায়। অধিষ্ঠিত হল বেনিয়ান মুৎসুদ্দির পৃষ্ঠপোষকতায়। তারপর ক্রমে ক্রমে হিন্দু কলেজ (১৮১৭) ও বিভিন্ন কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় (১৮৫৭) তার চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল। আগে গ্রাম আর শহর ছিল পরস্পরের পরিপূরক, এখন তা পরস্পরের বিরোধী। এখানেই শহুরে সভ্যতা (urban civilisation) দেখা দিল।

শহুরে জীবনের যেসব লক্ষণ সূচনায় উল্লেখ করেছি, ধীর অথচ নিশ্চিত গতিতে তা আমাদের দেশে দেখা দিতে লাগল। কলকাতার সভ্যতা ও কালচার বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখা দিল। বাণিজ্যকেন্দ্র বন্দর রাষ্ট্রশক্তির পীঠস্থান কলকাতা স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন রূপ নিতে লাগল। কলকাতার সীমানার বাইরে যে বাংলাদেশ তার সঙ্গে কলকাতার আত্মিক যোগ রইল না। গ্রামীণ সমাজে অধিবাসীদের মধ্যে যে ব্যক্তিগত পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল তা শহুরে জীবনে রইল না। কৃষির স্থলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভরশীলতা দেখা গেল। জীবিকাক্ষেত্রে এলো বৈচিত্র্য। অর্থনৈতিক জীবনের ঘটল প্রসার। শহুরে মানুষ ধীরে ধীরে গ্রামকে ভুলে গেল। গোষ্ঠীগত বন্ধন ও দায়িত্ব শিথিল হল, ট্রাডিশন ও ধর্মবিশ্বাস শিথিল হল, নৈতিক জীবনাদর্শ শিথিল হল। তার পরিবর্তে এলো শহুরে জীবনের হৃদয়হীন অমানবিক প্রবল ভারের বোধ। নাগরিক বৃত্তির সঙ্গে শিথিলনীতি ভোগপ্রবৃত্তির যোগ ঘটল। শহুরে জীবনযাত্রার গতিবেগ ও তীব্রতা মানুষকে তার পূর্বতন সংস্কার-আশ্রয় থেকে বিছিন্ন করে ভাসিয়ে নিয়ে গেল আত্মসুখপরায়ণতার পথে। এই ভেসে যাওয়া সম্প্রদায় হল গত শতকের গোড়ার দিকে ইয়ং বেঙ্গল ও শেষের দিকে বিলেত-ফের্তা সম্প্রদায়।

ভাসিয়ে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু সবাইকে নিয়ে যেতে পারল না। আধুনিক পাশ্চাত্য জীবনযাত্রাকে সবাই গ্রহণ করতে পারল না। ইংরেজি-শিক্ষা দেশে যে নোতুন শ্রেণীবিভেদ সৃষ্টি করেছিল, তার ফল হল বিষময়—নোতুন ব্রাহ্মণ হল ইংরেজি-জানা মুষ্টিমেয় সম্প্রদায়, নোতুন অচ্ছুৎ হল ইংরেজি-না-জানা বৃহত্তর সম্প্রদায়। গ্রামীণ সভ্যতা ও শহুরে সভ্যতা, ইংরেজি-শিক্ষিত ও ইংরেজি-অশিক্ষিত সম্প্রদায়—এ দু'য়ের মধ্যে ব্যবধান

বেড়েই চলল। সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়াল নিছক শহরাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি। পূর্বের মতো গ্রামের লোকে আর তার অংশীদার রইল না, নীচের স্তরের লোকও নয়। বঙ্গসংস্কৃতির অভ্যন্তরে দেখা গেল প্রকাণ্ড বিভেদ, যা এর পূর্বে কখনো দেখা যায় নি।

শহুরে সভ্যতায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা

ঐতিহাসিক পোলার্ড বলেছেন, পাশ্চাত্ত্য জগতে শহুরে সভ্যতা ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় না থাকলে মধ্যযুগীয় অন্ধকার হতে মুক্তি ঘটত না। "Without these two there would have been little to distinguish between modern from mediaeval history···When you had no middle class, you had no Renaissance and no Reformation, (A. F. Pollard, 'Factors in Modern History') মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিক-ভূমিকাটি এখানে স্বীকৃত।

পশ্চিমী সভ্যতা ও আর্থিক ব্যবস্থার আলোড়নে ও প্রশ্রয়ে এদেশে সামাজিক সমুদ্রমন্থনে অনেক গরল উঠেছিল, যেটুকু অমৃত তা হল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব। প্রত্যেক দেশেই বুদ্ধিজীবীর দল (ইন্‌টেলিজেন্টসিয়া) সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত। সমাজনেতৃত্ব তথা চিন্তাজগতের নেতৃত্বও বেশির ভাগ সময়ে তাদের হাতে থাকে। এ দেশেও তা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দের ভারতে যাবতীয় ধর্ম ও সমাজ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। রামমোহন, রানাডে, গোখ্‌লে, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ—মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকেই এসেছেন। শিক্ষাবৃত্তি, আইনবৃত্তি, সাংবাদিকতা, বেনিয়ান-মুৎসুদ্দির বৃত্তি, পুস্তকব্যবসায় প্রভৃতি অবলম্বন করেই তাঁরা উঠেছিলেন। ধর্মান্দোলনে সমাজ-আন্দোলনে তাঁরা যুক্তিবাদ ও মানবিকতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। নারীমুক্তি ও শূদ্রমুক্তিতে তাঁদের যেমন উৎসাহ ছিল, ধর্মবিশ্বাসের সংস্কারে ছিল তেমনি আগ্রহ।

বাংলাদেশে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার খণ্ডিত বিকৃতি বিকাশ

কিন্তু বাংলাদেশের বিশেষত্ব এই যে, এখানে মধ্যবিত্ত ছাড়া আর কিছুই ছিল না, গড়লও না। তার প্রধান কারণ উনবিংশ শতাব্দের ভারতবর্ষ

ছিল ইংরেজের উপনিবেশ। এখানে স্বাধীন বৃত্তি ও কর্মের অবকাশ ছিল না। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সম্যক্ স্ফূর্তি এখানে ঘটে নি। অন্য দেশে নবজাগরণের ক্ষেত্রে অন্যান্য শ্রেণীও থাকে, যারা সংস্কৃতির অগ্রগামী না হোক, তার ধারক ও পোষকও অন্তত বটে। এখানে তার চিহ্নমাত্রও রইল না। ফলে মধ্যবিত্ত সমাজ হল অমূলতরু, আকাশ-আলো-করা ফুল। যে মাটি থেকে তারা প্রাণরস সংগ্রহ করতে পারত তার সঙ্গে যোগ রইল না। ফলে এই মধ্যবিত্ত সমাজ জন্মলগ্নেই মৃত্যুচিহ্নিত হল। এই মধ্যবিত্ত সমাজ তরুণ গরুড়ের মতো ক্ষুধায় উন্মত্ত হয়ে সর্বজগৎ পরিভ্রমণ করে তার খাদ্য সংগ্রহ করল, কিন্তু নীড় রচনা করতে পারল না। মধ্যবিত্ত-সৃষ্ট সাহিত্য ও কলাসৃষ্টি হল উচ্চাঙ্গের। কিন্তু তা সমাজের সকলের ভোগে এল না। কীর্তন, রামায়ণ গান, মনসার ভাসানগানে সমাজের সবাই অংশগ্রহণ করত। কিন্তু নব্য বাংলা সাহিত্য ও শিল্পকীর্তির সঙ্গে বিপুল অজ্ঞ মূঢ় জনসাধারণের সংযোগ স্থাপিত হল না। শ্রেণী থেকে শ্রেণীর ব্যবধান হল দুস্তর, সংস্কৃতি হল বন্ধ্যা, শহুরে সভ্যতা হল বিচ্ছিন্ন। লোকসংস্কৃতির সঙ্গে এই নব্য শহুরে সংস্কৃতির বিচ্ছেদ হল সম্পূর্ণ।

শহরাশ্রয়ী সংস্কৃতির বিকৃতি ও বিচ্ছিন্নতাবোধ

তার ফল হয়েছে মারাত্মক। মধ্যবিত্ত শহরাশ্রয়ী সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে অদ্ভুত, কিন্তু তা ব্যাপক হয় নি। সামাজিক গঠনের দিক দিয়ে দেখা যায়, পূর্বে অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপে সকলে মোটামুটি একই ধরনের জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন। আধুনিক কালে জীবনযাত্রায় দেখা গেল দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান—গ্রামের মানুষের সঙ্গে শহরের ও শিল্পাঞ্চলের মানুষের কোনো সম্পর্ক রইল না। তার ফলে অনুভূতির খণ্ডীভবন ও সেই সঙ্গে সংস্কৃতির খণ্ডীভবন হয়েছে দ্রুত। জনশিক্ষার আয়োজন বিনষ্ট, ইংরেজিশিক্ষাভিমানী সম্প্রদায়ের অহমিকা আকাশস্পর্শী। সাম্রাজ্যবাদী কূটকৌশলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যবধান ক্রমপ্রসারী। ফলে খণ্ডিত সমাজশ্রেণীর প্রসরণের বদলে সংকোচন ঘটল। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিমলগ্নও দ্রুত ঘনিয়ে আসছে, কেবল এদেশে নয়, সারা দুনিয়ায়। কার্ল মার্কস্ সাম্যবাদীর ঘোষণাপত্রিকায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—The lower strata of the middle class—the small tradespeople, shopkeepers and retired

tradesmen generally, the handicraftsmen and peasants—all these sink gradually into the proletariat.' এই ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের দেশে দ্রুত সফল হচ্ছে, তা বাংলার সামাজবিন্যাসের দিকে দৃষ্টি করলে উপলব্ধি করা যায়। এ অবস্থায় মধ্যবিত্তনির্ভর শহুরে সংস্কৃতি আজ গভীর সংকটের আবর্তে পড়েছে। তা অবশ্যস্বীকার্য।

বাংলাদেশে পালাবদলের নোতুন পর্ব (১৯৪৩-৫০)

বাংলাদেশে পালাবদলের সূচনা হয়েছে ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে। জাপানের আক্রমণে পর্যুদস্ত ইংরেজের বর্মা রণক্ষেত্র থেকে পলায়নের পর থেকেই বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের সংকট ঘনিয়ে এসেছে। আগস্ট বিপ্লব (১৯৪২), জাপ-আক্রমণে ভীত ইংরেজের বাংলাদেশে পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন, বিশ্বযুদ্ধের ঢেউ (১৯৪৩-৪৫), পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩), সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬), দেশবিভাগ ও খণ্ডিত স্বাধীনতা-প্রাপ্তি (১৯৪৭), ভিটে-মাটি ছাড়া লক্ষ লক্ষ পূর্ববঙ্গীয়ের খণ্ডিত বাংলায় আগমন (১৯৪৮-৫০), যার আজো বিরতি ঘটে নি, সমরান্তিক পর্বে (১৯৪৩-৪৫) কলকাতার সমাজে বিপর্যয়—সব মিলিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক ভিত্তিভূমি ধ্বসে গেছে।

গ্রাম থেকে শহরে (বিশেষ করে কলকাতায়) চলে আসার পালা শুরু হয়েছিল পঞ্চাশের মন্বন্তরে। তারপর দেশবিভাগের ফলে তা ত্বরান্বিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে ধ্বসে গিয়েছে। উদ্বাস্তু-সমস্যার ফলে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনও দুরপরাহত।

সার্বিক সঙ্কটের ফলে সামাজিক জীবনের যুক্তিনির্ভর যান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন ভেঙে পড়ে, তখন ব্যক্তি না পারে নিজেকে রক্ষা করতে, না পারে সমাজকে রক্ষা করতে, সন্ত্রস্ত নির্বীর্য অসহায়তার কবলে আত্মসমর্পণ করে। শ্রেণীতে শ্রেণীতে যখন ব্যবধান দুস্তর ও দুর্লঙ্ঘ্য তখন সমাজকে বাঁচাতে পারে সমাজনেতারা। কিন্তু সর্বব্যাপী অবক্ষয় ও ত্রস্ততার দিনে সমাজনেতারাও ব্যর্থ হয়, বিপর্যস্ত হয়। অবতারবাদ, গুরুবাদ, মূঢ় অন্ধ সংস্কারের দাসত্ব করে যে মানুষ, তার পরিত্রাণের কোনো উপায় থাকে না। তার উপর দেশব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লবে, সামাজিক জীবনের যুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার সংকটমুহূর্তে মানুষ যখন পরনির্ভরতায় ও পরনির্দেশের অপেক্ষায় থাকে, তখন তাকে কেউ রক্ষা

করতে পারে না। বাংলাদেশে, দুঃখের বিষয়, তা'ই ঘটেছে। অথচ এই সর্বনাশের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের ধারণাও স্পষ্ট নয়। এখানেই মহতী বিনষ্টির সূচনা।

সার্বিক বিপর্যয়ের রূপ ও প্রকৃতি

এই সার্বিক বিপর্যয়ের ছবিটি পাই ম্যানহাইমের লেখায়—

The fact that in a functionally rationalized society the thinking out of a complex series of actions is confined to a few organizers, assures these men of a key position in society. A few people can see things more clearly over an ever-widening field, while the average man's capacity for rational judgment steadily declines once he has turned over to the organizer the responsibility for making decisions. In modern society not only is the ownership of themeans of production concentrated in fewer hands, but as we have just shown, there are fewer positions from which the major structural connections between different activities can be perceived, and fewer men can reach these vantage points.

This is the state of affairs which has led to the growing distance between the elite and the masses, and to the "appeal to the leader" which has recently become so widespread. The average person surrenders part of his own cultural individuality with every new act of integration into a functionally rationalized complex of activitics. He becomes increasingly accustomed to being led by others and gradually gives up his own interpretation of events for those which others give him.

When the rationalized mechanism of social life collapses in times of crisis, the individual connot repair it by his own insight. Instead his own impotence reduces him to a state of terrified helplessness. In the social crisis he allows the

exertion and the energy needed for intelligent decision to run to waste. Just as nature was unintelligible to primitive man, and his deepest feelings of anxiety arose from the incalculability of the forces of nature, so for modern industrialized man the incalculability of the forces at work in social system under which he lives, with its economic crises, inflation, and so on, has become a source of equally pervading fears. (Mannheim, 'Man and Society', pp. 58-59).

আধুনিক যন্ত্রশিল্পনির্ভর গ্রামজীবন-বিচ্ছিন্ন শহুরে মানুষের জীবনে সংকট ও তার লক্ষণগুলি ম্যানহাইম যেভাবে নির্দেশ করেছেন, তার অনেকটাই বর্তমান শতাব্দীর মধ্যবিন্দুতে বাঙালি সমাজের সার্বিক সংকট-লক্ষণের সঙ্গে মিলে যায়।

১৯৪৩-৫০ সালের বাঙালি সমাজ-জীবন এতই শ্রেণীবদ্ধ, তার সংগঠন এত দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ, বিশেষীকরণ এত অগ্রসর যে, সেদিন (এবং আজও) সাধারণ বাঙালি নিজের বুদ্ধি পরিচালনা করে নি, করতে পারে নি। সাধারণ মানুষ (averege man) হিসেবে সেদিন বাঙালি সার্বিক সংকট থেকে মুক্তিলাভের ব্যক্তিগত প্রয়াস করে নি, শ্রেণীবদ্ধ সংগঠিত শহুরে সমাজের মাথায় বসে থাকা নেতাদের উপরে নির্ভর করেছিল। পরনির্ভরতা ও পরনির্দেশের প্রতীক্ষা ছাড়া আর কিছু সে করে নি। একারণেই পঞ্চাশের মন্বন্তরে ও দাঙ্গায় হাজারে হাজারে মানুষ ক্ষুধা ও হিংসার শিকার হয়েছে, কিন্তু কেড়ে খায় নি, দাঙ্গা প্রতিরোধ করে নি। ইংরেজের যুদ্ধায়োজনের বিরুদ্ধে সেদিন বাঙালির প্রতিবাদ আগস্ট বিপ্লবের ক্ষণস্থায়ী বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে শেষ হয়ে গিয়েছিল, কলকাতা ও বাংলাদেশের অন্যত্র ইংরেজ-মার্কিন সমর-প্রস্তুতির অংশীদার হয়েছিল। আর এই যুদ্ধের সময়েই বাঙালির নৈতিক মান অবনত হয়েছিল। অসততা ও অসাধুতার সর্বরূপ সেদিন দেখা গিয়েছিল—উৎকোচের সর্বরূপ সেদিন স্বীকৃত হয়েছিল—নৈতিক শিথিলতা সেদিন সমাজের রক্তচক্ষুর দ্বারা ভর্ৎসিত হয় নি। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর' ও সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'কালো ঘোড়া' উপন্যাসে তার পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "নিজের বুদ্ধিবিভাগে যে লোক কর্তাভজা পোলিটিক্যাল বিভাগেও কর্তাভজা হওয়া ছাড়া তার আর গতি নেই।" ম্যানহাইম যে পরনির্ভর

পরপ্রত্যাশী ব্যক্তির কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন 'কর্তাভজা'। ব্যক্তি বা বুলি বা দলের কাছে আত্মসমর্পণ করে কর্তাভজা মানুষ নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে বসে থাকে। কিন্তু তাতে মনুষ্যত্বের গোড়ার কথাটি—স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—অস্বীকৃত হয়। সংগঠিত শ্রেণীবদ্ধ শহুরে সমাজে তাই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটে না, অবলুপ্তি ঘটে। ম্যানহাইম বলেছেন, 'এলিট' ও 'মাস'—শিক্ষিত সচেতন মানুষ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবধান হয় দুরতিক্রম্য। সমাজ ও সংস্কৃতির খণ্ডীভবন ও চূর্ণীভবনের ফলে তা অবশ্যম্ভাবী, কারণ এই অবস্থায় সাধারণ মানুষ বুদ্ধিচালনা করে না, তা করে শুধু এক এক দিকের বিশেষজ্ঞরা। সমাজে বিশেষীকরণ যত অগ্রসর হয় ততই বিশেষজ্ঞের আধিপত্য বাড়ে। পরিণামে দেখা যায় তাতে উপায়ের উৎকর্ষ ঘটে, সামগ্রিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। আর সংকটের মুহূর্তে শহুরে মানুষের যুক্তিবুদ্ধি ও initiative ব্যর্থ হয়, কারণ সে কর্তাভজা, পরনির্ভর, আত্মসুখ-পরায়ণ। ম্যানহাইম বলেছেন, সামাজিক সংকটমুহূর্তে আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী শহুরে মানুষ উদ্বেগ ও ভয়গ্রস্ত হয়, কারণ যেসব সামাজিক শক্তি তার জীবনে ক্রিয়াশীল সেগুলি সম্পর্কে তার বিচারবুদ্ধি কাজ করে না, তখন সে অসহায়, ভীত, পর্যুদস্ত। এই ভীত অসহায় মানুষ শতাব্দীর মধ্যবিন্দুতে বাংলাদেশের সার্বিক সংকটলগ্নে হার মেনেছিল।

শহুরে সমাজের সংকট : Urban force-এর প্রভাব : কথাসাহিত্যে প্রতিফলন

শ্রেণীবদ্ধ সংগঠিত বিশেষীকরণে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন পরনির্ভর শহুরে সমাজ এই সংকট থেকে মুক্তি লাভ করবে কোন্ পথে? পথ একটিই—সামাজিক মুক্তিলাভের পথ; শ্রেণীবদ্ধ বর্তমান সমাজের complexity থেকে মুক্তি, বিরোধী পরিবেশ থেকে পরিত্রাণ, নিয়ত সংঘর্ষ থেকে মুক্তি। যন্ত্রনির্ভর শহুরে সভ্যতায় তা থেকে মুক্তি আদৌ সম্ভব কিনা তা বিচার্য।

আমাদের চোখের সামনে বাঙালি সমাজের—বিশেষ করে শহরাশ্রয়ী পরনির্ভর গ্রামজীবন-বিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের রূপ ও চরিত্র বদলে যাচ্ছে। বিগত দুই দশকে এই পরিবর্তন খুব দ্রুতবেগে হয়েছে। এর পটভূমি পূর্ব-বর্ণিত সামাজিক কালান্তর ও সংকটের পর্ব (১৯৪৩-৫০)।

গত তিন দশকে কলকাতায় পারিবারিক জীবনের উপর শহুরে শক্তির

(urban forces) প্রভাব যদি বিচার করা যায়, তা'হলে স্বীকার করতে হয়, তা গুরুতরভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৪৩-৪৫-এ মার্কিনিংরেজ সামরিক প্রস্তুতির অধীন হয়েছিল কলকাতা। তখন বিচিত্র বৃত্তি ও জীবিকার পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। সামরিক রসদ সরবরাহ সেদিন কলকাতার বাঙালির সামনে একটি বিচিত্র অসৎ জীবিকার পথ খুলে দিয়েছিল। উৎকোচ সেদিনের সামাজিক জীবনে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (যা আজও অপসৃত হয় নি), সেই সঙ্গে মূল্যবোধের অবসান হয়েছিল (যা আজও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নি)।

প্রভাত দেবসরকারের 'বিনিয়োগ' (ভাইয়ের অবিশ্বাস্য পদোন্নতির মূল ভগ্নীকে উপরিতন সামরিক অফিসারের লালসায় ইন্ধনরূপে ব্যবহার), প্রবোধকুমার সান্যালের 'অঙ্গার' (শোভনা ও তার মায়ের দেহবৃত্তি অবলম্বন), রমাপদ চৌধুরী, 'রক্তবীজ' (যুদ্ধকালীন কলকাতায় মার্কিন সৈন্যদের পাশবিক অত্যাচার), প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'জ্বর' (ভূতপূর্ব প্রণয়ীর চৌর্য-বৃত্তি), প্রবোধকুমার সান্যালের 'মুখবন্ধ' (কালোবাজারীর পাশবিক লালসায় তার প্রাক্তন অন্নদাতার কন্যার আহুতিদান), গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'অন্নপাপ' (মানবিক মূল্যবোধ ও পাপবোধের অবসান), পরিমল গোস্বামীর 'গুহ অ্যাণ্ড পাল' (চালের চোরাকারবারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ), সন্তোষকুমার ঘোষের 'কানাকড়ি' (দরিদ্র স্বামীর নিজ স্ত্রীকে পরের চোখে আকর্ষণীয় করে তোলার ব্যর্থ প্রয়াস ও তজ্জনিত ক্ষোভ), সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ব্ল্যাক-মার্কেট' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'মৃত্যুবাণ' ও নবেন্দু ঘোষের 'বস্ত্রং দেহি' (মন্বন্তর কালোবাজারের দিনে মানবিক মূল্যবোধের অবসান), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নমুনা' (কালোবাজারী নারীব্যবসায়ীর অর্থলোভের কাছে ধর্মবুদ্ধির শোচনীয় পরাজয়), রমাপদ চৌধুরীর 'করুণকন্যা' ও 'অঙ্গপালি' (ধর্ষিতা রমণীর ট্রাজেডি) গল্পে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শোচনীয় সার্বিক বিপর্যয়ের কাহিনী জ্বলন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চেনামহল' উপন্যাসে পারিবারিক জীবনের ভাঙন ও বাহিরের কর্মজীবনে নারীর পদক্ষেপ ও তজ্জনিত সমস্যা চিত্রিত হয়েছে। একান্নবর্তী পারিবারিক ভাঙনের আলেখ্য 'চেনামহল'। আবার 'মহানগর' 'দেহমন' ও 'দূরভাষিণী' উপন্যাসে নরেন্দ্রনাথ বিচিত্র বৃত্তিতে নারীর আগমন ও নৈতিক মূল্যবোধের অবসান দেখিয়েছেন।

শহুরে জীবন রূপায়ণের (urbanisation) ক্রমবিস্তারের ফলে কেবল

একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গেছে তা নয়, সেই সঙ্গে ফ্ল্যাটবাড়ি-নির্ভর ছোট 'ইউনিট' দেখা দিয়েছে—যেখানে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চাকুরিজীবী, তার ফলে শিশুর জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে, নিঃসঙ্গতা ও অপরিচয় শিশুমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, বিনষ্ট হয়েছে তার স্বাভাবিক বিকাশ, অন্তর্হিত হয়েছে তার মানসিক শান্তি ও নিরাপত্তা। অথচ 'নার্সারী' বা 'ক্রেশে'র শোচনীয় অভাব রয়েছে। আসল কথা, শহুরে জীবনের এইসব প্রতিক্রিয়ার জন্য কলকাতার সমাজ তৈরি ছিল না।

শহুরে জীবনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য—নর-নারীর আপেক্ষিক বৈষম্য। এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা যায়, কলকাতা শহরে ৬৫% পুরুষের পাশা-পাশি ৩৫% নারী বাস করে। উদ্বাস্তুদের মধ্যে নারীর সংখ্যা আরো কম। তার ফলে শহুরে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের সমতা বিচলিত হয়েছে। সমাজের pattern অতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে, কিন্তু সমাজ তার জন্য তৈরি নয়, তার ফলে শহুরে জীবনে শান্তি, সংস্থিতি ও সমতার পদে পদে অভাব ঘটছে।

জীবনধারণের ন্যূনতম শর্তের অনুপস্থিতির ফলে শহুরে বস্তিজীবনে নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অধোগতি ঘটেছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠান' তার জ্বলন্ত আলেখ্য। আর্থিক দৈন্য ও পরিবেশের নীচতা মানুষকে কীভাবে টেনে নামাচ্ছে তার ছবি এখানে পাই। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'উপনগর' ও নারায়ণ সান্যালের 'বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প' উপন্যাস দু'টিতে উদ্বাস্তু জীবনে মানবিক মূল্যবোধের শোচনীয় অস্বীকৃতি ও মানুষের অধোগতির ছবি পাই। এই সব নোতুন গড়ে ওঠা বস্তি ও ক্যাম্প কলকাতার শহুরে জীবনের ক্ষমতা ও সংস্থিতিকে কতো গভীরভাবে বিচলিত করেছে তার পরিচয় এইসব উপন্যাসে পাই।

শহুরে সভ্যতার রূপ ও প্রকৃতি : পরিবর্তনের কারণ

শহুরে সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপ পরিবর্তনের জন্য দায়ী নানা কারণ। দ্রুত শিল্পায়ন (rapid industrilisation), বিজ্ঞান ও টেক্‌নোলজির দ্রুত প্রসার—নাগরিক জীবনযাত্রায় বিচিত্র স্বাচ্ছন্দ্যের ও উপভোগের আয়োজন, শিথিল-নীতি ধর্মবিশ্বাসরিক্ত গোষ্ঠীজীবননিরপেক্ষ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য মানুষকে করে তুলেছে ধর্মবিমুখ, গোষ্ঠীবিমুখ, পারিবারিক দায়িত্ববিমুখ, আত্মসুখপরায়ণ। শহুরে মানুষ পুরনো আত্মীয়তার শিকড় নষ্ট করে ফেলতে চায়। গ্রাম-

এখানে যেসব সমস্যা উল্লিখিত তা আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। ঘন বসতি, শহুরে এলাকার প্রসার, মহানগরীর উদ্ভব, যানবাহন, শিল্পনগরী, উদ্বাস্তু কলোনী, দরিদ্র নিম্নমধ্যবিত্তের বস্তি, অচ্ছুৎ ও হরিজন বসতি, জনবিন্যাস, জনবিস্ফোরণ, ভেঙেপড়া গ্রাম, ফেঁপেওঠা শহরতলি—এ সবকিছুই আমাদের জীবনকে আজ স্পর্শ করছে। এদের যোগফল শহুরে সভ্যতার রূপ-পরিবর্তন।

সংকটমোচনের দায়

আজ মার্কিন দেশে যে সমস্যা তা অচিরেই আমাদেরও সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। জনৈক মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী লিখেছেন, 'As the new decade of the 1970s begins American Society faces problems that appear more extensive than any in her history. One reason for this complexity is increasing population. Over 200 million people now live in the U.S.A. and the figure is increasing by about two million annually. This fact intensifies all the problems of urbanised culture experiencing profound transition changes as it moves from its traditional agricultural and small town life-style to a metropolitan-techonological civilization.' (Dr. John E. Owen, 'American in the Seventies', The Statesman, Calcutta, April 12, 1970).

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রগতি, বিপুল পার্থিব সম্পদ ও ঐশ্বর্যসত্ত্বেও আজ বিশ কোটি প্রজাসমন্বিত মার্কিন দেশ শহুরে সভ্যতা-সংস্কৃতির সমস্যা নিয়ে বিচলিত। আর পার্থিব সম্পদে দরিদ্র, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অনগ্রসর, পঞ্চাশ কোটি প্রজাসমন্বিত ভারতবর্ষ জনবিস্ফোরণের চাপে ও নিয়মান জীবনযাত্রায় আবর্তে পড়ে কী ভাবে রক্ষা পাবে? আজকের পৃথিবী ছোট হয়ে এসেছে, এদেশের সমস্যা ওদেশেরও সমস্যা। আমাদের রাষ্ট্রনেতা ও সমাজবিজ্ঞানীরা যদি পিছিয়ে থাকেন, তবে মহাকাল তাঁদের ক্ষমা করবে না। বাংলার সমাজদর্পণ বাংলা কথাসাহিত্যে যদি এই সামাজিক দায়দায়িত্বের অঙ্গীকার না থাকে, তবে তাও পরিত্রাণ পাবে না। প্রশ্ন এই—সাম্প্রতিক বাংলা তথা ভারতে মূল্যবোধের বিপর্যয়,

সমাজজীবনে অস্থিরতা, চাঞ্চল্য, সহিংস জনবিক্ষোভ, নাগরিক জীবনের পদে পদে সমস্যা, জীবনধারণের কষ্টকরতা, নৈতিক মূল্যাদর্শের অবসান, অসতের জয়, মঙ্গলের পরাজয়, ব্যক্তি ও সমাজজীবনে নিরাপত্তাবোধের অভাব—সবটা মিলিয়ে এক অগ্নিগর্ভ মুহূর্ত। এর দায় কি কেবল সাহিত্যিকের, না, সমাজের সকলের ?

শরৎচন্দ্র : পুনর্বিচার

সাহিত্যসংসারে পুনর্বিচারের প্রয়োজন সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। তবে এই প্রয়োজনীয়তা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে যতটা গুরুত্ব পায়, আমাদের দেশে ততটা গুরুত্ব লাভ করে নি। এর থেকে আমাদের চিন্তার জড়তা ও মানসিক দীনতা প্রমাণিত হয়।

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) আজো বাংলাদেশের জনপ্রিয় লেখক। বোধ করি তিনি জনপ্রিয়তম। আজো তাঁর বইয়ের বিক্রি সর্বাধিক। বাংলাদেশে steady sale যদি কেউ পেয়ে থাকেন, তিনি হলেন শরৎচন্দ্র। এর কারণ খুঁজে দেখা দরকার।

গল্পবলার নৈপুণ্য, নারীমহিমাকীর্তন, ভাবালুতাসৃষ্টির দক্ষতা ও একান্ত-ভাবে হৃদয়াবেদন শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার ভিত্তি। এই ভিত্তিটাকে একটু যাচাই করা যাক। ঘরোয়া পরিবেশ ও ঘরোয়া ভাষা বাঙালি পাঠককে অন্ধ শরৎ-ভক্ত করে তুলেছে। শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি' (১৯১৩), শেষ উপন্যাস 'শুভদা' (১৯৩৮)। ১৯১৩ থেকে ১৯৩৮—মোটামুটি এই পঁচিশ বছর ধরে শরৎচন্দ্র লিখেছেন ও বাঙালি পাঠক ও সম্ভবত অধিক-সংখ্যক পাঠিকাকে কাঁদিয়ে সাফল্যলাভ করেছেন। এই পঁচিশ বছর বাংলা সাহিত্যে কালান্তরের পর্ব। এই সময়ে সবুজপত্র, কল্লোল, বিচিত্রা, পরিচয় পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে-সব আন্দোলন দেখা দিয়েছে, যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বার বার সহযোগিতা করেছেন ও নেতৃত্ব দিয়েছেন, যার ফলে বাংলা কথা-কবিতা-নাটক-প্রবন্ধে বার বার মোড় ফেরার ঘন্টা বেজেছে, তা শরৎচন্দ্রকে কিছুমাত্র স্পর্শ করে নি। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আলাপ ছিল, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল,—তবু সবুজপত্র-আন্দোলনের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। গদ্যরীতির ক্ষেত্রে সবুজপত্র যে আন্দোলন প্রবর্তন করে, যা অল্পবিস্তর সকল লেখককেই প্রভাবিত করেছিল তা থেকে শরৎচন্দ্র অনেক দূরে ছিলেন। শরৎচন্দ্র সারাজীবন সাধু গদ্যরীতির কাঠামো আশ্রয় করে সাহিত্যচর্চা করলেন।

শরৎচন্দ্র যে-বছর (১৯১৩) বাংলা সাহিত্যে দেখা দিলেন, তার পর-বছরই (১৯১৪) প্রমথ চৌধুরী সবুজপত্র প্রকাশ করলেন। সবুজপত্রের গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকল। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'ল, এই বছরেই শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন ছেড়ে পাকাপাকিভাবে বাংলা দেশে চলে আসেন ও সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। শোনা যায়, শরৎচন্দ্র 'চোখের বালি' বারবার পড়েছিলেন। এ'কথা সত্য, শরৎচন্দ্রের আদর্শ এই উপন্যাস। কিন্তু একথাও অবশ্যস্বীকার্য, শরৎচন্দ্র কেবল 'চোখের বালি' পড়েছিলেন ও আয়ত্ত করে-ছিলেন, গোরা-ঘরে-বাইরে-চতুরঙ্গ তিনি পড়েন নি বা পড়লেও তা গ্রহণ করতে পারেন নি।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যে 'মিথ' গড়ে উঠেছে, তার সৃষ্টিকর্তা কে বা কারা? দ্বিতীয় বিশ্বসমরের কালে—শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর (১৯৩৮) পরে বাংলাদেশে যে পাঠক-সমাজের অভ্যুদয় ঘটে, তা প্রথম বিশ্বসমরকালীন পাঠকসমাজ থেকে ভিন্নতর। কিন্তু পরবর্তী নোতুন কালের পাঠক শরৎচন্দ্রকে দেখেছে পূর্ববর্তী যুগের মানুষের চোখে। শরৎ-সাহিত্যপাঠের পূর্বে এই নোতুন যুগের পাঠক শরৎচন্দ্রের সমালোচনা (ও স্তুতি) শুনেছে শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক পাঠক-সমাজের কাছ থেকে। শরৎচন্দ্রের অসাধারণ জনপ্রিয়তা যাচাই হবার সুযোগ কোনোদিন ঘটল না, তাই শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে 'মিথ'-টাই বড় হয়ে উঠল। এই 'মিথ' মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। শরৎচন্দ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার, এমনকি ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড়ো; শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের মুক্তিদাতা—মোটামুটি এই তিনটি 'মিথ' প্রবীণতর পাঠক ও সমালোচকরা চালু করলেন।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তিরিশ ও চল্লিশের দশকে বাংলাদেশে দু'টি কথা প্রচলিত ছিল—তিনি অশ্লীল লেখক, তিনি দরদী হৃদয়বান লেখক। শরৎচন্দ্রের প্রশংসা করতে হলে প্রধানত বলা হয়ে থাকে যে, করুণরসসৃষ্টিতে তিনি অসামান্য এবং তিনি অশ্লীল লেখক। পূর্বসূরী সম্পর্কে এই দু'টি উক্তিই ভ্রান্ত।

অশ্লীলতার অভিযোগ মূল্যহীন, তা একালের পাঠকসমাজ স্বীকার করেই নিয়েছেন। এ সম্পর্কে চরম কথা বলেছেন অস্কার ওয়াইল্ড। 'ডোরিয়ান গ্রে' উপন্যাসের ভূমিকায় ওয়াইল্ড বলেছেন, 'এমন কোনো বই নেই যা নৈতিক (মর‍্যাল) অথবা দুর্নৈতিক (ইম্‌মর‍্যাল)। কোনো গ্রন্থ হয় সাহিত্য বা সাহিত্য

নয়। এই পর্যন্ত।' ওয়াইল্ড আরো বলেছেন, যদি কোনো বই সুলিখিত হয়, যাতে মানুষের সর্বোচ্চ অনুভূতি সৌন্দর্যই প্রকাশিত হয়, তবেই তা সার্থক, তা দুর্নীতির প্রচারক নয়। আর যদি খারাপভাবে লেখা হয়—তা হলে শুধু বিরক্তি আনে—সুনীতি থাকলেও তা চলবে না।

শরৎচন্দ্রকে এই মন্তব্যের আলোকে বিচার করলে শ্লীল-অশ্লীলের কথা অগ্রাহ্য করাই সঙ্গত।

শরৎচন্দ্রের সাফল্যের অপর প্রধান যুক্তি, তিনি করুণরসের নিপুণ শিল্পী। মন্তব্যটি পরীক্ষাসাপেক্ষ। প্রমথ চৌধুরী একবার লিখেছিলেন, "করুণরসে ভারতবর্ষ স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে; আমাদের সুখের জন্য না হোক্ স্বাস্থ্যের জন্যও হাস্যরসের আলোক দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে।" ['খেয়ালখাতা']। বাংলাদেশের উর্বর ও আর্দ্র মাটিতে করুণরস সৃষ্টি করা খুব দুরূহ আর্ট নয়। এইখানেই আমরা ভুল করি। শরৎচন্দ্রের শিল্পকলার প্রধান উৎকর্ষ তাঁর করুণ রস সৃষ্টির আর্টে নয়, তার পেছনে যে দরদী মনটি আছে, তারই জন্য। অপরিসীম সহানুভূতি-ই তাঁর মূলধন।

ভার্জিনিয়া উল্ফ তাঁর এক প্রবন্ধে রুশ লেখকদের সাধুতার (saintliness) কথা উল্লেখ করেছেন—যে saintliness-এর মূল কথা হ'ল বিশ্বব্যাপী compassion বা সহানুভূতি। তলস্তয়, দস্তয়েভ্স্কির লেখায় এর দেখা মেলে। শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি ঠিক সে জাতের নয়, অত সর্বব্যাপী নয়, অত গভীর নয়। কিন্তু তার বিস্তার পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের সমাজনির্যাতিত মানুষের মধ্যে। শরৎচন্দ্রের সহানুভূতির মধ্যে রুশ লেখকদের saintliness নেই religiousness নেই, আধ্যাত্মিকতা নেই; তা অনেক বেশি সামাজিক কিন্তু যে সীমার মধ্যে তাঁর দরদের বিস্তার, সেখানে তিনি অকৃপণ, অকুণ্ঠ পাঠকসমাজকে তিনি কাঁদাতে পেরেছেন কিনা, তা ক্রমবিবেচ্য। কিন্তু তাঁর নিজের প্রাণ যে কেঁদেছিল দরিদ্রের জন্যে, ছোটোজাতের জন্যে, ব্রাহ্মণ-শাসিত আচারসর্বস্ব নিষ্ঠুর সমাজে নির্যাতিতের জন্যে, বাঙালিমাত্রেই সেজন্য তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন। যে বাঙালি-সমাজের প্রধান কথা অসহনীয় দারিদ্র্য ও নির্যাতন তার উচিত অভাগী ও গফুরের সৃষ্টিকারকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন।

অভাগী ও গফুরের চরিত্রে শরৎচন্দ্র সার্থক করুণরস সৃষ্টি করেছেন—কারণ 'অভাগীর স্বর্গ' বা 'মহেশ' উপন্যাস নয়। সেখানে তাঁকে অতিরিক্ত বলার

প্রলোভনে পড়তে হয় নি। হাস্যরসের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও অতিকথন বড়ো মূলধন—সেই অতিরঞ্জন ও আতিশয্য নতুনদার চরিত্রকে বা বহুরূপীর কাহিনীটিকে এক অনবদ্যতা দান করেছে। কিন্তু করুণরসের মূলমন্ত্র মিতভাষিতা, বস্তুতঃ সকল মহৎ শিল্পকর্মেরই মূল কথা সংযম। বাঙালি পাঠক তা মানতে চান না। বাঙালির প্রিয় লেখক শরৎচন্দ্রও তা মানেন নি। সেই জন্যই শৈবলিনীর ট্রাজেডির থেকে অনেক বেশি চোখের জল এনে থাকে কিরণময়ীর ট্রাজেডি। প্রবাদ আছে, বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর প্রতি যে নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছেন, কিরণময়ী তার উত্তর। শরৎচন্দ্র নিজেও সেকথা লিখেছেন। কিন্তু রোহিণীকে মেরে ফেলাই কি তার প্রতি চরম নিষ্ঠুরতা দেখানো? আর্টের সংযম কি কিছুই নয়? শরৎচন্দ্র কিরণময়ীর ট্রাজেডিকে বড়ো বেশি দীর্ঘ করেছেন, পাঠকসমাজের চোখের জল টেনে বার করেছেন।

শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে একালের পাঠকের প্রধান অভিযোগ অশ্লীলতা নয়—অতিকথন, আতিশয্য। তা শুধু 'চরিত্রহীন'এ নয়, যেখানেই তিনি করুণরসের সাহায্যে পাঠকের চোখে জল আনার সচেতন চেষ্টা করেছেন, সেখানেই তিনি আর্টের সংযম থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন, অতি উৎকৃষ্ট সাহিত্যবস্তু থেকে নিছক ভাবালুতা, সেন্টিমেণ্টালিজমের সৃষ্টি করেছেন। শরৎচন্দ্রের নায়কেরা এই জন্যেই বিবর্ণ—তারা বেশির ভাগই করুণরসের চরিত্র। আর করুণরসের আতিশয্যের ফলে তাদের একজনের মধ্যেও পৌরুষ দেখা যায় না—যারা শ্রীকান্তের মতো বন্ধনহীন, জন্মসন্ন্যাসী, ভবঘুরে, তাদের মধ্যেও না।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের শেষ পর্বে রচিত 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের (১৯২৩) আলোচনায় এই বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমার ধারণা। 'দেনাপাওনা'র পটভূমি, কাহিনীর স্বাতন্ত্র্য, চরিত্রের অভিনবতা যে সম্ভাবনায় পাঠকহৃদয়কে উজ্জীবিত করে, লেখক তার যোগ্য ব্যবহার করতে পারেন নি। ভৈরবীজীবনের ধর্মাকর্ষণের সঙ্গে নারীহৃদয়ের সংঘর্ষ বিরল। জীবানন্দের মতো চরিত্র শরৎসাহিত্যে দ্বিতীয়রহিত। তা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র এখানে সুলভ ভাবালুতার আশ্রয় নিয়েছেন।

'দেনাপাওনা'র নাট্যরূপ 'ষোড়শী', এ দু'টির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই। তাই 'ষোড়শী' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য 'দেনাপাওনা' সম্পর্কেও প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ। যে জাতের সাহিত্যে থাকে ভাবিকাদের মহিমা, সে সম্বন্ধে আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"সকল বড় সাহিত্যের যে পরিপ্রেক্ষিত (perspective) সে দূরব্যাপী, সেইটির সঙ্গে পরিমাণ ঠিক করতে পারলে তবেই সাহিত্য টিকে যায়—কাছের লোকের কলেবর যখন দেওয়াল হয়ে সংকীর্ণ পরিবেষ্টনে তাকে অবরুদ্ধ করে তখন, সে খর্ব—অসত্য হয়ে যায়।" এর উত্তরে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—"উপস্থিত কালটাও যে এক মস্ত ব্যাপার।" এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় লিখেছিলেন—"প্রত্যেক জাতিই তার সাহিত্য থেকে চিরকালের সম্পদ কামনা করে। যে সব সাহিত্যিকের ক্ষমতা আছে, বর্তমানের কোনো প্রলোভন এসে যেন তাদের তপোভঙ্গ না করে।"

কিন্তু এই দুঃখকর ঘটনাই ঘটেছে। শক্তিশালী শরৎচন্দ্রের তপোভঙ্গ হয়েছে, শরৎচন্দ্র তাঁর পাঠক-সাধারণকে খুশি করার জন্য ষোড়শী চরিত্রের সত্যরূপ আবৃত করে সাধারণের পছন্দসই একটা রূপ অঙ্কিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সত্যদৃষ্টি ব্যাহত হয় নি। তিনি স্পষ্ট ভাষায় শরৎচন্দ্রকে বলেছেন—"ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুশি করতে চেয়েছ এবং তার দামও পেয়েছ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেছ। যে ষোড়শীকে এঁকেছ সে এখনকার কালের ফরমাসের গড়া জিনিস। সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে এইরকম ভাবের ভৈরবী হতে পারে না,—কিন্তু হতে গেলে যে ভাষা যে কাঠামোর মধ্যে তার সঙ্গতি হতে পারত, সে এখনকার দিনের খবরের কাগজ পড়া চেহারার মধ্যে নয়। যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত সে এই কাহিনী নয়। সৃষ্টিকর্তারূপে তোমার কর্তব্য ছিল এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোক-রঞ্জনকর আধুনিক কালের চলতি সেন্টিমেন্ট-মিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়।"

আর্টে বিষয়ের সঙ্গে রূপের মিল হলেই সেটা সত্য হয়, শরৎচন্দ্র এই মহৎ সত্য বিস্মৃত হয়েছিলেন বলেই 'দেনাপাওনা' তথা 'ষোড়শী' সার্থক পরিণতি লাভ করে নি। সত্যকার ভৈরবী জীবন, তার আচার-আচরণ, সাধন ভজন ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য, এবং সেই আবেষ্টনীর দোষে বা গুণে বিশেষিত যে সমস্যা—ষোড়শীর মধ্যে তা নেই, তার দেবমন্দিরের ত্রিসীমানার মধ্যেও নেই। ষোড়শী নামে-মাত্র ভৈরবী এবং ভৈরবীর একমাত্র আচরণ দেখা যায়—তার মন্দিরের পূজা-আয়োজনে ও মন্দিরের সম্পদ রক্ষাণাবেক্ষণে,—আর স্বামী-স্পর্শ তার নিষিদ্ধ—তবু ঘটনাচক্রে তা সে করে ফেলেছে। তারপরের যে দ্বন্দ্ব—তা সন্ন্যাসিনী ও গৃহগতপ্রাণা রমণীর দ্বন্দ্ব নয়—তা সমাজের যে কোনো

স্তরের নারীর হৃদয়ধর্মের দ্বন্দ্ব। তন্ত্রসাধিকার অন্তর্জীবনের গূঢ়তম প্রদেশের দ্বন্দ্ব এখানে দেখা দেয় নি, ফলে উপন্যাসের শেষাংশ সুলভ ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হয়েছে, একটি মহৎ সম্ভাবনার বিনষ্টি ঘটেছে। ষোড়শী এ-কারণেই অন্তরে বাহিরে সত্য হয়ে ওঠে নি।

আসলে শরৎচন্দ্রের একটি অনড় সূত্র ছিল—বিগত-যৌবন নরনারী বা যুবক-যুবতীর পারস্পরিক আকর্ষণ এবং বিরুদ্ধ পরিবেশের চাপে হৃদয়ধর্মের অপচয়,—এর উপরেই তিনি নির্ভর করেছেন। 'পণ্ডিত মশাই'-এর কুসুমের মধ্যে তিলমাত্র বৈষ্ণব সমাজের বৈশিষ্ট্য নেই, পিয়ারী বাঈজীর মধ্যে যেমন বাঈজীত্ব নেই, তেমনই ষোড়শীর মধ্যে তন্ত্রসাধিকা ভৈরবীর বৈশিষ্ট্য নেই। তার ফলে শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রগুলিও পুরুষচরিত্রের মতই ধূসর অনামিকতায় আবৃত। বিবর্ণ দুর্বল পুরুষের উপর হৃদয়াবেদনের জোরে আধিপত্য বিস্তার করেই শরৎ-সৃষ্ট নারীচরিত্র নিঃশেষিত হয়ে গেছে।

শরৎ-উপন্যাসের ভরসাস্থলই হতাশাস্থল। আমাদের হিন্দুসমাজে নরনারীর সম্পর্ক বিধি ও ধর্মাচারের চাপে জটিল, পুরনো নৈতিক মূল্য আমাদের একমাত্র আশ্রয়। শরৎচন্দ্র এখানে নোতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, ব্যক্তিকে সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চেয়েছেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত হৃদয়াবেদন-অপচয়জনিত ক্ষোভেই গ্রন্থসমাপ্তি করেছেন। শরৎ-উপন্যাসের এই limitation আমাদের হতাশ করে। এক সংকীর্ণ মানবসমাজের সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে অস্থায়ী সমস্যার আলোচনায় শরৎ-প্রতিভা আত্মনিয়োগ করেছে।

তাই শরৎ-উপন্যাস পড়ে বার বার মনে হয়েছে মহৎ মৌলিক আবেদনের অভাব রয়েছে। বিশাল মানবসমাজ—সুদূরাগত মানবসভ্যতা—বৃহত্তর বিশ্বসমাজ—বিরাট পটভূমিতে নরনারীর জীবনের চিরন্তন সমস্যা—যা বঙ্কিম-উপন্যাস ও রবীন্দ্র-উপন্যাসে পাই, তা এখানে নেই।

শরৎচন্দ্রের মধ্যে বাঙালিত্ব খুব বেশি মাত্রায় আছে। সেইজন্যে তিনি জীবনকে করুণরসের আতিশয্যের মধ্যে দেখেছেন। হাস্যরস ও করুণরসের মিশ্রণজাত আশ্চর্যরূপে দেখতে পান নি। হাস্যরস ও করুণরস শরৎ-সাহিত্যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে বর্তমান। কিন্তু জীবনে কি আমরা তাই দেখি? জীবন কি শুধু কমিক? জীবন কি শুধু ট্রাজিক? জীবন একটি অনির্দেশ্য নামহীন আকারহীন চৈতন্যপ্রবাহ। জীবনে কোনো কিছু নেই যা নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। চার দেওয়ালের মধ্যে জীবনের রহস্যকে ধরা যায় না, নামাঙ্কিত

করে তাকে আলাদা করা যায় না। বঙ্কিম-উপন্যাসে ও রবীন্দ্র-উপন্যাসে জীবনের বিশাল রহস্যের যে ইশারা পাই, তা শরৎ-সাহিত্যে নেই। 'কপালকুণ্ডলা', 'চন্দ্রশেখর', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম', সংকীর্ণ সীমাকে বার বার অতিক্রম করে গেছে। 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে', 'চতুরঙ্গ' কোনো বিশেষ কাল ও গণ্ডীর মধ্যেই একান্তভাবে আবদ্ধ থাকে নি। কিন্তু শরৎ-উপন্যাসে এই সর্বজনীন শাশ্বত আবেদনের শোচনীয় অভাব লক্ষ্য করা যায়।

শরৎচন্দ্রের মধ্যে যথার্থ বিজ্ঞানীসুলভ নিরাসক্তি, নিস্পৃহতা ও বাস্তবদৃষ্টি ছিল না বলেই তাঁর উপন্যাসেও একটা নালিশের সুর, ক্ষুব্ধ অভিমানের সুর, সর্বদাই লক্ষ্য করা যায়। যে দৃষ্টি থাকলে জীবনরসিক সাহিত্যিক 'Ripeness is all' বলতে পারেন, যে দৃষ্টি শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিডি-স্রষ্টার মধ্যে পাওয়া যায়, যে দৃষ্টি সামগ্রিক জীবনবোধে ভাস্বর, সে দৃষ্টি শরৎ-উপন্যাসে পাওয়া যায় না। শরৎ-উপন্যাসে যে-সব সমস্যার রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়, তা আঞ্চলিক ও সাময়িক। তাঁর বিষয়বস্তু অতি পুরাতন—প্রেমের জয়। ভাবাকুল রোমান্টিক দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র প্রেমের জয় দেখিয়েছেন, কিন্তু তার মধ্যে দেশকালাতিক্রমী মহৎ চেতনা নেই।

শরৎচন্দ্র জীবনকে তার সামাজিক রূপে দেখেছেন, দেশকালগণ্ডীর সীমার মধ্যে দেখেছেন। কিন্তু সমাজ তো শাশ্বত নয়, তার রূপ ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। শরৎচন্দ্র জীবনকে বস্তু হিসেবে দেখেছেন, কিন্তু জীবন তো বস্তু নয়, জীবন হ'ল বস্তুর আত্মা। খুব ছোট ছোট জিনিস—একটি গানের রেশ, একটি সবুজ পাতার উপর আলোর নাচন, একটি ক্ষণমুহূর্ত—এই সব চৈতন্যের অণু অনবরত জীবনের চিরপ্রবহমান স্রোতের উপর ঝরে পড়ছে। আর শুধু এইসবের মধ্য দিয়েই জীবন প্রকাশিত ও প্রবাহিত হয়। শরৎচন্দ্র যে-সব মানুষের কথা বলেছেন তারা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্ট—তারা হয়তো জীবনের অনুকারী, কিন্তু তাদের মধ্য দিয়ে প্রাণপ্রবাহের সারাৎসারকে আমরা পাই না। বস্তুকেই পাই। শরৎচন্দ্র জীবনের কবি নন, সমাজের কবি। তাই শরৎচন্দ্রকে বিশ্ব-উপন্যাসক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিক বলা ছাড়া গতি নেই।

আঞ্চলিক উপন্যাস

॥ এক ॥

উপন্যাসে আমরা মানুষকে, তার জীবনের বহু বিচিত্র রূপকে, সংগ্রাম ও তৃষ্ণাকে, ব্যর্থতা ও সাফল্যকে দেখি। উপন্যাস মানবজীবনের দর্পণ। উপন্যাসের প্রথম ও শেষ অন্বিষ্ট মানুষ, তার জীবন। সুতরাং উপন্যাস জীবন-সংলগ্ন আলেখ্য।

কিন্তু একথা বলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয় না। উপন্যাসের রকমফের ও বৈচিত্র্য আছে, যেমন আছে জীবনের ও মানুষের। মানবজীবনের বৈচিত্র্য যেমন অন্তহীন, তার জীবনচিত্রণও তেমনি অন্তহীন। তাই উপন্যাসেরও বহুধা রূপ। রোমান্টিক, ঐতিহাসিক, গার্হস্থ্য, পারিবারিক, সামাজিক, বাস্তবধর্মী, রোমান্সধর্মী, চেতনাপ্রবাহধর্মী, মনস্তাত্ত্বিক—নানা রূপের উপন্যাস। তেমনি একটি রূপ—আঞ্চলিক উপন্যাস। নামেই প্রকাশ, একটি বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ এই উপন্যাস। কিন্তু উপন্যাস মাত্রেই তাই। কোনো একটি বিশেষ ভূখণ্ড, বিশেষ দেশ-কালে সীমাবদ্ধ থাকে উপন্যাসের ক্ষেত্রে। তবে 'আঞ্চলিক উপন্যাস' বলে আবার আলাদা করে দেখা কেন?

পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞান মানুষের জীবনযাত্রা আচার ব্যবহার বৃত্তি বাস্তু সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে বিচিত্র গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। এর একটি মতবাদের নাম Ecology, বাস্তুসংস্থান মতবাদ। এই মতের অনুকরণে বলা যায়, মানুষের কথার ভঙ্গি বা আদল বদলে যায় দু'চার মাইলের ব্যবধানে, কথ্যভাষা বদলে যায় দশ-বিশ মাইলের ব্যবধানে, পোষাক আচার ব্যবহার বদলে যায় পঞ্চাশ মাইলের ব্যবধানে, লৌকিক সংস্কার বদলে যেতে পারে এক শ মাইলের ব্যবধানে আর মানসিক ধ্যানধারণা বদলে যেতে পারে হাজার মাইলের ব্যবধানে। এই মতবাদকে অস্বীকার করতে পারি না। হাওড়ার বাগনানের লোক যে ঢঙে কথা বলে, হুগলীর আরামবাগের লোক ঠিক সে ঢঙে কথা বলে না। ঢাকা বিক্রমপুরের লোক যেভাবে কথা বলে, খুলনা বাগেরহাটের লোক

সে রীতি মানে না। তেমনি রংপুরের 'বাহে' ও কোচবিহারের 'বাহে' একই রীতিতে শব্দ উচ্চারণ করে না, তমলুকের অধিবাসীর উচ্চারণ ও ভাষা-রীতির সঙ্গে কাঁথির মানুষের উচ্চারণ ও ভাষারীতির কিছু-না-কিছু পার্থক্য থাকেই। অশন-বসন-বেশবাস চলাফেরা লৌকিক সংস্কার ও রীতিতে যে পার্থক্য ঘটে তা আমরা সহজেই উপলব্ধি করি। সুতরাং অঞ্চলভেদে মানুষের জীবনযাত্রা ও ধ্যানধারণায় পার্থক্য ঘটেই, তা অস্বীকার করা যায় না।

পশ্চিমী ভূ-বিজ্ঞান একটি মতবাদে বিশ্বাসী, তাকে বলা হয় Geo-political বা ভূ-রাজনীতিক মতবাদ। এই মতবাদ বলে,—নদী, মরু, পর্বত, সজল বা রুক্ষ ভূমি ভেদে মানুষের জীবনযাত্রা ধ্যানধারণা বিশ্বাস সংস্কারে ভেদ ঘটে। বীরভূমের বৈরাগী সন্ন্যাসী ভূ-প্রকৃতির কোলে যে মানুষ লালিত পালিত, তার ধ্যানধারণা বিশ্বাস অবিশ্বাসের সঙ্গে পদ্মালালিত শ্যামলাভূমি পাবনা -রাজসাহীর মানুষের জীবনে ও বিশ্বাসে পার্থক্য ঘটবেই। কোচ-বিহারের তীব্র শীত ও প্রবল বর্ষা যে মানুষকে গড়ে তুলেছে সে মানুষ হুগলীর নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় বর্ধিত মানুষের সঙ্গে খুব একটা আত্মীয়তাবন্ধন অনুভব করে না।

সুতরাং মানুষ মাত্রেই মানুষ, তার জীবনালেখ্য উপন্যাস মাত্রেই এক চরিত্রের—এই হঠকারী মত অগ্রাহ্য। জীবনে যদি ভেদ স্বীকার করি, তবে জীবনানুগ উপন্যাসেও ভেদকে মানতে হয়। আর সেকারণেই আঞ্চলিক উপন্যাসকে (Regional Novel) মানতে হয়।

কিন্তু বিশেষ অঞ্চল উপন্যাসের রঙ্গভূমি, এই-ই যথেষ্ট নয়। আঞ্চলিক সাহিত্যের কয়েকটি শর্ত আছে। ভৌগোলিক সীমা-সংহতি প্রথম শর্ত, তাতে সন্দেহ নেই। ভূপ্রকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য তার সীমা-সংহতির মধ্যেই ধরা পড়ে। সারা দেশ জুড়ে যার রঙ্গভূমি তা আঞ্চলিক সাহিত্য নয়। টমাস হার্ডির ওয়েসেক্স উপন্যাসাবলীতে ইংলণ্ডের ওয়েসেক্স অঞ্চলের বিশেষ ভৌগোলিক রূপটি ধরা পড়েছে, যেমন তারাশংকরের উপন্যাসে বীরভূমের বিশেষ ভূ-প্রকৃতি রূপ লাভ করেছে।

দ্বিতীয় শর্ত, ঐ ভূ-প্রকৃতি মানবমনের উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করবে। তা যদি না করে তবে তার আঞ্চলিকতার দাবী খারিজ। বীরভূমের ভূ-প্রকৃতির বা ওয়েসেক্সের এগডন হীথ প্রান্তরের যে রুক্ষতা, যে ভয়ালতা, যে নির্জন ঔদাস্য তা মানবমনের উপর সর্বাত্মক প্রভাব

বিস্তার করতে পেরেছে বলেই তারাশংকরের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' ও হার্ডির 'দ্য রিটার্ন অভ্ দ্য নেটিভ' হয়ে উঠেছে আঞ্চলিক উপন্যাস। ইংরেজী উপন্যাসে এর সূচনা এমিলি ব্রন্টির 'উদারিং হাইটস্' (১৮৪৭) উপন্যাসে। এখানে ইংলণ্ডের বন্য নির্জন জলাভূমির অশরীরী সত্তা তার বন্যতা, ভয়ালতা ও আবেগের তীব্রতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি এই বিশেষ ভূ-প্রকৃতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই দেখা দিয়েছে। চরিত্রগুলির আবেগের তীব্রতার মূলে রয়েছে শক্তির তীব্রতা। বর্ণনার অলজ্জ বাস্তবতা, মানবিক আবেগ ও বাসনার তীব্রতা : দুয়ে মিশে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যা ঐ ভয়াল জলাভূমির সার্থক প্রতিনিধি। এই উপন্যাসের নায়িকা নায়কের প্রতি তার ভালবাসা যে অকুণ্ঠ তীব্রতা ও প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে প্রকাশ করেছে তার সঙ্গে ঐ জলাভূমির অন্ধ প্রাকৃতিক শক্তির সংযোগ খুঁজে পাওয়া যায় :

> My great miseries in this world have been Heathcliff's miseries and I watched and felt each from the beginning ; my great thought in living is himself. If all else perished, and he remained. I should continue to be; and if all else remained, and he were annihilated, the universe would turn to a mighty stranger: I should not seem a part of it. My love for Linton is like the foliage in the woods : time will change it. I'm well aware, as winter changes the trees, it will clange . My love for Heathcliff resembles the eternal rocks beneath : a source of little visible delight, but necessary. Nelly, I *am* Heatholiff ! He's always, always in my mind : not as a pleasure, any more than I am always a pleasure to myself, but as my own being.

তীব্র বাসনার বেগ এই প্রেম-প্রকাশকে করে তুলেছে স্পন্দিত, মথিত। বাসনার রঙে রাঙা হয়েছে নায়িকা। নায়কের প্রতি তার প্রেমকে পদতলের চিরন্তন পাথরের সঙ্গে তুলনা করেছে। মানবপ্রেমের সঙ্গে প্রাকৃতিক উপাদানের এই তুলনায় মানবচরিত্র ও প্রকৃতির সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ যোগ সাধিত হয়েছে।

মানুষে প্রকৃতিতে এই অন্তরঙ্গ যোগসাধন আঞ্চলিক উপন্যাসের তৃতীয় ও অন্যতম প্রধান শর্ত, তাতে সন্দেহ নেই। হার্ডির ওয়েসেক্স উপন্যাসসমূহে—*Under the Greenwood Tree* (১৮৭২), *Far from the Madding Crowd* (১৮৭৪), *The Return of the Native* (১৮৭৮), *The Mayor of Casterbridge* (১৮৮৬), *The Woodlanders* (১৮৮৭)—প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গ যোগ সাধিত হয়েছে। মানবমনের উপর প্রকৃতির—এখানে ওয়েসেক্স অঞ্চলের প্রকৃতির—সর্বাত্মক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওয়েসেক্সের ভৌগোলিক প্রকৃতি শরীরী সত্তা নিয়ে দেখা দিয়েছে। *Far from the Madding Crowd*-এ প্রাকৃতিক পটভূমি উপন্যাসের অত্যাবশ্যক অঙ্গ। গ্রাম্য জীবনের অন্তরালে আবেগের যে তীব্রতা ও গভীরতা আছে তা এই ট্রাজি-কমেডি উপন্যাসের প্রাকৃতিক পটভূমিতেই প্রকাশিত হতে পারে, অন্যত্র নয়। গেব্রিয়েল এই প্রকৃতিভূমির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত, এ জীবন নিয়েই সে তুষ্ট। *The Return of the Native*-এ অমঙ্গলকারী নিয়তির কাছে মানুষের অসহায়তা পরিস্ফুট হয়েছে ওয়েসেক্সের প্রাকৃতিক পটভূমিতে, Clym Yeobright আর Eustacia Vye চরিত্র দুটিতে তা দেখা গেছে। ওয়েসেক্সের এগডন হীথ প্রান্তরের নির্জন ভয়ালতা, হেদারের দীর্ঘশ্বাস, ঋতুচক্রের অনিবার্য আবর্তনে ধরণীর রঙ বদল, মানুষের উপর প্রকৃতির কঠোর নিয়ন্ত্রণ ইউসটাসিয়া-চরিত্রে চমৎকার ভাবে প্রতিফলিত। এই ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারল না বলেই জীবনে সে ব্যর্থ হয়েছে। *The Woodlanders*-এ Giles Winterbourne আর Marty South চরিত্রদুটি জীবনের ট্রাজিক পরিণতির সঙ্গে ওয়েসেক্সের প্রকৃতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। বস্তুত এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও প্রকৃতি-পটভূমির বাইরে হার্ডির এইসব চরিত্রগুলিকে ভাবাই যায় না।

আঞ্চলিক উপন্যাসের চতুর্থ শর্ত জীবন-স্বাদের অনন্য একমুখীনতা ও সার্বভৌমতা। হার্ডির উপন্যাসে এই শর্ত পালিত হয়েছে। নিয়তির কাছে মানুষের অসহায়তা এবং সুখের দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া মানবজীবন দুঃখের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ—এই জীবনসত্যের উদ্‌ঘাটনে ওয়েসেক্স উপন্যাসাবলীতে প্রকৃতি কেবল পটভূমি মাত্র নয়, একটি স্বতন্ত্র সত্তা রূপে দেখা দিয়েছে। অনিবার্য অপ্রতিরোধ্য ডেস্‌টিনির কাছে মানুষের পরাজয় : হার্ডির এই প্রিয় বিষয়টি উপস্থাপনে ওয়েসেক্স-প্রকৃতি এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। হার্ডির উপন্যাসে জীবনতত্ত্বের পরই প্রাকৃতিক পটভূমির স্থান। প্রকৃতিই তাঁর

উপন্যাসগুলিকে দিয়েছে সামগ্রিকতা, জীবন-স্বাদের অনন্য একমুখীনতা ও সার্বভৌমতা। প্রকৃতি পশ্চাৎপট রূপে নয়, তত্ত্বের প্রচারক, পাত্রপাত্রীর জীবনে এক প্রবল নিয়ন্তা-শক্তি ; তার উপাদান সঞ্চারিত হয়েছে মানবচরিত্রে। 'দ্য উডল্যাণ্ডার্স', 'দ্য রিটার্ন অভ্ দ্য নেটিভ' তার পরিচয়স্থল। চরিত্রগুলি উঠে এসেছে ওয়েসেক্সের মাটি থেকে। তারা সাধারণ মানুষ, তাদের চরিত্রে আছে প্রাকৃতিক আবেগ, তারা নিয়ন্ত্রিত হয় প্রকৃতির দ্বারা। গ্যাব্রিয়েল ওক (ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড), ডিগোরি ভেন ও ইউস্টাসিয়া (দ্য রিটার্ন অভ্ দ্য নেটিভ), জাইলস উইন্টারবোর্ন ও মার্টি সাউথ (দ্য উডল্যাণ্ডার্স) চরিত্রগুলিকে পৃথিবীর সন্তান বলে আমরা জানি, আর সেকারণেই তাঁদের ভুলতে পারি না।

আঞ্চলিক গল্প উপন্যাসের পটভূমি রূপে কেবল গ্রামপ্রকৃতিকেই চাই, একথা মনে করা ঠিক হবে না। নোতুন গড়ে-ওঠা শিল্পাঞ্চল, বন্দর, শহর পটভূমিরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। চাই ভৌগোলিক সীমা-সংহতি, চাই সেই অঞ্চলের মানবমনের উপর প্রকৃতির সর্বাত্মক প্রভাব, চাই জীবনস্বাদের অনন্য এক-মুখীনতা, সর্বোপরি সার্বভৌমতা। শহরভিত্তিক আঞ্চলিক গল্প উপন্যাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর্নল্ড বেনেটের গল্প উপন্যাস। হার্ডি ওয়েসেক্স অঞ্চলের রূপকার, বেনেট পটারীজ অঞ্চলের রূপকার। পটারীজ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, সংস্কারের উপর এই কৃষ্ণাঞ্চলের সর্বাত্মক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বেনেটের 'দ্য ওল্ড ওয়াইভ্স টেল্' (১৯০৮) ও ক্লেহ্যাঙ্গার গোষ্ঠীভুক্ত তিনটি উপন্যাসে (১৯২৫) (*Clayhanger* ১৯১০, *Hilda Lessways* ১৯১১, *These Twain* ১৯১৬)। আবার ক্লার্কেন্ওয়েল অঞ্চলের পটে চিত্রিত *Riceyman Steps* (১৯২৩)-এ ঐ সীমাবদ্ধ এলাকার মানব-গোষ্ঠীর জীবন নিপুণভাবে চিত্রিত। পটারীজ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা ভিক্টোরীয় যুগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত কীভাবে অব্যাহত গতিতে চলে এসেছে, কীভাবে এই অঞ্চলের ধ্যানধারণা মানসিকতা ভৌগোলিক সীমায় সংহত শিল্পরূপ পেয়েছে, কীভাবে জীবনস্বাদের অনন্য একমুখীনতা মানুষকে চালনা করেছে, তা 'দ্য ওল্ড ওয়াইভ্স টেল' উপন্যাসে চিত্রায়িত হয়েছে। সামাজিক দলিলরূপে এ উপন্যাস মূল্যবান, জীবনায়নের সার্থক প্রয়াস রূপেও মূল্যবান। 'ক্লেহ্যাঙ্গার' গোষ্ঠীভুক্ত উপন্যাসগুলিতে পাঁচ শহারর মানুষের কাহিনী নিপুণ ভাবে রূপায়িত।

আসল কথা, আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষ্য জীবনবেধের বিস্তার, জীবনবোধের বিস্তার। এর জন্য চাই অঞ্চলটি সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা, সহানুভূতি ও নির্লিপ্তি। এমিলি ব্রন্টির ছিল ইঅর্কশায়ার অঞ্চল সম্পর্কে দীর্ঘকালীনঅভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি, তার ফল 'উদারিং হাইট্স্', হার্ডির ছিল ওয়েসেক্স অঞ্চল সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধ, তার ফল ওয়েসেক্স উপন্যাসাবলী। আর্নল্ড বেনেটের ছিল পটারীজ অঞ্চল সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি, তার ফল 'দ্য ল্ড ওয়াইভ্‌স টেল্'। ইংলণ্ডের মফঃস্বল অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বেনেটের বাস্তব ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা, খুঁটিনাটি জ্ঞান ও গভীর সহানুভূতি তাঁকে আঞ্চলিক উপন্যাস রচনায় সাহায্য করেছে। লণ্ডনের শহরতলী ক্লার্কেনওয়েল অঞ্চলের নীচুতলার বাসিন্দাদের সম্পর্কে বেনেটের অভিজ্ঞতার ফল *Riceyman Steps*। সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রায় আঞ্চলিক পরিবেশ প্রভাব নির্ণয়ে ও তার সৌন্দর্য আবিষ্কারে বেনেটের যে শিল্পদক্ষতা ছিল, তাই তাঁকে সার্থকতার পথে এগিয়ে দিয়েছে।

এইসব আঞ্চলিক উপন্যাসে পটভূমির অতিব্যাপ্তি নেই। স্বতন্ত্র অগভীর অভিজ্ঞতা সম্বল করে এইসব লেখক এমন সমাজ-পটভূমি ব্যবহার করেন নি যেখানে তা চরিত্রের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট নয় বা জীবনের ছন্দ নিরূপণে অক্ষম। সমাজপ্রভাবে বা প্রকৃতিপ্রভাবে যদি বিশিষ্ট কেন্দ্রিকতা না থাকে ও সংযোগ-নিবিড়তার অভাব থাকে, তবে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস গড়ে উঠতে পারে না। এই সত্যটি এঁরা বিস্মৃত হন নি। যেখানে এইসব ক্রটি ঘটেছে সেখানে আঞ্চলিক উপন্যাস গড়ে ওঠে নি, নূতনত্বের চমক ও উত্তেজনা-প্রসূত অগভীর জীবন-চিত্র দেখা দিয়েছে।

অনেক সময়ই এই ধরনের অন্তঃসারশূন্য, অগভীর, উত্তেজক, নূতনত্বের মোহযুক্ত জীবনচিত্র আঞ্চলিক উপন্যাসের দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু শিল্পবিচারে তা বর্জনীয়। আঞ্চলিক উপন্যাসে প্রকৃতি একটি প্রবল শক্তি, একটি স্বতন্ত্র সত্তা, একটি জীবন্ত চরিত্র। এখানে প্রকৃতি কেবল পটভূমি নয়, স্বতন্ত্র বলিষ্ঠ চরিত্র। এখানে লোক ও লোকালয়ে নিবিড় সংহতি, প্রকৃতি ও প্রাকৃতজনে ঘনিষ্ঠ সংযোগ, প্রাকৃতজনের উপর প্রকৃতির সর্বাত্মক প্রভাবের বিস্তার।

॥ দুই ॥

আঞ্চলিক সাহিত্য আখ্যায় কোন্ রচনাকে ভূষিত করব, আর কোন্ রচনাকে করব না : এই বিচার আমাদের কাছে এতক্ষণে স্বচ্ছতর হয়ে এসেছে বলে আমার বিশ্বাস। তবু বিষয়টিকে স্পষ্টতর করা যাক।

ইংলাণ্ডের রোমান্টিক কাব্য-আন্দোলনের অগ্রদূত তিন কবি ওঅর্ডস্ওঅর্থ, কোলরীজ, সাদে-কে লেক অঞ্চলের কবি (Lake Poets) বলা হয়। কারণ তাঁদের বহু কবিতায় ইংলণ্ডের উত্তরাঞ্চলে পর্বতমেখলা হ্রদাঞ্চলের পাহাড়, গিরিনদী, হ্রদ, উপত্যকা, পল্লীগ্রামের মানুষের সরল জীবনচরিত্র ও স্বভাব-বৈশিষ্ট্য নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠেছে। তবু এঁদের কবিতাকে বলা যাবে না আঞ্চলিক কবিতা। যদিও আঞ্চলিক জীবন ও নিসর্গ তাঁদের কাব্যে গভীর ছায়াপাত করেছে, তথাপি কাব্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করে নি। ওঅর্ডসওঅর্থ, কোলরীজের কবিতায় খণ্ডের পিছনে অখণ্ডের স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের অন্তরালে যে সার্বভৌমতার ব্যঞ্জনা তা এর আঞ্চলিক রূপকে অতিক্রম করে সার্বিক রূপকে প্রাধান্য দিয়েছে। এ কথা ঠিক, ওঅর্ডস্ওঅর্থের কবিতায় মানব-প্রকৃতির যে ছবি পাই, তার উপর পার্বত্য প্রকৃতির মহিমাবোধ, গাম্ভীর্য ও নিঃসঙ্গতা পরিস্ফুট, তথাপি তা বিশ্বমানবপ্রকৃতির থেকে মূলত ভিন্ন নয়। ওঅর্ডসওঅর্থের প্রকৃতি-কবিতার অভিজ্ঞতা রোমান্টিক সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা, আঞ্চলিক অভিজ্ঞতা নয় এবং 'ওড টু ইমমর্টালিটি' বা 'প্রিল্যুড' বা 'টিনটার্ণ' অ্যাবি'র সৌন্দর্যচেতনা ও দর্শনচিন্তা কোনো বিশেষ ভূপ্রকৃতিতে সীমাবদ্ধ নয়। ওঅর্ডসওঅর্থের রোমান্টিক সৌন্দর্যভাবনার অংশীদার দুনিয়ার সকল কাব্যপাঠক। বরং বার্নেস (Barnes) নামক অল্পখ্যাত কবিকে আঞ্চলিক কবি বলা যায়, কারণ একান্তভাবে ডর্সেটশায়ার অঞ্চলের মানুষের জীবন-চিত্রণে ও আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগেই তাঁর সামর্থ্য নিয়োজিত।

রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যের পটভূমিতে গাজিপুর, সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি কাব্যের পটভূমিতে পদ্মালালিত ভূখণ্ড বর্তমান, কিন্তু মানসী-সোনার-তরী চিত্রার কবিতা আঞ্চলিক কবিতা নয়। কারণ এইসব কাব্যে রবীন্দ্রনাথের যে প্রকৃতিচেতনা তা মূলত রোমান্টিক সৌন্দর্যভাবনা-প্রসূত। তা সর্ব-জনীন রোমান্টিকতা থেকে স্বতন্ত্র নয়। পদ্মাতীরবর্তী লোক ও লোকালয়ের চিত্র অংকনই সোনার তরী-চিত্রার কবির উদ্দেশ্য নয়, তাঁর লক্ষ্য বিশ্বসৌন্দর্যের

পটভূমি। স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের সীমাকে অতিক্রম করে গেছে সোনারতরী-চিত্রার সার্বভৌম ব্যঞ্জনা। অপর পক্ষে আব্বাসউদ্দীনের পল্লীগীতিকে বলতে পারি আঞ্চলিক গান ও কবিতা, কারণ তার আবেদন বিশেষ ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ।

বরং গল্পগুচ্ছের প্রথম খণ্ডের গল্পগুলিতে আঞ্চলিকতার স্বাদ কিছুটা মেলে। পদ্মালালিত বঙ্গদেশের বিচিত্র শ্যামল সজল উদাসবিধুর প্রকৃতি এখানে বহিরঙ্গ মাত্র নয়, অন্তরঙ্গ চরিত্ররূপে গল্পে উপস্থিত। এইসব গল্পের কিশোর-কিশোরী নায়ক-নায়িকাদের ঐ পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না, দেখা সম্ভব নয়। ছিন্নপত্রাবলীতে এইসব গল্পের যে জন্মবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ তাতে তার প্রমাণ পাই। 'পোস্টমাস্টার'এর রতন, 'ছুটি'র ফটিক, 'সমাপ্তি'র মৃন্ময়ী, 'অতিথি'র তারাপদ, 'শুভা'র শুভাকে ঐ পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারি না। সেখানে গল্পের পাত্রপাত্রীর হাসিকান্নার সঙ্গে প্রকৃতির আনন্দবিষাদে কোলাকুলি। পদ্মার অসংখ্য উপনদী শাখা-নদীর তরঙ্গের উপরে রৌদ্রালোকের জ্যোৎস্নালোকের আলো-ছায়ার মায়া খেলা করে। নিঃসীম নীল আকাশের নীলকান্তমণি পেয়ালা-উপচে-পড়া আলোকধারায় কেবল পৃথিবী নয়, নরনারীও অভিষিক্ত হয়। সবটা মিলিয়ে একটা পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের জগৎ। তাই আঞ্চলিকতার সংকীর্ণ সীমায় এইসব গল্পকে বেঁধে রাখি না।

তিন

সন্দেহ নেই বাংলা গল্প-উপন্যাসে এই শতাব্দে আঞ্চলিকতার প্রবর্তক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। কয়লাকুঠির জীবনযাত্রার বর্ণনায় বাংলা আঞ্চলিক গল্প-উপন্যাসের সূচনা হল। কয়লাকুঠির সাঁওতাল-কোল-মুণ্ডা কুলিকামিনদের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, ধ্যান-ধারণা, সংস্কার-বিশ্বাসকে শৈলজানন্দ জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ করে তোলেন। দুঃখের বিষয়, শৈলজানন্দ সাঁওতাল-কোল-মুণ্ডাকে নিয়ে সার্থক গল্প লিখেছেন (যেমন, ১৯২৮-এ রচিত 'নারীমেধ' নামক গল্প-ত্রয়), কিন্তু সার্থক উপন্যাস লিখতে পারেন নি। 'কয়লাকুঠির দেশ' উপন্যাস, কিন্তু আঞ্চলিক উপন্যাস নয়।

কারণ প্রকৃতি সেখানে কাহিনীর পটভূমি মাত্র, কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত চরিত্র নয়, প্রকৃতি সেখানে পাত্রপাত্রীর উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। এ উপন্যাসের রঞ্জন ও মালার জীবনের সমস্যা (বিবাহ সমস্যা) যে কোনো দেশে কালে ঘটতে পারে।

এই ত্রুটি কাটিয়ে উঠেছেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। এযাবৎ বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের তিনিই শ্রেষ্ঠ শিল্পী। কারণ তাঁর উপন্যাসে মানবচরিত্র ও প্রকৃতির অঙ্গাঙ্গী যোগ ঘটেছে। ভৌগলিক সত্তা এখানে পটভূমি নয়, স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে দেখা দিয়েছে। তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭)। এই উপন্যাসের প্রকৃতি কাহিনীর দিগন্তকে ঘিরে আছে, সেই সঙ্গে তা কাহিনীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। এখানে পটভূমির অতিব্যাপ্তি নেই, নূতনত্বের উত্তেজনা সঞ্চারের চাতুরি নেই, স্বল্প অভিজ্ঞতার চমক নেই। কোপাই দহের বেড় দিয়ে ঘেরা কাহারদের গ্রামের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ নিবিড় ও অন্তরঙ্গ। প্রকৃতির পরিবেশে বদ্ধমূল অ-প্রাকৃত সংস্কার, যুগ যুগ প্রচলিত কিংবদন্তী ও লোককল্পনা উপন্যাসটিকে এক অনন্য মর্যাদা দিয়েছে। শিমুল, বেলবন, শ্যাওড়া বন, চন্দ্রবোড়া সাপ—সবকিছুতেই দেবত্বের আরোপ করা হয়েছে। অন্ত্যজ নরগোষ্ঠীর লৌকিক ও অ-প্রাকৃত সংস্কার ও বিশ্বাস এই গোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। বীরভূমের উদাসীন প্রকৃতিই এখানে প্রতীক রূপ পেয়েছে 'কর্তাবাবা' ও 'কালারুদ্দুরে'র চরিত্রে। একে কাহারদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। কাহারদের সমাজব্যবস্থাও এই প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। গোষ্ঠীপতির নেতৃত্বের দায়িত্ব, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের কঠোর নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃত যৌনাকাঙ্ক্ষা ও প্রবল হৃদয়াবেগের অনিবার্য লীলা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্তঃসঙ্গতি-নিবিড় আঞ্চলিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্র রচনা করেছে। এই সমাজে যূথপতি বনোয়ারীলালের কথাই শেষ কথা। এখানে পাখী ও করালীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ন্ত্রিত। 'বাবা কালারুদ্দুর' এই গোষ্ঠীর নিয়ন্তা—তিনিই এই সমাজকে চালনা করেন। তাঁর ক্রোধে বিনষ্টি ; কৃপায় জীবন রক্ষা। কোপাইয়ের দহ, বাঁধ, বেলগাছ, বাঁশঝাড়, শিমুল ও শ্যাওড়া বন, অতীতের বন্যা, বর্তমানের যুদ্ধ—সবকিছুই কাহার-গোষ্ঠীর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। তারাশংকর এই সবের মধ্যদিয়ে আদিম জীবনের বোধ উপস্থিত করেছেন, অপরপক্ষে নূতনকালের অনিবার্য পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়ে বাস্তববোধ ও সামগ্রিক জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছেন। সবটা মিলিয়ে এক

অখণ্ড বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে যা আঞ্চলিক উপন্যাসের যথার্থ পটভূমি।

অপরপক্ষে 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' (১৯৫১) রোমান্টিক আখ্যানরূপে উপস্থিত। আঞ্চলিক উপন্যাসের অনিবার্য উপাদান এখানে ততটা নেই যতটা আছে বাস্তব অভিজ্ঞতা-বর্জিত কল্পনার দূরাভিসার। শবলার কাহিনীতে রোমান্টিক কল্পনার উৎসার ঘটেছে, বাস্তব অভিজ্ঞতার বাহিরে তার অবস্থিতি।

আঞ্চলিক উপন্যাসের সার্থক উদাহরণ সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ময়ূরাক্ষী' গোষ্ঠীভুক্ত তিনটি উপন্যাস: 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী' ও 'সোমলতা' (১৯৩৮)। রাঢ়-বাংলার গ্রামজীবনের পটভূমিতে বিধৃত বৈষ্ণব সমাজের কাহিনী এই উপন্যাসত্রয়ী। বৈষ্ণব সমাজের স্বাধীন স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত নরনারীর জীবনকাহিনী এখানে চিত্রিত হয়েছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজের নৈতিক শাসন থেকে মুক্তি, সাংসারিক আসক্তি থেকে মুক্তি, পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্তি, নরনারীর নিঃসঙ্কোচ মেলামেশা, আড়ম্বর ও কঠোর বিধিনিষেধ-হীন ধর্মসাধনা বৈরাগী বৈষ্ণবসমাজকে এক বিশিষ্টতা দিয়েছে। বীরভূম-মুর্শিদাবাদের ময়ূরাক্ষী-লালিত ভূখণ্ডের প্রকৃতির সঙ্গে উপন্যাসত্রয়ীর পাত্র-পাত্রীর জীবনের সংযোগ নিবিড় ও আন্তরিক। কৃষিনির্ভর গ্রামজীবন, ব্রতপার্বণ উৎসব-মুখরিত জীবনযাত্রা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ভক্তি-বিশ্বাসের শান্ত প্রবাহ উপন্যাসত্রয়ীর কাঠামোকে ধরে রেখেছে। আঞ্চলিক উপন্যাসের সারল্য ও ঋজুতা, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে অন্তরঙ্গতা, ভূমিনির্ভর জীবনের শান্তি ও ধর্মনিষ্ঠা বৈরাগী বৈষ্ণব চরিত্রগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে। বিনোদিনী ও হারানের জীবনে এইসব বৈশিষ্ট্য রূপ লাভ করেছে। বিনোদিনীর স্বামি-গৃহত্যাগ, পরবর্তী বিপর্যয় ও পরিশেষে স্বামিগৃহে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে লেখক নায়িকাকে প্রকৃতির সুরে বেঁধেছেন। বিনোদিনীর যথার্থ পটভূমি যে গ্রামপ্রকৃতি, তা থেকে বিচ্যুতিই তার জীবনের বিপর্যয় এবং সেখানে পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় তার জীবনে সত্যমূল্যের প্রতিষ্ঠা: এই সত্যটি লেখক নিপুণভাবে উপস্থিত করেছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯) উপন্যাসে প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের সম্পর্ক অন্তরঙ্গভাবে চিত্রিত হলেও একে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যাবে না। প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ পরিচয় সাধনের মধ্য দিয়ে একটি কল্পনাপ্রবণ শিশুমন কীভাবে বিকাশ লাভ করল, তার অত্যাশ্চর্য কাহিনী এখানে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর অন্তরালে যে রোমান্টিকতা, যে

সৌন্দর্যবোধ, যে সরল সততা রয়েছে, তা আঞ্চলিক উপন্যাসে সুলভ নয়। এই উপন্যাসের প্রকৃতি বিশেষ অর্থে আঞ্চলিক প্রকৃতি নয়। ওঅর্ডস্ওঅর্থের 'প্রিলিউড' বা 'টিনটার্ন অ্যাবি', রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' 'চিত্রা' যে-কারণে আঞ্চলিক কবিতা নয়, সে-অর্থে-ই 'পথের পাঁচালী' আঞ্চলিক উপন্যাস নয়। লৌকিক জীবনের স্থূল লাভ-ক্ষতির উর্ধ্বে এক অনন্ত অফুরান জীবনপথের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে 'পথের পাঁচালী' ও তার পরিপূরক 'অপরাজিত' উপন্যাসে (১৯৩২)।

বরং 'আরণ্যক' উপন্যাসে (১৯৩৯) বিভূতিভূষণ আঞ্চলিক উপন্যাসের সীমাবন্ধনে অনেকটা ধরা দিয়েছেন। এটি পুরোপুরি আঞ্চলিক উপন্যাস নয় এই কারণে যে, এখানে প্রকৃতি মুখ্য, মানুষ গৌণ। আঞ্চলিক উপন্যাসে ভূ-প্রকৃতি মানুষের উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করে, মানবে প্রকৃতিতে এক অখণ্ড সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একথা ঠিক, আঞ্চলিক উপন্যাসে প্রকৃতি একটি স্বতন্ত্র সত্তা, বিশিষ্ট চরিত্র। 'আরণ্যকে'র প্রকৃতি স্বতন্ত্র সত্তা, কিন্তু প্রকৃতিই প্রথম ও শেষ কথা। এখানে প্রকৃতি প্রত্যক্ষ, জীবন্ত, চেতনাশক্তিসম্পন্ন। এখানে প্রকৃতি তার মহান ভয়াল ও সুন্দর গাম্ভীর্য নিয়ে উপস্থিত। এখানে প্রকৃতি-ই সবকিছু। এই বিশাল প্রকৃতির পটভূমিতে মানুষের সঙ্কুচিত দ্বিধাজড়িত উপস্থিতি। আরণ্য প্রকৃতির সুগম্ভীর মহিমার কাছে মানুষ এখানে নিষ্প্রভ, গৌণ।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর ত্রয়ী উপন্যাস 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' (জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার, চলন বিল ও অশ্বত্থের অভিশাপ : ১৯৩৫-১৯৪৮) এবং 'পদ্মা' (১৯৩৫), 'কোপবতী' (১৯৪৬) উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের উপাদান পাওয়া যায়। এই পাঁচটি উপন্যাসে প্রকৃতি খুব সজীব, কিন্তু মানবচরিত্রগুলি তার তুলনায় নিষ্প্রভ। মনে হয় প্রকৃতির রহস্যময়তা, সাংকেতিকতা, মহান্ গাম্ভীর্য যেভাবে লেখককে অভিভূত করেছে, মানুষ সেভাবে তাঁকে অভিভূত করে নি। প্রকৃতির তুলনায় এইসব মানুষ স্বভাব-দরিদ্র। "পদ্মা-তে বিনয়ের মনে তিনি যে পদ্মার নৈশ অন্ধকারব্যাপ্ত, নক্ষত্রদীপ্তি-ঝলসিত নির্জনতার অপরিমেয় রহস্যবোধ বা কোপবতী-তে বিমলের মধ্যে প্রকৃতির সহিত যে নিগূঢ়তর একাত্মতামূলক অন্তর্দৃষ্টির আরোপ করিয়াছেন, তাহাদের এই মহিমান্বিত দার্শনিক অনুভূতি ধারণা করিবার কোনো যোগ্যতাই নাই।" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা, ৩য় সং ১৯৫৬,

পৃ ৫০৮)। আসল কথা 'পদ্মা' ও 'কোপবতী'তে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একাত্মতাবোধ স্থাপিত হয় নি।

ত্রয়ী-উপন্যাসে নদীমাতৃক উত্তরবঙ্গের নদী সমূহের ভৌগোলিক পরিচয় ও কবিত্বমণ্ডিত সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিসমন্বিত পরিচয় এক সূত্রে বিধৃত। "উপন্যাস-ত্রয়ীর মর্মবাণী মানবিক জীবন বর্ণনায় নয়, তার মহাকাব্যোচিত বিবরণ ও প্রকৃতি পরিবেষ্টনীর রচনার মধ্যে নিহিত। পরিবেশ মহিমা এখানে মানব মহত্ত্বকে খর্ব করেছে।" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা, ১৯৬৫, জোড়াদীঘির উদয়াস্ত)।

প্রকৃতির বিশালতা, দুর্জয়তা ও খেয়ালি পরিবর্তনশীলতা উদয়নারায়ণের চরিত্রেই কিছুটা সংক্রামিত, অন্যান্য মানবচরিত্রে তা নেই।

প্রমথনাথের কৃতিত্ব মানবমনের উপর সর্বাত্মক প্রভাববিস্তারী প্রকৃতি-চিত্রণে, যা আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্যতম শর্ত। হার্ডির কলমে এগডন হীথের রুক্ষ ভয়াল প্রান্তর বা এমিলি ব্রন্টির কলমে উদারিং হাইট্সের রহস্যময় আতংককর জলাভূমি যেমন সজীব হয়ে উঠে মানবমনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে ত্রয়ী উপন্যাসে প্রমথনাথের কলমে তেমনি চলনবিল জীবন্ত ভয়াল রহস্যময় চরিত্র হয়ে উঠেছে। 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসের সূচনায়, তৃতীয় অধ্যায়ে, চলনবিলের ছবিটি জীবন্ত। রাজসাহী ও পাবনা জেলার মধ্যে অতি বিস্তৃত এই বিলের অশুভ হিংস্র চরিত্রের সঙ্গে বিলের মানুষের চরিত্রে হিংস্রতার মিল দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক। এই বর্ণনা প্রকৃতিবর্ণনার অসাধারণ দৃষ্টান্ত। চলনবিলের অশুভ ইঙ্গিতপূর্ণ রহস্যময় গতি ও স্থিতির, জল ও স্থলের পরস্পরবিরোধী ভাবের অস্বাভাবিক সন্ধির অস্থির ভারসাম্যে সদা ঘূর্ণিত, মানবপ্রত্যাশার প্রতি চিরবঞ্চনাময় ক্রূর সত্তার পরিচয়টি প্রমথনাথের নিপুণ লেখনীমুখে উদ্‌ঘাটিত :

"প্রকৃতির অরাজকতা বিল। না খাটে এখানে ডাঙার নিয়ম, না খাটে জলের, ইহা প্রকৃতির প্রত্যন্তপ্রদেশ। এখানে বিনা মেঘে ঝড় ওঠে, বিনা ঝড়ে নৌকা ডোবে। দিনের বেলা অন্ধকার হইতে বাধা নাই, আবার রাত্রিকালে শত শত আলোর শিখায় উজ্জ্বল। মাটি ও জল দুইই বিশ্বাস-ঘাতক, পরস্পরকে তারা বিশ্বাস করে না, অন্যেরও বিশ্বাস ভঙ্গ করে। শক্ত মাটি আপাদমস্তক গ্রাস করে, ঘোলা জলে থই পাওয়া যায় না, স্রোতহীন জলের মোড় ফিরিতেই তীব্র স্রোতের টান ; এক রাত্রির মধ্যে

কোথা হইতে প্রলয়ের বন্যা আসিয়া পাকা ফসল নাশ করিয়া চলিয়া যায়। কালো জল, ঘোলা জল, সাদা জল ; দৃঢ় মাটি, নরম মাটি, কাদামাটি। জল এখানে বোবা, মাটি এখানে অন্ধ। একজন শুনিতে পায় না, একজন দেখিতে পায় না। দুই জনই ভীষণ।

প্রকৃতির এই অরাজকতা মানুষের আদিম বর্বরতাকে টানিয়া বাহির করে। বিলের মানুষকে বিশ্বাস করিও না। যারা বিলে যাতায়াত করে, তারাও ক্রমে ভীষণ হইয়া ওঠে। প্রকৃতি ও মানুষ এখানে সহ-কর্মী। নিরীহ যাত্রীকে মানুষের বর্বরতা তাড়া করিয়া মারে, প্রকৃতির বর্বরতা তাকে পলায়নের পথে বাধা দেয়। মানুষ সুযোগ খোঁজে, প্রকৃতি রাত্রি আনিয়া দেয়। তাড়া করিবার জন্য মানুষ পাল তুলিয়া দেয়। প্রকৃতি তাহা ফুৎকারে ফুলাইয়া তোলে। মানুষ নৌকা লইয়া বসে, প্রকৃতি জলের স্রোত সঞ্চার করে। মানুষ খুন করে, প্রকৃতি অগাধ জলে সে মৃতদেহ লুকাইয়া রাখিয়া দেয়। মানুষ ও প্রকৃতি জগাই ও মাধাইএর মত এখানে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া বাস করিতেছে।"

এই বর্ণনায় প্রকৃতি ও মানুষের একাত্মবোধ যেভাবে চিত্রিত, প্রকৃতি যেভাবে জীবন্ত চরিত্ররূপে উপস্থিত, তা ত্রয়ী-উপন্যাসে সর্বত্র উপস্থিত নয়। এখানে বৃহত্তর প্রকৃতি-পরিবেশ জীবনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। কিন্তু ত্রয়ী উপন্যাসে তার রূপায়ণ লেখকের অন্বিষ্ট নয়। এখানে যদিও মানবপ্রকৃতি ও নিসর্গের মিলনে জীবননাট্য সৃষ্ট হয়েছে, তথাপি ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য ব্যাপকার্থে বঙ্গসমাজের দু শ বছরের জীবন। লেখক তা স্বীকার করেছেন, "উপন্যাসত্রয় মুখ্যত উত্তরবঙ্গের পুরোভূমিতে রচিত হলেও সমস্ত পূর্ববঙ্গ এর পটভূমি। প্রায় দু শ বছরের পরিবেশে রচিত এই কাহিনীতে পলাশীর যুদ্ধ থেকে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত দুস্তর কালকে স্পর্শ করবার চেষ্টা হয়েছে। কোম্পানির শাসনে যে জমিদারগণের উদয়—দেশ-ভাগাভাগিতে তাদেরই অস্ত।... ১৯৩৫ সালে যখন জোড়দীঘির চৌধুরী পরিবার লিখেছিলাম তখন জানতাম না এর কী পরিণাম হবে, এখন দেখছি নিয়তির অদৃশ্য ইঙ্গিতে সমস্ত দেশের গতি এবং সামান্য কাহিনীর গতি একই পথে চালিত হয়েছে।" (ত্রয়ী-উপন্যাসের লেখক-কৃত ভূমিকা, ১৯৬৬)।

আঞ্চলিক উপন্যাসের উপাদান থাকা সত্ত্বেও এই দৃষ্টিবশত 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' (ত্রিলেখ) বাংলাদেশ ও সমাজের আধুনিককালের মহৎ জীবনালেখ্য

হয়ে উঠেছে।

তবু প্রমথনাথের হাতে প্রকৃতি প্রাণময়ী হয়ে উঠে মানবজীবনের সঙ্গে দুয়েকটি ক্ষেত্রে অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে বিধৃত হয়েছে। 'চলন বিল' উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে চলন বিলের উন্মত্ত জলোচ্ছ্বাস মানুষের সযত্নরচিত বাঁধকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। প্রকৃতির অন্ধ দুর্বার নিয়তিপ্রতিম শক্তির কাছে মানুষের প্রতিরোধপ্রয়াস ভেঙে পড়েছে। মানুষ হেরে গেছে। কিন্তু এই পরাজয়ের মধ্যেও মানুষ তার নিজস্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত: দুর্দম বন্যাপ্রবাহের আঘাতে বিধ্বস্তপ্রায় বাঁধের উপর দণ্ডায়মান দর্পনারায়ণ-চরিত্রটি নিঃসঙ্গ ট্রাজিক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। বোধ করি, ঐ পটভূমি দর্পনারায়ণের জীবনাবসানের যোগ্য পটভূমি। আর, 'কোপবতী' উপন্যাসের একটি দৃশ্য অবিস্মরণীয়: ঝড় ও নদীর পটভূমিতে—অস্থির প্রকৃতিপটে-দৈবদুর্বিপাকের সঙ্গে মিশেছে জৈব ঘটনা—দুটি নরনারীর প্রাকৃতিক অনিবার্যতায় মিলন।

চার

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' আঞ্চলিক উপন্যাস রূপে আমাদের মনোযোগ দাবি করে। এটিকে পুরোপুরি আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যাবে কিনা তা বিচার্য, কারণ এখানে গোষ্ঠীজীবন নয়, ব্যক্তিজীবন প্রাধান্য লাভ করেছে। পদ্মাতীরবর্তী ধীবর-সম্প্রদায়ের যৌথ চেতনা নয়, কুবের মাঝির ব্যক্তিসত্তার আলেখ্য রূপেই একে দেখতে হয়। আঞ্চলিক উপন্যাস মূলত গোষ্ঠীকেন্দ্রিক উপন্যাস, 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) ব্যক্তি-কেন্দ্রিক উপন্যাস। তবু আঞ্চলিক উপন্যাসের শর্ত কিছুটা পালিত হয়েছে। এ উপন্যাসে প্রকৃতি একটি স্বতন্ত্র সত্তা রূপে দেখা দিয়েছে, ভূ-প্রকৃতি মানব-মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, ভৌগোলিক সীমা-সংহতি রক্ষিত হয়েছে। যে ধীবর-গোষ্ঠীর জীবন এখানে চিত্রিত, তা একান্তভাবে বাস্তবনির্ভর। কোনো উচ্চ আদর্শ, বাস্তববর্জিত সৌন্দর্যবোধ, রোমান্টিক দৃষ্টি ধীবর-পল্লীর উপর রঙীন আলো ফেলে নি। পদ্মাতীরবর্তী জেলেদের মান-অভিমান ঈর্ষা চক্রান্ত-দ্বন্দ্ব-দলাদলি-প্রীতি-ভ্রাতৃত্ব সবকিছুই এখানে নিখুঁতভাবে রূপায়িত। এক সংকীর্ণ বৃত্তপথে জেলেদের জীবন আবর্তিত। এই উপন্যাসে

সুদূরের ইশারা এনেছে রহস্যময় চরিত্র হোসেন মিয়া ও তার দূরবর্তী দ্বীপ। ঐ অপরিচিত দ্বীপে বসতি স্থাপনের দুঃসাধ্য প্রয়াসে রত হোসেন মিয়া পদ্মাতীরবর্তী জেলেদের জীবনের দিগন্তকে প্রসারিত করে দিয়ে উপন্যাসের আঞ্চলিক সীমা-সংহতিকে শিথিল করে দিয়েছে। জেলে-মাঝিরা যেখানে পদ্মার কাছে, প্রকৃতির কাছে হার মেনেছে, হোসেন মিয়া সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই দিয়েছে। এই ইঙ্গিতটি একেবারে অগ্রাহ্যের নয়। তবে ভৌগোলিক সত্তার বিশিষ্ট প্রকাশ ও আঞ্চলিক উপভাষার সংযত ব্যবহারে লেখক একটি বিশ্বাসযোগ্য বাতাবরণ গড়ে তুলতে পেরেছেন এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' আঞ্চলিক উপন্যাস রূপে আলোচনার যোগ্য। তিতাস নদীতীরবর্তী মালোপাড়ার জীবনের ছবিটি লেখক বিশ্বাস্যভাবে চিত্রিত করেছেন। তিতাসের মন্থর স্রোতের সমান্তরাল মালোদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-সুখ-দুঃখের স্রোত মন্থর গতিতে বহে চলেছে। তিতাস নদী তার প্রতি উদাসীন। প্রকৃতির এই নির্মম উদাসীনতা এখানে নিপুণভাবে চিত্রিত। মালোদের জীবনের গতি তিতাসের মতোই মন্থর, তরঙ্গ-বিভঙ্গ তিতাসের মতোই মৃদু। তিতাসের যোগ অসীম নীলাকাশের সঙ্গে। মালোদের জীবন তিতাসের পটভূমিতে চিত্রিত। এখানেই এসেছে ভৌগোলিক সীমা-সংহতি ও মানবজীবনের উপর প্রকৃতির প্রভাব। এখানে কাহিনী কোনো এক বিশেষ ব্যক্তির নয়, সমগ্র মালো-গোষ্ঠীর। জীবনবোধের বিস্তার এখানে ঘটেছে।

নদীকে নিয়ে গড়ে উঠেছে যে তৃতীয় আঞ্চলিক উপন্যাস, তার নাম 'গঙ্গা', লেখক সমরেশ বসু। 'পদ্মানদীর মাঝি' ও 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে মানুষের জীবন নদীসূত্রে অদৃষ্টের সঙ্গে গ্রথিত। আর 'গঙ্গা'য় মূল চেতনা নদীর প্রতিকূলতার সঙ্গে জড়িত মৃত্যুবোধ। গঙ্গার খরস্রোতের সঙ্গে মৃত্যুস্রোত ছুটে চলছে উপন্যাসের কাহিনীসূত্রে। উপন্যাসের নায়ক বিলাস এই মৃত্যুপটভূমিতে আশ্চর্যরূপে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কুবেরের জীবনে সমুদ্রের ডাক অপরিচিত, জীবন-রহস্যের কাছে তার ভীত আত্মসমর্পণ, কিন্তু বিলাসের জীবনে সমুদ্রের আহ্বান মৃত্যুগ্রথিত জীবনের আহ্বান। এই উপন্যাসে মৃত্যু হানা দিয়েছে বার বার। গানের ধুয়ার মতো মরণের কথা বার বার বেজেছে।

"তুমি মাছমারা। মাছ তোমাকে সাক্ষাৎ মারে না। কিন্তু মাছেরই ঝাঁকে, তারই চলাচলের পথে, গহীন আশ্রয়ে ওত পেতে থাকে তোমার মরণ। যতক্ষণ বাঁচিয়ে রাখবার, সে বাঁচিয়ে রাখবে তোমাকে। লীলা শেষ হলেই সে আসবে অন্য মূর্তি ধরে।

"সে যে শুধু সমুদ্রে তা নয়। খালে বিলে, এমন কি গঙ্গায়ও আসে সে নানান বেশ ধরে—যেমন এল এবার ডাকাতের বেশ ধরে। কিন্তু এ শুধু তোমাকে ভয় দেখানো, শেকানো। তোমাকে হুঁশিয়ার করা। জলে ডাঙায় সমান নজরে হুঁশিয়ার থাকতে বলছে তোমাকে। ভাগ্য নিয়ে খেলা। একটু ভুল করবে, আর ফিরতে পারবে না প্রাণ নিয়ে। এইটা সংসারের নিয়ম। মানুষের সংসারের বাইরে তোমার বাঁচার জায়গা যেখানে জীবনকে আড়াল করে মরণ সব সময় হাত বাড়িয়ে আছে। ঐ হাতের পাশ কাটিয়ে ফিরতে হবে, যতক্ষণ বুকের ধুকুধুকি চলবে।"

জীবনের সংগ্রামী মূর্তি, চলিষ্ণু রূপ, প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে গ্রথিত মানুষ, মৃত্যুর সঙ্গে অদৃশ্য যোগসূত্রে গ্রথিত জীবন—'গঙ্গা' উপন্যাস পড়তে পড়তে এই সব ভাবনা মনের মধ্যে আকার পায়। বিলাস-চরিত্রের সংগ্রামী চেতনায়, পাঁচুর মৃত্যু বর্ণনায়, দক্ষিণা বাতাসের টানের বর্ণনায় রূপের স্পষ্টতা ও প্রত্যক্ষতায় 'গঙ্গা' এক বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

পাঁচ

আঞ্চলিক উপন্যাসে ভিন্নতর জীবনস্বাদের নিদর্শন সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' (১৯৫৮)। মানভূমের আদিম মানবগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, লৌকিক সংস্কার-বিশ্বাস, তাদের মানসিকতার পরিপূর্ণ আলেখ্য 'শতকিয়া'। মানভূমের কৃষিনির্ভর জীবনে ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে পরিবর্তনের স্রোত এসে পড়ছে। সেই স্রোতের মুখে নায়ক দাশু ঘরামি কিছুতেই তার প্রাচীন জীবনদর্শন রক্ষা করতে পারছে না, যেমন পারে নি 'শুরবীর' বনোয়ারী কাহার পরিবর্তনের মুখে। পাখি-করালীর কাছে বনোয়ারি যেমন হেরে গেছে, পলুশ-মুরলীর কাছে দাশু তেমনি হেরে গেছে। তবু সকল হারের মধ্যে দাশু ঘরামি তার পুরোনো জীবনবোধ আঁকড়ে ধরে আছে।

আঞ্চলিক জীবনযাত্রা ও বিশ্বাসের প্রতিনিধি দাশু ঘরামি। মানভূমের ভূ-প্রকৃতি ও ধ্যানধারণা এখানে অবয়ব পেয়েছে। পুরনো রীতিনীতি, আমোদ-উৎসব এখনো দাশুকে আকর্ষণ করে। মধুকুপির প্রকৃতির সঙ্গে দাশুর অন্তরঙ্গ প্রাণময় সংযোগ। দাশুর প্রতিটি রক্তকণায় মানভূমের প্রকৃতির প্রাণলীলা সঞ্চারিত। মূক প্রকৃতি এখানে কথা কয়ে উঠেছে, দাশুর কণ্ঠে যেন প্রকৃতির গান বেজে উঠেছে। সেই আদিম প্রাচীন প্রকৃতির সমস্ত অর্ধচেতন সংকেত দাশুর মানবিক চেতনায় অখণ্ড তাৎপর্যে সূত্রবদ্ধ হয়েছে; কপালবাবার জঙ্গল, ছোট কালু ও বড় কালু পাহাড়, ডরাচী নদী, বাঘিনী কানারানী, মধুকুপির আকাশ বাতাস—সবকিছু দাশুর জীবনে পরম অর্থবহ হয়ে উঠেছে।

তবু দাশু ঘরামির স্বপ্ন নির্মমভাবে ভেঙে গেছে। ভেঙে দিয়েছে তার স্ত্রী মুরলী, তার পারিপার্শ্বিক জীবনযাত্রা, পরিবর্তিত সময়স্রোত। মুরলী তাকে ছেড়ে খ্রীষ্টধর্মান্তরিত পলুশ হালদারকে বিবাহ করেছে, আবার পলুশকে ছেড়ে খ্রীষ্টান হয়ে জোহানা নাম নিয়েছে, খ্রীষ্টান ডাক্তার রিচার্ড সরকারকে বিবাহ করেছে, দাশুকে মৃত্যুর পথ দেখিয়েছে। অপরদিকে ঘরামির কাজ ও চাষবাসের কাজে দাশু ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করতে পারে নি। কারখানা ও খ্রীষ্টধর্ম দাশুর স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রা ও অনার্য লোক-ধর্মের প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস খণ্ডিত ও পরাস্ত হয়েছে কারখানার মালিক ও খ্রীষ্টান পাদ্রীদের কাছে। বিধর্মী পলুশের গুলিতে পরিচিত বাঘিনী কানারানীর নির্মম হত্যা যেন যন্ত্রসভ্যতার চাপে আরণ্যক জীবন-সংস্কারের বিলুপ্তি ঘোষণা। আদিম সংস্কৃতি ও জীবনবোধের সম্পূর্ণ ছবিটি 'শতকিয়া' উপন্যাসের পটভূমি। দাশু মানভূমের প্রকৃতিনির্ভর আদিম জীবনের প্রতিনিধি। হার্ডির উপন্যাসে প্রকৃতি যে অর্থে সত্য ও বিশিষ্ট, এখানে সে অর্থেই সত্য।

'শতকিয়া' উপন্যাসের বর্ণনায় মানভূমের উপভাষার প্রয়োগ নিখুঁত। এ সম্পর্কে নিম্নধৃত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য।

> "উপন্যাসের সংলাপ ও মন্তব্য-বিশ্লেষণে মানভূম অঞ্চলের আদিম গোষ্ঠীর বাগ্‌রীতির চমৎকার ও অব্যভিচারী প্রয়োগ হইয়াছে। এই ভাষা বাংলা ভাষারই একটি আঞ্চলিক প্রতিরূপ। ইহার ভাব-প্রকাশ করার ও ছবি ফুটাইয়া তোলার শক্তি অসাধারণ। ইহা এই আদিম গোষ্ঠীর সমগ্র জীবন-দর্শন, ইহার অলৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার, সহজ কবিত্বময় অনুভূতি

ও রসোচ্ছল জীবনবোধের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। ইহা চেতন মনের সীমা ছাড়াইয়া অবচেতন স্তরের অমূল ভাবস্পন্দনকে ধ্বনিত করিয়াছে। ইহাদের বাগ্‌রীতির ভিতর দিয়া মনের যে ছবি ফুটিয়াছে তাহা শুধু বুদ্ধিশাসিত সুশৃঙ্খল সরল-রেখাঙ্কিত বৃত্তি-সমাবেশ নহে। ইহার মধ্যে বস্তুজ্ঞান ও অদৃশ্য ভীতির, মৃত্তিকা ও বায়ুস্তরের, জানা ও অজানার, ব্যবহারিক ও ঐন্দ্রজালিক উপাদানের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। মানুষগুলার প্রত্যেকটি উক্তি ও কার্যে, তাহাদের পারস্পারিক সম্পর্কের মধ্যে এই মিশ্র অনুভূতির পরিচয় পরিস্ফুট। সমগ্র বইখানি এই আদিম, আরণ্যক গন্ধে ভরপূর।" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রধান দুটি লক্ষণ—প্রকৃতি একটি স্বতন্ত্র চরিত্র রূপে দেখা দেয় ও মানবমনের উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করে ; এবং ব্যক্তি-চেতনার সঙ্গে গোষ্ঠীচেতনার সামঞ্জস্যে ও জীবনস্বাদের অনন্য একমুখীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'শতকিয়া' উপন্যাসে এই দুটি লক্ষণই প্রবলভাবে উপস্থিত। শতকিয়ার রূপক-দ্যোতনা প্রায় সকল পাত্রপাত্রীরই স্বরূপ দ্যোতনা, তাদের প্রকৃতির নিগূঢ় পরিচয়। এই উপন্যাসের নরনারীর মধ্যে ব্যক্তিচেতনা ও বৃহত্তর পরিবেশমূলক গোষ্ঠীচেতনা এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, এদের সঙ্গে আরও একটি প্রতিনিধিত্বমূলক পরিচয় ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। দাশু ঘরামির বিড়ম্বিত পদক্ষেপে, স্তম্ভিত আত্মপ্রকাশের মধ্যে যেন ফেলে আসা আর-এক জগতের স্মৃতি সংস্কারপুষ্ট, ছিন্নমূল আত্মা অসহায় আত্মজিজ্ঞাসায় ও অন্ধ উদ্‌ভ্রান্তিতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আঞ্চলিক উপন্যাস যখন আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে এক সংকেতধর্মিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই তা সার্থক। 'শতকিয়া' সেই অর্থেই সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস।

আঞ্চলিক উপন্যাসের তিনটি প্রধান শর্তরূপে উল্লেখ করেছি তিনটি উপাদান—অঞ্চলটি সম্পর্কে লেখকের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা, সহানুভূতি ও নির্লিপ্তি। এইসব গুণ কেবল সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া'য় নয়, সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এও পরিস্ফুট। বিহারের গ্রামাঞ্চলকে, গ্রামীণ মানুষকে, তাদের মানসিকতা ও সংস্কারকে লেখক নিপুণভাবে উপস্থিত করেছেন। এই গ্রাম-জীবন ও মানুষ সম্পর্কে লেখকের অভিজ্ঞতা নিশ্ছিদ্র, সহানুভূতি সীমাহীন ও নির্লিপ্তি শিল্প-নিয়ন্ত্রিত। তিনটি পর্বে প্রকাশিত এই বৃহৎ উপন্যাসে লেখক আমাদের কাছে এক অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতালোক উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

বিহারের শিক্ষার আলোকবর্জিত, অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামের ভীরু চাষী, ক্ষেতমজুর ও মহাজন-সম্প্রদায়ের কাছে গান্‌হি বাবা (গান্ধী বাবা) নামটি কীভাবে পরিচিত হয়ে উঠল, বিয়াল্লিশের অগস্ট আন্দোলন কীভাবে ভীরু মানুষগুলিকে বদ্‌লে দিল, তার কৌতূহলোদ্দীপক জীবনচিত্র এ উপন্যাসে আছে। কিন্তু এ উপন্যাসের মূল্য এখানে নয়, আরো গভীরে—গ্রামীণ কিশোর ঢোঁড়াইয়ের চরিত্রের আশ্চর্য বিকাশে।

তাৎমাটুলির প্রাকৃত পরিবেশে বুনো লতার মতো বেড়ে উঠেছিল ঢোঁড়াই, তার ছিল না কেউ। অমূল তরু ঢোঁড়াই ভেসে বেড়াচ্ছিল, শেষে জুটল আশ্রয়। ধীরে ধীরে তার বৃদ্ধি ও বিকাশ, তার উৎপাটন, শেষে জীবনের নব তাৎপর্যের সন্ধানলাভ: এক আশ্চর্য জীবনকাহিনী সহৃদয়তার সঙ্গে চিত্রিত। বিহারের গ্রামাঞ্চল তার সমস্ত লৌকিক ও অলৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কার নিয়ে এ উপন্যাসে দেখা দিয়েছে। এ উপন্যাসের প্রতি ছত্রে ধুলোমাটির স্পর্শ পাওয়া যায়। আঞ্চলিক উপভাষার শব্দ ব্যবহারে এসেছে স্থানিক রঙ্। বৌকাবাওয়া, রেবণগুণী, বটহিয়ার গান প্রমুখ চরিত্র, চাষবাস হাটবাজার ও জমিদার মহাজনের অত্যাচারের নানা ঘটনা, ভীরু লোভী নির্বোধ অসহায় মানুষগুলির ভুল ভ্রান্তি দুর্বলতা ভীরুতার নানা ছবি—সবটা মিলিয়ে এক আশ্চর্য জগৎ আমাদের চোখের সামনে ধরা দেয়, যা ভৌগোলিক সীমা-সংহতিতে আবদ্ধ, যেখানে মানবমনের উপর প্রকৃতি ও অলৌকিক ধ্যান-ধারণার অখণ্ড প্রতাপ, যেখানে জীবনস্বাদের অনন্যতার মধ্য দিয়ে এক সার্বভৌম সত্যের ইশারা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশে' (১৯৪৪) উর্বর নদীমাতৃক চর ইসমাইলের কাহিনী ও 'লালমাটি'তে (১৯৫১) রুক্ষ অনুর্বর বন্ধ্যা জমির কাহিনী। দুই উপন্যাসেই বিশিষ্ট ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত মানুষের আশা-ব্যর্থতা-জয়-পরাজয়ের কাহিনী চিত্রিত। জীবন-প্রেমের অঙ্গীকার আছে দুই উপন্যাসেই। আবদুল জব্বারের 'ইলিশমারির চর' উল্লেখ্য প্রচেষ্টা।

॥ ছয় ॥

আলোচনার গোড়ার দিকে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছি যে, স্বল্প

অগভীর অভিজ্ঞতা নিয়ে অতিব্যাপ্ত পটভূমিতে নূতনত্বের মোহ ও উত্তেজনার চমক সৃষ্টি করে যে সব জীবনচিত্র আঞ্চলিক উপন্যাসের দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়, তাদের আঞ্চলিক উপন্যাস বলে স্বীকার করা যায় না। স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলা সাহিত্যে এই মনোবৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার স্বাদ ও বিজ্ঞানের দৃষ্টি লেখকের সামনে এমন এক সহজ প্রলোভন-ক্ষেত্র উপস্থিত করেছে যার থেকে অনেকেই আত্মসংবরণ করতে পারেন নি।

আঞ্চলিক উপন্যাস সম্পর্কে এই বক্তব্যের সমর্থন পাই নিম্নধৃত আলোচনায়।

> "এখানেও একই সতর্কবাণী উচ্চার্য : বিষয়বস্তু নিজে একাকী শিল্পসিদ্ধির নিয়ামক নয়। এ জাতীয় অধিকাংশ উপন্যাসেই দেখা গেছে অভিনব হবার প্রাণপণ প্রয়াসে অভিজ্ঞতার প্রদর্শনী সৃজনই যেন লেখকদের উদ্দেশ্য। আঞ্চলিকতা একটা আধার, সেই আধারে ধৃত জীবন-জাহ্নবীর জল লেখক আহরণ করবেন—এমনটাই বাঞ্ছনীয়। যদি দেখা যায় আধারটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সযত্নে অলংকৃত করতে গিয়ে হারিয়ে বসেছেন সব আধারটুকু—তবে তাকে বিড়ম্বিত প্রয়াস ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে যাকে বিস্ময়রস বলা হয় তার সাথে এ-জাতীয় রচনায় ঔপন্যাসিকেরা যে strangeness-কে মূলধন করে থাকেন তার কোনো সংযোগ নেই। অথচ পদ্মানদীর মাঝিদের কথায় মানিকবাবু আঞ্চলিক ভাষা, আঞ্চলিক জীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করেও জীবনের গভীর নদীপ্রতিম রহস্যকে কেমন উদ্ভাসিত করে তুললেন। আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করাই আঞ্চলিক কথাসাহিত্যের শেষ লক্ষ্য। সে-কথা চতুর্থ পঞ্চম-দশকের ঔপন্যাসিকেরা মাত্র মৌখিক সূত্রে জানেন। এই বোধের সম্যক ব্যবহার না ঘটায় মনোজ বসুর বিখ্যাত উপন্যাস 'জল-জঙ্গল', জল ও জঙ্গলের বিশ্বাস্য বাস্তবালেখ্য হিসাবে চমৎকার হয়েও উপন্যাসের মহিমায় বিশিষ্ট হতে পারে নি। শিল্পীর আন্তরিকতা তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে রসসিদ্ধির পথে নিয়ে যায়। কিন্তু সে আন্তরিকতা শিল্পীর সদিচ্ছামাত্র নয়। জীবন-রহস্যের গভীর উপলব্ধিতে ও জীবনার্থ সন্ধানের তীব্র প্রেরণায় এবং টানে সে আন্তরিকতার অনিবার্য বিস্তার। সে উপলব্ধি যেখানে নেই আন্তরিকতার বিকল্প হিসাবে সেখানে নানা পল্লবগ্রাহিতার ডাক পড়ে।"
>
> [শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', ১৩৬৮, পৃ. ৩৫৮]

পূর্বেই বলেছি, উপন্যাসের মৌল উপাদান জীবনবোধের বিস্তার ও জীবন বোধের বিস্তার। তার অভাবেই আঞ্চলিকতার ছবি থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো উপন্যাস আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে ব্যর্থ হয়ে যায়। উপরি-ধৃত মন্তব্যে তারই স্বীকৃতি। এই ব্যর্থতার আর-এক উদাহরণ নবীন শক্তিমান কথাশিল্পী প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্ব-পার্বতী'। আঞ্চলিক উপন্যাসে প্রকৃতি একটি বিশিষ্ট সত্তা, জীবন্ত চরিত্র। কিন্তু প্রকৃতি মানবচরিত্র ও ঘটনার পটভূমি মাত্র নয়। প্রকৃতি ও মানবচরিত্রের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্থাপিত না হলে সকল আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যায়, যেমন হয়েছে 'পূর্ব-পার্বতী'তে। একটি মহৎ সম্ভাবনাকে লেখক এখানে অসম্পূর্ণ রাখলেন। সত্যি, এ বড় আফশোস। নাগাভূমির পটভূমিতে স্থাপিত এই উপন্যাসে ইতিহাস-উপাদানের (রানী গাইডিলিও ও গান্ধীজীর আন্দোলন) আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত চরিত্রগুলি ভূগোলের গোলোকধাঁধায় ঘুরে মরেছে। এখানে চরিত্রগুলি প্রকৃতির ক্রীড়নক মাত্র, তাদের স্বাধীন স্ফূর্তি নেই, স্বভাবের বিকাশ নেই। বার বার একই বিশেষণ ব্যবহার করে স্থানিক রঙ, আঞ্চলিকতার স্বাদকে জিইয়ে রাখতে হয়েছে। যেমন, 'পাহাড়ী চড়াই', 'পাহাড়ী খাদ', 'পাহাড়ী মাটি', 'পাহাড়ী ঘাস', 'পাহাড়ী পিঁপড়ে'। ভৌগোলিক পটভূমি রচনায় কেবল নয়, যৌবন-বর্ণনায় একই বিশেষণের পুনরাবৃত্তি। যেমন, 'অনাবৃত পাহাড়ী মাধুর্য', 'পাহাড়ী কুমারীর যৌবন', 'শত্রুপক্ষের যৌবন', 'বন্য যৌবন' 'ক্ষ্যাপা যৌবন'। আঞ্চলিক শব্দ আঞ্চলিক নিসর্গ-বর্ণনা দ্বারা পরিবেশকে জিইয়ে রাখতে হয়েছে। যেমন, জাকুলি মাস, লগোয়া পল্লু, রেণজু আনিজা, আতামারী লতা, টঘু টু ঘোটাঙ ফুল, রোহি মধু। এইসব স্থানীয় রঙ সত্ত্বেও কাহিনীর গতিকে প্রবাহিত রাখা যাচ্ছিল না, ভূগোলের গোলোকধাঁধা থেকে কাহিনী উদ্ধার পাচ্ছিল না। ইতিহাস এসে কাহিনীকে রক্ষা করল। মানসিকতার সূত্রে, নৃতত্ত্বের সূত্রে, সংগীত ও নাচের তালে নাগা জাতিকে সাবয়ব করে তোলার যে অবকাশ ছিল তা লেখক ব্যবহার করলেন না, এই আফশোস যাবার নয়। আঞ্চলিকতার আধার থেকে 'পূর্ব-পার্বতী' মুক্তি পায় নি বলেই এখানে জীবনবোধের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ঘটে নি।

যে-সব মৌল উপাদানের অভাবে প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্ব-পার্বতী' ব্যর্থ, সে-সবের উপস্থিতিতে তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'কেয়াপাতার নৌকা' (১মখণ্ড) (১৯৭০) সার্থকতা লাভ করেছে। 'পূর্ব-পার্বতী'তে প্রকৃতি ও মানব চরিত্রের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী

সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি, হয়েছে 'কেয়াপাতার নৌকা'য়। এখানে লেখকের জীবনবোধ ও জীবনবোধের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ঘটেছে। 'কেয়াপাতার নৌকা' পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা অনুভব করা যায়। জন্মসূত্রে লব্ধ আত্মীয়তা ও প্রীতি-বন্ধন, ভৌগোলিক পরিবেশের ত্রুটিহীন আলেখ্য, স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে গভীর পরিচয়, স্থানিক রঙ ও উপভাষা ব্যবহারে অনায়াসনৈপুণ্য—সবই এখানে আছে, তার সঙ্গে আছে গভীর জীবনবোধ। লেখকের জবানীতে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত :

'আমার জন্ম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছুকাল আগে ; পূর্ব বাঙলায়। তার নিসর্গ, তার ধান-কাউনের ক্ষেত, তার পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী-ইলসা-বুড়ীগঙ্গা-শীতলক্ষা, তার রূপো-দিয়ে-গড়া অফুরন্ত মাছ, সারি-জারি-ভাটিয়ালি-রয়ানি, তার মহত্ত্ব, তার সরলতা, হৃদয়-ধর্ম, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতি-বন্ধন, তার মাধুর্য মিলিয়ে পূর্ববঙ্গ সেদিন এক স্বর্গ। সেই স্বর্গের ছবি আমার উপন্যাস 'কেয়াপাতার নৌকা'য় ধরে রাখতে চেষ্টা করেছি।' [অমৃত, ২৯ মে, ১৯৭০ সংখ্যা]

প্রধানত 'হেমকত্তা' এই বিশিষ্ট অনুভবের প্রতীক। তাঁকে ঘিরেই আঞ্চলিক উপন্যাসের জীবনস্রোত প্রবাহিত।

আরেকটি উপান্যসের উল্লেখ না করে পারি না—শ্রীপ্রভাত দেব সরকারের 'ওরা কাজ করে' (১৯৬৪)। দক্ষিণবঙ্গের, স্পষ্ট করে বলা যায়, চব্বিশ পরগণার ক্ষেতমজুরদের জীবনযাত্রা নিয়ে লিখিত এই উপন্যাসে দেখা যায় গ্রামজীবনের সঙ্গে লেখকের পরিচয় নিবিড়। কৃষিনির্ভর ক্ষেতমজুরদের অনিশ্চিত জীবনযাত্রার নিখুঁত আলেখ্য 'ওরা কাজ করে'। এই উপন্যাসের ক্ষেত্র পীরপুর গ্রাম একক নয়, বাংলাদেশের অসংখ্য নামের একটি ; উপন্যাসের চরিত্র ক্ষেতমজুর চন্দন, ফকির, মুকুন্দ, শিবু, অধরদের দেখা পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গের সকল গ্রামেই। তবু তাদের মধ্যে এমন এক বিশিষ্টতা আছে যা তাদের একত্র বেঁধেছে। আঞ্চলিক সীমাসংহতি, ভৌগোলিক অখণ্ডতা, বৃত্তির ঐক্যবন্ধন, জীবনযাত্রার একমুখীনতা এইসব চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিশিষ্ট-রূপ পেয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের মাটি, মাটির কাছাকাছি জীবন ও তৎসংলগ্ন মানুষ, আঞ্চলিক ভাষা, আবহ ও পরিবেশ—সমস্তটা মিলিয়ে একাত্ম হয়ে উঠেছে। এইসব নিরন্ন দরিদ্র ক্ষেতমজুর শ্রমের উপযুক্ত মূল্য পায় না, বছরে সাত মাস কর্মহীনতার আতঙ্কে গঞ্জে বাজারে হাটে মাঠে উচ্ছিষ্ট পাতার

মতো ছুটে বেড়ায়, আবার বর্ষা সমাগমে ক্ষেতে বীজ বোনার জন্য নিজ গ্রামে ফিরে আসে। এ উপন্যাস এইসব নিরন্ন কর্মঠ মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা ন্যায়নীতি ধর্মকর্ম ও দিনযাপনের বাস্তবনির্ভর কাহিনী। এখানে নোতুনত্বের মোহ নেই, আছে অভিজ্ঞতার শান্ত উৎসার। এ উপন্যাসের পটভূমি, সীমাসংহতি, বিন্যাসরীতি ও জীবনচিত্রণে যে দক্ষতা আছে, তা একে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস রূপে গড়ে তুলেছে।

পাঠকের চৈতন্যে ভূগোলবোধির সঞ্চারই যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে চাই জীবনবেধের ও জীবনবোধের বিস্তার। জীবন আধেয়, আঞ্চলিকতা তার আধার মাত্র—এই সত্য বিস্মৃত হলেই আঞ্চলিক উপন্যাসের শিল্পসম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। লেখকের আন্তরিকতা ও অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে চাই জীবনরহস্যের ও জীবনবোধের গভীর উপলব্ধি। বিষয়গত সার্থকতা নয়, শিল্পগত সার্থকতাই আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্বিষ্ট। প্রকৃতির পটভূমি যথেষ্ট নয়, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্থাপনই মুখ্য।

আঞ্চলিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় সংযোজন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আঞ্চলিক জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা চাই, স্থানিক রঙ ফোটানোর কারুকুশলতা চাই, আঞ্চলিক উপভাষার উপর দখল চাই। কিন্তু এগুলি উপাদান মাত্র, লক্ষ্য নয়। আসলে চাই গভীর জীবনবোধ। নোতুন মানুষ, নোতুন ভূখণ্ড, অপরিচিত ধ্যানধারণা, নোতুন মানসিকতা—সব মিলিয়ে একটা অখণ্ড জগৎ গড়ে তোলার উপযুক্ত জীবনবোধ। এ ছাড়া কোনো লেখাই সার্থক নয়। হার্ডির 'দ্য রিটার্ণ অভ্ দ্য নেটিভ' উপন্যাসে এগডন হীথের রুক্ষ প্রান্তর তার ভয়াল বিস্তার নিয়ে ওয়েসেক্স অঞ্চলের বিশিষ্ট বাতাবরণ গড়ে তুলেছে এবং তার উপরে প্রাধান্য লাভ করেছে একটি বিশিষ্ট জীবনবোধ, যা পাঠককে ভাবায়, তাকে চিন্তার নোতুন স্তরে উত্তীর্ণ করে। এই জীবনবোধ ও নবজন্মের মুহূর্ত যে উপন্যাসে দেখা যাবে, সেই উপন্যাসই সার্থক। আর যদি এই গভীর জীবনবোধের প্রত্যাশা না থাকে, তবে বহু সংবাদধর্মী বিবরণ বা রম্যকাহিনীকে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলে ভুল সিদ্ধান্ত করব। এই বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্যই আঞ্চলিক উপন্যাস-পাঠকের এই আত্মজিজ্ঞাসা ও নির্মোহ বিশ্লেষণ। একে বাদ দিলে পাঠক হিসাবে আমি ফাঁকে পড়ব এবং সম্ভবত, প্রশংসাচ্ছলে লেখককেও ফাঁকি দেব।

অচলায়তন : সমাজচিন্তা ও শিল্পনীতি

॥ এক ॥

'অচলায়তন' নাটক প্রথম প্রকাশিত হয় আশ্বিন, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ পূজাসংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় আষাঢ়, ১৩১৯ বঙ্গাব্দে (১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ)। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় অর্ধ-শতাব্দ যাবৎ অচলায়তন-সম্পর্কিত আলোচনায় শুদ্ধ শিল্পচিন্তা অপেক্ষা সামাজিক মনের প্রতিক্রিয়া বারে বারে প্রাধান্য পেয়েছে। অচলায়তন প্রকাশের পরই ইংরেজির অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রতিবাদ-সমালোচনা লেখেন (আর্যাবর্ত, কার্তিক, ১৩১৮) তাতেই সামাজিক মনের প্রতিক্রিয়া প্রথম ধরা পড়ে। আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য রবীন্দ্রনাথ এই রূপক নাটকে হিন্দু সমাজের আচার-জীবনকে ব্যঙ্গ করে সনাতনী ধর্মাচারকে অসার প্রতিপন্ন করেছেন,—এটাই অচলায়তনের বিরুদ্ধে ললিতবাবুর মূল অভিযোগ। সে অভিযোগ আজো বার বার উচ্চারিত। অচলায়তনের শিল্পমূল্য তথা শিল্পদৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনার পথে প্রধান বাধা এই সামাজিক বিচার।

অচলায়তন কাহিনীপ্রধান নয়, ভাবপ্রধান নাটক। এই সত্য বিস্মৃত হলে নাটকের মর্মসত্য উপলব্ধিতে বাধা ঘটে।

এই নাটকের কাহিনী-অংশ সামান্য। 'অচলায়তন' প্রাচীর ঘেরা শিক্ষায়তন। এখানে আচার্য, উপাচার্য, ছাত্র আছে। এখানে সব কিছুই প্রাচীন। সবকিছুরই সমাধান আছে, কোনো জিজ্ঞাসা বা সংশয় এখানে মাথা চাড়া দিতে পারে না। তার উত্তর দিকে জানালা আজ সাড়ে তিন শ বছর বন্ধ, তা খোলা নিষেধ। মহাপঞ্চক ও পঞ্চক, দুই ভাই। মহাপঞ্চক তন্ত্রমন্ত্র আচার আচমন পালন করে। তার গভীর নিষ্ঠা প্রাচীন বিধানে ও বিশ্বাসে। আর ছোট ভাই পঞ্চক তার বিপরীত। মন্ত্র মুখস্থ করায় তার আগ্রহ নেই, সে গান ভালবাসে, প্রাচীরের বাইরে শোণপাংশুদের সঙ্গে মেশে। পঞ্চক নোতুনকে চায়। এ নিয়ে তার সঙ্গে অচলায়তনের পরিচালকদের নিত্য-

বিরোধ। কিশোর সুভদ্র যখন উত্তর দিকের জানালা খুলে দেখে মহাপাতক করে ফেলে, তখন তার শাস্তিবিধানে সবাই বদ্ধপরিকর, কেবল পঞ্চক আর আচার্য অদীনপুণ্য তাকে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত থেকে বাঁচাতে চায়। উত্তরে হাওয়া ঢুকে আজ অচলায়তনে সবকিছু অশুচি,—একথা ভেবে মহাপঞ্চকের দল বিচলিত। এমন সময় শোনা গেল, গুরু আসছেন। আচার্য অদীনপুণ্য এতদিন ছিলেন এস্টাব্লিশমেন্টের ধারক, আজ তিনি তার বিরুদ্ধে। সে-কারণে অন্ত্যজ দর্ভকদের পল্লীতে তিনি নির্বাসিত, তাঁর সঙ্গে নির্বাসিত পঞ্চক। দর্ভকদের গোসাঁই, শোণপাংশুদের দাদাঠাকুর আর অচলায়তনের অ-দেখা গুরু—তিনজনই একই সত্তা, তা জানা গেল নাটকের শেষে যেদিন শোণ-পাংশুর দল তাদের যোদ্ধবেশে সজ্জিত দাদাঠাকুরের নেতৃত্বে অচলায়তনের সহস্র বৎসরের প্রাচীর ভেঙে দিল। বহু যুগ পরে অচলায়তনে বাইরের আলো-বাতাস এসে পড়ল, প্রাণহীন নিয়মপালনের মূঢ়তা থেকে সকলে মুক্তি পেল। অচলায়তনের এতদিন সংশয়-বিমুক্ত জিজ্ঞাসাহীন শান্তি ঘুচে গেল। দাদাঠাকুর কারাগার ভেঙে দিয়েছেন, এবার পঞ্চক সেই উপকরণ দিয়ে মন্দির গেঁথে তুলবে।

অচলায়তনের এই কাহিনী থেকে অনায়াসে অনুমান করা যায়, এ বিদ্রোহ কোনো বিশেষ সমাজের বিরুদ্ধে নয়, প্রাণহীন বন্দীশালার বিরুদ্ধে। ব্রাহ্ম নাট্যকার হিন্দু সমাজকে আঘাত করার জন্য এ নাটক লিখেছেন, একথা যুক্তিযুক্ত নয়। আধুনিক কালে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বন্ধন থেকে প্রাণকে মুক্তি দেবার যে আহ্বান পৃথিবীর সর্বত্র ধ্বনিত, তা'ই অচলায়তন নাটকের সত্য। সত্যের কোনো জিওগ্রাফি নেই। তা সকল দেশের সকল মানুষের সত্য। এই নাটকে সেই সর্বজনীন সত্য ভারতীয় রূপ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহ এর বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহ আরো স্পষ্ট হয়েছে পরবর্তীকালে রচিত 'তাসের দেশ' নাটিকায় (১৯৩৩)। 'তাসের দেশে' নিয়মকে ভেঙে প্রাণ সঞ্চার করার যে ব্রত উদ্‌যাপিত, 'অচলায়তনে' তাঁর সূচনা।

'অচলায়তন' ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকারকে আর 'তাসের দেশ' দেশনেতা সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গীকৃত। নাট্যকারের মনোভঙ্গী এই উৎসর্গ থেকেই অনুধাবন করা যায়। যদুনাথ ইতিহাসের যে সত্যের আরাধনা করেছিলেন তার কোনো জিওগ্রাফি নেই, আর সুভাষচন্দ্র যে বিদ্রোহ করেছিলেন ও ব্রত উদ্‌যাপনের সংকল্প নিয়েছিলেন, তা অচলায়তনের বিরুদ্ধে

তরুণের বিদ্রোহ, প্রাণ সঞ্চারের ব্রত।

ললিতবাবুর প্রতিবাদের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী এই বন্দীশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্ত হয় নাই—এই পাষাণ-প্রাচীরের চারি দিকেই তাহার মাথা ঠেকিয়া সে কোনো আশার পথ দেখিতেছে না।...মনে করিবেন না অচলায়তনে আমি গালি দিয়াছি বা উপদেশ দিয়াছি। আমি প্রাণের ব্যাকুলতায় শিকল নাড়া দিয়াছি, সে শিকল আমার, এবং সে শিকল সকলের। নাড়া দিলে হয়তো পায়ে বাজে। শিকল যে শিকলই সেই কথাটা যেমন করিয়া হউক জানাইতে হইবে।...... যাঁহারা মহাপুরুষ তাঁহারা মানুষকে এই দুর্গতি হইতেই উদ্ধার করিতে আসেন। তাই অচলায়তনে এই আশার কথাই বলা হইয়াছে যে, যিনি গুরু তিনি সমস্ত আশ্রয় ভাঙিয়া চুরিয়া দিয়া একটা শূন্যতা বিস্তার করিবার জন্য আসিতেছেন না; তিনি স্বভাবকে জাগাইবেন, অভাবকে ঘুচাইবেন, বিরুদ্ধকে মিলাইবেন; যেখানে আভাসমাত্র আছে সেখানে লক্ষ্যকে উপস্থিত করিবেন, এবং যেখানে তপ্ত বালু বিছানো খাদ পড়িয়া আছে মাত্র সেখানে প্রাণপরিপূর্ণ রসের ধারাকে বহাইয়া দিবেন।"

শ্রীঅমল হোমকে লিখিত এক পত্রে (৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৮) রবীন্দ্রনাথ কিছুটা তীব্রতার সঙ্গেই লেখেন,

"অচলায়তন নিয়ে বাংলাদেশে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে তার উত্তাপ তোমাদের ছাত্রমহলেও সঞ্চারিত হয়েছে দেখছি। তোমার ইন্‌স্টিটিয়ুটের বন্ধুদের বোলো যে 'ভারতের ধর্মসাধনাকে ছোট করবার জন্য শোণপাংশুদের বড় করা হয়েছে' একথা ভুল। ধর্মের নামে, সমাজের নামে, আচারের নামে যে বিরাট কারাগার আমরা আমাদের চারপাশে গড়ে তুলেছি সেই বন্দীশালা থেকে, আমাদের সংস্কারকে, অভ্যাসকে, যুক্তিকে মুক্তি দেবার আহ্বানই অচলায়তনের আহ্বান।

অধ্যাত্মসাধনায় মন্ত্রের স্থান আমি কোনদিনই অস্বীকার করি নি—আমার পিতৃদেবের ও পরিবারের দীক্ষা ও শিক্ষা উপনিষদের মন্ত্রেই কিন্তু সে মন্ত্র যখন নিরর্থক আবৃত্তিচক্রে তার নিহিতার্থ লুপ্ত করে দেয় তখন সে মুক্তির নামে বন্ধনই করে সৃষ্টি। প্রাচীনের জয়ঘোষণায় করতালি লাভ আমার পক্ষে কঠিন নয়, একদিন তা পেয়েওছি, কিন্তু মনকে আর দেশকে সনাতনের

চুষিকাঠি হাতে ধরিয়ে ছেলেভোলানোর প্রবৃত্তি নেই আর। দেশের তরুণদের কাছেও প্রিয়বচন ছড়িয়ে প্রিয় হতে চাই নে—আঘাত দিতে ও নিতে প্রস্তুত যত দুঃখই পাই না কেন।"

'অচলায়তন' বহু শতাব্দীর নিষ্প্রাণ বিধান ও আচারের বন্দীশালা থেকে মুক্তিলাভের আহ্বান। এ নাটকে প্রাণের জয়গান ধ্বনিত। তার প্রধান গায়ক পঞ্চক।

দুই

টি. এস. এলিঅট একটি প্রবন্ধে ইমেজ বা বাক্‌প্রতিমার জন্মরহস্য সন্ধান করে বলেছেন, অধীত জগৎ থেকে লেখক-সৃষ্ট বাক্‌প্রতিমাগুলির একটি অংশ আসে, বেশীর ভাগ আসে লেখকের ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে। তা মনের গভীর স্তর থেকে বাইরে রচনার বাক্‌প্রতিমায় মুক্তি পায়। কিন্তু সব ইন্দ্রিয়ানুভূতিই বাক্‌প্রতিমায় ফিরে আসে না। শৈশবলোক আর স্মৃতিলোক থেকে লেখক তাঁর বাক্‌প্রতিমা সংগ্রহ করেন। এই সব বাক্‌প্রতিমার অন্তরালে লেখকের অনেক দিনের অনেক ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা নোতুন রূপ পায়। ('Conclusion', "The use of Poetry And the use of Criticism.")

নাট্যকৌশল হিসাবে বাক্‌প্রতিমার গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য। ঘটনা ও পরিস্থিতির রূপায়ণে, পরিবেশ রচনায়, চরিত্রচিত্রণে, দৃশ্যাদির পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষায় বাক্‌প্রতিমার ভূমিকা অবহেলার নয়।

অচলায়তনে বাক্‌প্রতিমা শুধু বাইরের অলংকরণ নয়, নাটকের সক্রিয় ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

প্রথমে গানগুলি দেখা যাক। অচলায়তনে ছয়টি দৃশ্য। প্রথম দৃশ্যে ২টি গান, দ্বিতীয় দৃশ্যে ১১টি গান, তৃতীয় দৃশ্যে ১টি গান, চতুর্থ দৃশ্যে ৫টি গান, পঞ্চম দৃশ্যে ২টি গান, ষষ্ঠ দৃশ্যে ২টি গান—সর্বমেত ২৩টি গান সংকলিত হয়েছে। এইসব গানের মধ্যে যে বাক্‌প্রতিমাগুলি উপস্থিত তার বিচার করা যেতে পারে।

১। তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে কেউ তা জানে না,
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে, কেউ তা মানে না।

পঞ্চকের এই গানের মধ্যে ঐশী আন্তর-আহ্বানের বাক্‌প্রতিমাটি দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় প্রেক্ষাপট প্রভাত এখানে পঞ্চকের আনন্দের পটভূমি। প্রকৃতি থেকে এই বাক্‌প্রতিমা গৃহীত। পঞ্চকের এই গানে বদ্ধ দুয়ার, বাহির থেকে করাঘাত, আকাশে ব্যাকুলতা, বাতাসে বার্তা,—এইসব ইমেজ ব্যবহৃত।

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর, কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর কেউ তো হানে না।......
তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে কেউ তা জানে না॥

'পঞ্চমে স্বর' ডাকের তীব্রতাকে যেমন বুঝিয়েছে তেমনি ডাকের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে 'আকাশে কার ব্যাকুলতা'য়। পঞ্চকের জীবনে বন্দীশালা থেকে মুক্তির ডাক শোনা গেল। অচলায়তন থেকে মুক্তির আহ্বান প্রথম গানের বাক্‌প্রতিমায় রূপায়িত। পঞ্চক অচলায়তনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতা। অচলায়তনের বিধান ও আচার সে-ই বার বার অমান্য করেছে।

২। দূরে কোথায় দূরে দূরে
মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে
যে বাঁশিতে বাতাস কাঁদে
সেই বাঁশিটির সুরে সুরে।
যে পথ সকল দেশ পারায়ে
উদাস হয়ে যায় হারায়ে
সে পথ বেয়ে কাঙাল পরান
যেতে চায় কোন্ অচিন পুরে।

এই গানে রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি বহু-ব্যবহৃত বাক্‌প্রতিমায়—পথ—পঞ্চকের মুক্তিপিপাসা রূপায়িত। পথের টানে পঞ্চকের মন অচলায়তনের প্রাচীর লঙ্ঘন করে বিপুল বিশ্বে যেতে চেয়েছে।

॥ ২-খ ॥

৩। এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে—
তা কে জানে তা কে জানে।
কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে।
কোন্ দুরাশার দিক পানে—
তা কে জানে তা কে জানে।

পূর্ববর্তী গানের বাক্‌প্রতিমা—পথ—এখানেও ব্যবহৃত। পঞ্চকের মুক্তি-পিপাসা তীব্রতর ও গভীরতর হয়েছে এখানে। অনির্দিষ্ট পাহাড়ের পারে, সাগরের ধারে, দুরাশার দিকে পঞ্চকের মন প্রবল বেগে ধাবিত। অচলায়তনের শৃঙ্খল-বন্ধন তার কাছে অসহ্য হয়েছে, একই 'তট তট তোটয় তোটয়' মন্ত্রের অর্থহীন পুনরাবৃত্তি, একই অন্ধ মূঢ় আচারের প্রশ্নহীন অনুসরণ আজ পঞ্চকের কাছে নিষ্ফল প্রাণহীণ বলে প্রতিভাত। আজ তারই প্রতিক্রিয়ায় দূরের পথ তাকে প্রবল বেগে বাইরের দিকে টানছে।

৪। আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে।

শোণপাংশুদের প্রথম সম্মেলক গানে মাটির কাছাকাছি থাকার আনন্দ, স্বেদ ও শ্রমের তৃপ্তি, ঋতুচক্রাবর্তনে জীবনছন্দকে মিলিয়ে নেবার উল্লাস এই গানে ধ্বনিত। এখানে ঋতুচক্রের দৃশ্যপট বাক্‌প্রতিমারূপে ব্যবহৃত। প্রাকৃতিক বাক্‌প্রতিমা রচনায় রবীন্দ্রনাথ সহজ নৈপুণ্য এখানে প্রতিষ্ঠিত। চষা মাটির গন্ধ, সবুজ পাতায় সূর্যালোকের নাচ, পক্ক ধান্যশীর্ষের আন্দোলন, অঘ্রানের কাঁচা সোনা রোদ, পূর্ণিমার আলোকধারায় স্নাত শান্ত পৃথিবী : এইসব দৃষ্টি ও শ্রুতিনির্ভর ইমেজ এখানে একটি সামগ্রিক বাক্‌প্রতিমায় ধরা দিয়েছে। অচলায়তনের বাইরের যে জগতের মাটির গন্ধ, আলোর নাচ বন্দীপ্রাণকে নিত্য আকর্ষণ করে, তা এখানে স্পষ্ট রেখাঙ্কিত।

৫। কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন
ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে!
লক্ষযুগের অন্ধকারে ছিল সংগোপন
ওগো তায় জাগাইনু রে।

শোণপাংশুদের দ্বিতীয় সম্মেলক গান। এখানে শ্রমে ও স্বেদে জীবনের

আনন্দ বিধৃত। এখানে নিদ্রার অধিকার থেকে প্রাণের মুক্তির ভিত্তিতে বাক্‌প্রতিমা রচিত। অন্ধকার থেকে আলোয় মুক্তির আহ্বান এখানে ধ্বনিত। অচলায়তনের প্রাণহীন বন্দীজীবনের পাশে বৈপরীত্য হিসেবে এখানে এসেছে এই ইমেজ—কঠিন লোহার কঠিন ঘুম ভাঙানো হয়েছে, অচেতন থেকে তাকে চেতনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

৬। সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই!
বাধাবাঁধন নেই গো নেই।
কেবল দেখি, খুঁজি, বুঝি
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব কাজেই।

শোণপাংশুদের তৃতীয় সম্মেলক গান। এখানেও শ্রমে ও স্বেদে জীবনের আনন্দ বিধৃত—'আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।' অচলায়তনের প্রাণহীণ গানহীন জীবনযাত্রার পাশে বৈপরীত্যরূপে প্রাণের আনন্দ এখানে সৃষ্টির উল্লাসে প্রতিষ্ঠিত।

৭। ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।
আলোতে কোন্ গগনে
মাধবী জাগল বনে,
এল সেই ফুল জাগানোর খবর নিয়ে।

পঞ্চকের এই গানে অচলায়তনের বাইরেকার মুক্ত জীবনের আনন্দ প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমায় যে দু'টি উপাদান বার বার ব্যবহৃত, তার সার্থক প্রয়োগ ঘটে এখানে। আলো আর গান। প্রকৃতি থেকে এখানে উপাদান সংগৃহীত। ভ্রমরের গুন্‌গুন্, মাধবীফুলের জাগরণ, আলোর বন্যাধারা—এইসব উপাদান ঘরের বাইরে পঞ্চকের মনকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করেছে। নিষ্প্রাণ আচারের অর্থহীন পুনরাবৃত্তিতে নয়, মুক্ত প্রকৃতির কোলে নব নব আনন্দের আমন্ত্রণ পঞ্চককে ব্যাকুল করে তোলে—'কেমনে রহি ঘরে, মন যে কেমন করে'। অচলায়তনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী পঞ্চকের মনের ব্যাকুলতা এই বাক্‌প্রতিমায় ধরা পড়েছে।

৮। এই একলা মোদের হাজার মানুষ
দাদাঠাকুর।

এই আমাদের মজার মানুষ

দাদাঠাকুর।.........

এই আমাদের মনের মানুষ

দাদাঠাকুর।

শোণপাংশুদের চতুর্থ সম্মেলক গান। এই প্রথম দাদাঠাকুরের উল্লেখ পাওয়া গেল। দাদাঠাকুর যে মুক্ত প্রাণের অধিকারী, তিনিই যে সকলের মজার মানুষ (আনন্দের উৎস), মনের মানুষ (অন্তর সঙ্গী), সকল ক্ষণের মানুষ (নিত্য সঙ্গী), হাজার মানুষ (সকলের সঙ্গী)—এই ভাবটি এখানে ব্যক্ত। মুক্তির পটে তাঁর প্রতিষ্ঠা। ঘর থেকে বাহিরে নানা সাজে নানা কাজে, হাসির দলে চোখের জলে তিনি ধরা দেন। এখানে বহিরিন্দ্রিয়-নির্ভর বাক্‌-প্রতিমা নয়, অন্তরিন্দ্রিয়-নির্ভর বাক্‌প্রতিমারই প্রতিষ্ঠা। ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা ও প্রাকৃতিক উপাদান পূর্বেকার গানগুলিতে বাক্‌প্রতিমা গড়ে তুলেছে। এখানে অনুভূতি ও অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা।

৯। যা হবার তা হবে।

যে আমাকে কাঁদায় সে কি অমনি ছেড়ে রবে।

পথ হতে যে ভুলিয়ে আনে, পথ যে কোথায় সেই তা জানে,

ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাড়ায় সেই তো ঘরে লবে।

দাদাঠাকুরের প্রথম গান। মুক্ত পুরুষ দাদাঠাকুরের পরিচয় এখানে ব্যক্ত। এই গানে পথের বাক্‌প্রতিমা ব্যবহৃত। বস্তুত রবীন্দ্রসাহিত্যে পথ মুক্তির বাক্‌প্রতিমা। বার বার নানা রচনায়, বিশেষত রবীন্দ্রনাটকে, পথের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ঘর ছেড়ে পথে যাবার আনন্দ এখানে ধ্বনিত। সেই সঙ্গে আছে মানসিক আবেগ—ক্রন্দনের আনন্দ। ক্রন্দনের বিশেষ তাৎপর্য রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কাব্যে বার বার বাণীরূপ পেয়েছে। পথ আর ক্রন্দন, দুয়ে মিলে যুগপৎ অন্ত-রিন্দ্রিয় বহিরিন্দ্রিয়-নির্ভর বাক্‌প্রতিমা রচিত হয়েছে।

১০। আমি কারে ডাকি গো

আমার বাঁধন দাও গো টুটে।

আমি হাত বাড়িয়ে আছি

আমায় লও কেড়ে লও লুটে।

পঞ্চকের এই গানে বৃহত্তর জীবনের মুক্তির আহ্বান পুনর্বার ধ্বনিত হয়েছে। পঞ্চকের এই গানে ব্যবহৃত বাক্‌প্রতিমায় বার বার বহির্জীবনের আমন্ত্রণ।

ক্রমশই তা সাংকেতিক আমন্ত্রণে পরিণত। রহস্যময় অধ্যাত্মজীবনের প্রবল আকর্ষণ ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

১১। বুঝি এল, বুঝি এল, ওরে প্রাণ।
এবার ধর দেখি তোর গান।

দাদাঠাকুরের দ্বিতীয় গান। এখানে প্রাণের আহ্বান বাক্‌প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতি নানা উপাদান (চঞ্চল ঘাস, শিউরে ওঠা ধরণী, উৎকর্ণ আকাশ, বনের মর্মর, কাঁপনলাগা পাতা) স্পর্শেন্দ্রিয়-নির্ভর বাক্‌প্রতিমাকে গড়ে তুলেছে। দাদাঠাকুর প্রাণের মুক্তির সংবাদ নিয়ে এসেছেন, এ সত্যটি এখানে প্রতিষ্ঠিত। অরণ্যমর্মরে যে ক্রন্দনধ্বনি তা বুঝি বদ্ধ প্রাণের মুক্তিকামনার ক্রন্দন,—এই ইঙ্গিতটি এখানে নিপুণভাবে রূপায়িত।

১২। আজ যেমন করে গাইছে আকাশ
যেমন করে চাইছে আকাশ।
তেমনি করে গাও গো।
তেমনি করে চাও গো।

পঞ্চকের এই গান তার মুক্তিপিয়াসী মনের আনন্দ আর ব্যাকুলতার প্রকাশ। এই ব্যাকুলতার পরিচয়স্থল এইসব বাক্‌প্রতিমা—আকাশের গান গাওয়া, আকাশের তীব্র চাওয়া, বনের কান্না, পাতার মর্মর। সবেরই লক্ষ্য এক—প্রকাশ ও মুক্তির ব্যাকুলতা।

১৩। হারে রে রে রে রে—
আমায় ছেড়ে দে রে দে রে
যেমন ছাড়া বনের পাখি
মনের আনন্দে রে।

এই গানে মুক্তিপাগল পঞ্চকের ব্যাকুলতা ও উল্লাস গানের সুরে ছাড়া পেয়েছে। পর পর কয়েকটি বাক্‌প্রতিমা এখানে ব্যবহৃত—মুক্ত বনের পাখি, বাঁধনহারা শ্রাবণধারা, দৈত্যসম বাদল বাতাস, দাবানল, বজ্র, ঝড়ের মেঘ—দ্রুত পরম্পরায় এইসব প্রাকৃতিক ইমেজ এসেছে। বন্ধনমুক্তির আনন্দ উল্লাস এখানে প্রাকৃতিক শক্তির (Elemental Force) মুক্ত উল্লাসে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির এইসব শক্তির আনন্দ সুরের উল্লাসে ব্যক্ত। পঞ্চকের মন আজ সকল জীর্ণ সংস্কারের শৃঙ্খল মোচন করে মুক্তি পেয়েছে, এই সত্য এখানে আভাসিত। পরম্পরিত বাক্‌প্রতিমার ত্রুটিহীন নিদর্শনরূপে এই গান আমাদের মুগ্ধ করে।

॥ ২-গ ॥

১৪।   ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে
তারে আজ থামায় কে রে।
সে যে আকাশ পানে হাত পেতেছে
তারে আজ নামায় কে রে।

পঞ্চকের গান। অচলায়তনের বন্ধন থেকে মুক্ত পঞ্চকের প্রাণের উল্লা এখানে পুনর্বার ধ্বনিত হয়েছে। নৃত্যপর সুরের উল্লাসে পঞ্চকের উল্লাস রূপায়িত। মনের মুক্তির প্রেক্ষাপট মুক্ত আকাশ। অন্তরিন্দ্রিয়-নির্ভর এই বাক্‌প্রতিমায় আকাশের ঘন নীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক শুনেছে পঞ্চক। গানের সুরে যে দ্রুতি, যে উল্লাস, যে মুক্তি—তা পঞ্চকের মনের উল্লাস ও মুক্তির পরিচায়ক।

২-ঘ

১৫।   এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে রে।
তোরা আমায় বলে দে ভাই বলে দে রে।
ফুলের গোপন পরানমাঝে
নীরব সুরে বাঁশি বাজে—
ওদের সেই মধুতে কেমনে মন ভরেছে রে।

পঞ্চকের এই গানে প্রকৃতি থেকে বাক্‌প্রতিমা আহরিত। এর আে পেয়েছি ভ্রমর ও মাধবী ফুল (৭সং গান), এখানে পাই মৌমাছি ও ফুলের মধু। ফুলমধুর সন্ধানে মৌমাছিরা যেমন ঘড়ছাড়া, জীবনমধুর সন্ধানে পঞ্চক তেমনি ঘরছাড়া। 'মুক্তির বাঁশি বাজে নীরব সুরে' আর 'সেই মধুতে মন ভরেছে' : বহিরিন্দ্রিয়ের জগৎ থেকে অন্তরিন্দ্রিয়ের জগতে মুক্তিলাভের বাণী এখানে উচ্চারিত। অচলায়তনের বাইরে দর্ভকপল্লীতে নির্বাসিত পঞ্চক আজ সব প্রাণহীন আচার-বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। সেই মুক্তির বাক্‌প্রতিমা মধুলুব্ধ মৌমাছির দল।

১৬।   ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি।

ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরানের বঁধু।

দর্ভকদের প্রথম সম্মেলক গান। শোণপাংশুদের সম্মেলক গান থেকে এ গান ভিন্নতর। শোণপাংশুদের কর্মচাঞ্চল্য ও নিত্য উত্তেজনা থেকে দর্ভকেরা মুক্ত—এদের মুক্তি শান্ত ধ্যানে। পরম্পরিত উপমার মালায় গ্রথিত এই গানের বাক্‌প্রতিমাটিতে যিনি রূপের আড়ালে আছেন, তাঁর বন্দনা করা হয়েছে। অচলায়তনে যে সংকেতের অন্তর্গূঢ় আভাস আচার্য অদীনপুণ্যের চিত্ত-ব্যাকুলতায়, দর্ভকদের গানে তারই দ্যোতনা। 'ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল' : গানের অন্তিম চরণে জন্মমৃত্যুর উৎসরূপ ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত প্রণাম।

১৭। আমরা তারেই জানি তারেই জানি সাথের সাথি।
তারেই করি টানাটানি দিবারাতি।...
সারাদিনের কাজ ফুরালে
সন্ধ্যাকালে
তাহারি পথ চেয়ে ঘরে জ্বালাই বাতি।

দর্ভকদের দ্বিতীয় সম্মেলক গান। গান হিসেবে ও বাক্‌প্রতিমা হিসেবে পূর্বের গান থেকে এটি উৎকৃষ্ট। দিনের শেষে সন্ধ্যার ছবি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বাক্‌প্রতিমা। প্রভাত আর সন্ধ্যা—দু'টি ইমেজই রবীন্দ্রনাথের মনকে বিশেষভাবে টানে। দিবসের কর্মশেষে বিশ্রাম ও চিত্তের ধ্যানমগ্নতা সন্ধ্যার বাক্‌প্রতিমায় আভাসিত। ধেনু চরানো, বেণু বাজানো, বটের ছায়ার আসন, হালের মাঝিগিরি—সবের শেষে সন্ধ্যায় ঘরে বাতি জ্বালানো!

সন্ধ্যার বাতি জ্বালানোর বাক্‌প্রতিমাটি ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ। জীবনের সকল কর্মের অবসান তাঁরই পথচেয়ে প্রাণের প্রদীপখানি জ্বালিয়ে শান্তচিত্তে প্রসন্ন প্রতীক্ষা—এখানে দর্ভকদের মনে ঈশ্বরের আসন পাতা হয়েছে। লক্ষণীয়, এদেরই মাঝে দর্ভকপল্লীতে আচার্য অদীনপুণ্য ও পঞ্চক সার্থক হয়ে উঠেছেন। নাটকের বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই গান ও তার বাক্‌প্রতিমা যথেষ্ট সাহায্য করেছে। পঞ্চকের উক্তি স্মর্তব্য : 'আমি দেখেছি দর্ভক জাতের একটা গুণ—ওরা একেবারে স্পষ্ট করে নাম নিতে জানে।'

১৮। সকল জনম ভরে ও মোর দরদিয়া—
কাঁদি কাঁদাই তোরে ও মোর দরদিয়া।

আজ হৃদয়মাঝে সেথা কতই ব্যথা বাজে
ওগো একি তোমায় সাজে ও মোর দরদিয়া।

পঙ্কের এই গানে আর কোনো বাধা রইল না। ঈশ্বরে প্রতি পঙ্কের সমস্ত হৃদয় উন্মুখ হয়ে উঠেছে এই গানে। ক্রন্দনের বাক্‌প্রতিমাটি এখানে আরেকবার ব্যবহৃত। এ ক্রন্দন ঈশ্বরের জন্য আর্ত হৃদয়ের ক্রন্দন। এই ক্রন্দনেই বন্ধন-মুক্তি, পরমাপ্রাপ্তির আশ্বাস। 'দুয়ার-দেওয়া ঘরে' আঁধারের রাজত্ব—তাকে দূর করে ঈশ্বরের করুণা আলোকধারার মতো নেমে আসছে : এ ইঙ্গিতে সমৃদ্ধ গানটি।

১৯। উতল ধারা বাদল ঝরে সকাল বেলা একা ঘরে।
সজল হাওয়া বহে বেগে পাগল নদী উঠে জেগে
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে তমালবনে আঁধার করে।

দর্ভকদের তৃতীয় সম্মেলক গান। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বাক্‌প্রতিমা এখানে ব্যবহৃত। উতল বাদল ধারা, সজল হাওয়া, পাগল নদী, কাজল মেঘ, আঁধার তমালবন, নিবিড তিমিব রাত—এইসব ছবি একসঙ্গে গড়ে তুলেছে বাক্‌-প্রতিমা। নিবিড তিমির রাত বাদলধারায় মুখরিত,—তাবই মাঝে ঈশ্বর নিঃশব্দ চরণপাতে এসে পৌঁচেছেন, ভক্ত তার ব্যাকুল পরাণ পেতে দিয়েছেন তারই 'পরে ঈশ্বরের চরণপাত হবে বলে। দর্ভকদের ঈশ্বরসাধনায় যোগ দিয়েছেন আচার্য অদীনপুণ্য ও পঞ্চক। তাঁরাও যোগ দিয়েছেন এই গানে। উতলা ঝড়ের রাতেই ঈশ্বরের জন্য ভক্তের অভিসার। অভীমন্ত্র, বিশ্বাস ও প্রেমে বলীয়ান হয়ে আজ সবাই মিলে চলেছেন তাঁরই অভিসারে। বজ্রপাত, বিদ্যুচ্চমক, মত্ত পবন, উতল বাদলধারা, নিবিড তিমির রাত—এরই মাঝে ঈশ্বর আসছেন। প্রকৃতির নানা উপাদানে রচিত ঐ বাক্‌প্রতিমা নাটকেব অন্তরাত্মাকে ব্যক্ত কবেছে। এই নিবিড তিমির বাতের অবসানেই পরমাপ্রাপ্তির প্রভাতের আবির্ভাব—এ আশ্বাসে গানের সমাপ্তি।

॥ ২-ঙ ॥

২০। আলো, আমার আলো, ওগো আলো ভুবন ভরা
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার আলো হৃদয়হরা।
নাচে আলো নাচে—ও ভাই আমার প্রাণের কাছে,

বাজে আলো বাজে—ও ভাই হৃদয়-বীণার মাঝে।

দর্ভক বালকদের গান। নিবিড় তিমির রাতের অবসানে আশা ও আনন্দে ভরা প্রভাতের আবির্ভাব। আলোকের বাক্‌প্রতিমা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয় ইমেজ। প্রভাতে আলোকস্পর্শে হৃদয়ের জাগরণ: এই বাক্‌প্রতিমাটি রবীন্দ্ররচনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিপুণভাবে ব্যবহৃত। আলোকের নানা ব্যবহার এখানে পাই। আলোর নাচ, আলোর বাজনা, আলোর হাসি, আলোর স্রোত, আলোর ঢেউ, আলোর পুলক, আলোর সুর: আলোর বিচিত্র ভূমিকা এখানে সুরের উল্লাসে ছবির বৈচিত্র্যে রূপায়িত। আলো চক্ষুরিন্দ্রিয়-নির্ভর মাত্র নয়, তা শ্রুতিবেদ্য স্পর্শবেদ্য, অনুভববেদ্য। আলোর খুশি সুরনদীর তরল স্রোতে, সোনারঙ মেঘস্তবকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই বাক্‌প্রতিমা প্রমাণ করে, মহাপঞ্চকদের পরাজয় নিশ্চিত, দর্ভক শোণপাংশু আর পঞ্চকের জয় নিশ্চিত।

২১। যিনি সকল কাজের কাজি, মোরা
তাঁরি কাজের সঙ্গী।
যাঁর নানারঙের রঙ্গ, মোরা
তাঁরি রসের রঙ্গী।

শোণপাংশুদের পঞ্চম সম্মেলক গান। দর্ভকদের সঙ্গে এবার মিশেছে শোণপাংশুরা। যিনি শোণপাংশুদের দাদাঠাকুর, তিনি দর্ভকের গোসাঁই, আর তিনিই আচার্য অদীনপুণ্যের গুরু, যাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় আছে সকলে। আজ অচলায়তনে তাঁর আবির্ভাব ঘটল। দাদাঠাকুরের ভক্ত শোণপাংশুদের এই গানে তাঁরই বন্দনা। এখানে খেলার, রঙ্গের, নৃত্যছন্দের ও আনন্দের বাক্‌প্রতিমা। তাঁর ডাকে সবাই সাড়া দেয়, ছুটে যায় ঘর ছেড়ে, দলে যায় পথের কাঁটা। আহ্বানের মন্ত্রটি এখানে খেলার আহ্বানে নৃত্যছন্দে উচ্চারিত। অচলায়তনের নিষ্প্রাণ মন্ত্রোচ্চারণ ও আচারপালনে নয়, জীবনের সহজ রঙ্গে নৃত্যছন্দেই ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা,—নাটকের এই সত্যটি এখানে ব্যঞ্জিত।

॥ ২-চ ॥

২২। আমি যে সব নিতে চাই, সব নিতে ধাই রে।
আমি আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে।

পালে আমার লাগল হাওয়া,
হবে আমার সাগর যাওয়া,
ঘাটে তরী বাঁধা নাইরে।

পঞ্চকের এই গানে মুক্তির আনন্দ ধরা পড়েছে বস্তুনির্ভর ও ইন্দ্রিয়নির্ভর বাক্‌প্রতিমায়। পালে লেগেছে হাওয়া, ঘাটে নেই তরী, বুকের মাঝে বাজে পথের বাঁশি, পাখিরা শাখা ছেড়ে আকাশে উধাও—এই সব ইমেজ যুগপৎ পঞ্চকের সাগরে যাবার দুর্দমনীয় অভিলাষকে ব্যক্ত করেছে। মহা-জীবনের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে পঞ্চকের হৃদয়কন্দরে, আর কি সে ঘরে থাকতে পারে? পথ, নদী, সাগর, পথের বাঁশি, পাখার ঝাপ্‌টানি,—এইসব উপাদান রবীন্দ্র-সাহিত্যে বার বার বন্ধনমুক্তির দ্যোতনা এনেছে। এই বাক্‌প্রতিমা মুক্তির ইঙ্গিতবাহী।

২৩। আর নহে আর নয়।
আমি করিনে আর ভয়।
আমার ঘুচল বাঁধন ফলল সাধন
হল বাঁধন ক্ষয়।
ঐ আকাশ ঐ ডাকে
আমায় আর কে ধরে রাখে।

নাটকের শেষ গান। পঞ্চকের দ্বাদশ গান। পঞ্চক এর পূর্ব এগারোটি গান গেয়েছে—যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৭, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ২২ সংখ্যক গান। পঞ্চক-ই এ নাটকের মুখ্য চরিত্র। পঞ্চকের গানেই নাটকের মূল বক্তব্য ব্যপ্ত। অচলায়তনের বিরুদ্ধে সে-ই প্রথম বিদ্রোহী, সে-ই শোণপাংশু-দের সঙ্গে প্রথমে মিশেছে। আচার্য অদীনপুণ্যের চিত্তে সে-ই অচলায়তনের বিরুদ্ধে সংশয়ের বীজ বুনেছে। আচার্যকে বিদ্রোহ করতে সে-ই উপলক্ষ জুগিয়েছে। নির্বাসিত আচার্যের সঙ্গে সেই দর্ভকপল্লীতে এসেছে। শোণ-পাংশু ও দর্ভকদের সঙ্গে সে-ই মিশেছে, জেনেছে এদেরই বাধামুক্ত আনন্দে ভরা চিত্তক্ষেত্রে ঈশ্বরের আসন পাতা। পঞ্চক-ই প্রথম ব্যক্তি যে দাদাঠাকুরের সঙ্গে গুরুকে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছে। দুই এক কিনা—সে ইঙ্গিত পঞ্চক-ই দিয়েছে। এটাই তার গোপন কথা, অনেকদিন থেকে মনে রেখেছে (পৃষ্ঠ ৬)। অচলায়তনে গুরু এসেছেন—দর্ভকদলের কাছে একথা শুনে পঞ্চক বলেছে, "আচার্যদেব, এদের সংবাদটা সত্যই হবে। কাল সমস্ত রাত

মনে হচ্ছিল চারদিকে বিশ্বব্রাহ্মাণ্ড যেন ভেঙেচুরে পড়ছে।" আর গুরু যখন দর্ভকপল্লীতে এসে পৌঁছেছেন, তখন পঞ্চক দেখে তিনি কেবল শোণ-পাংশুদের দাদাঠাকুর নন্, তিনিই দর্ভকদের গোসাঁই। তখন গুরু, গোসাঁই আর দাদাঠাকুর—তিনকে পঞ্চক মিলিয়ে নিয়েছে আর শেষ অভিমান ত্যাগ করে বলেছে—"দাদাঠাকুর, আমার ভারি গর্ব ছিল এ রাজ্যে একলা আমিই কেবল চিনি তোমাকে। কারও যে চিনতে বাকি নেই।" এভাবে পঞ্চকের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে নাটকের মর্মসত্য ব্যক্ত হয়েছে। পঞ্চকের শেষ সমস্যা —"তোমাকে ডাকব কী বলে? দাদাঠাকুর, না, গুরু?"

দাদাঠাকুরের উত্তর—"যে জানতে চায় না যে আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গুরু।" পঞ্চকের উত্তর—"প্রভু, তুমি তা'হলে আমার দুই-ই। আমাকে আমিই চালাচ্ছি, আর আমাকে তুমিই চালাচ্ছ এই দুটোই আমি মিশিয়ে জানতে চাই। আমি শোণপাংশু না, তোমাকে মেনে চলতে ভয় নেই। তোমার মুখের আদেশকেই আনন্দে আমার মনের ইচ্ছা করে তুলতে পারব। এবার তবে তোমার সঙ্গে তোমারই বোঝা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ঠাকুর।" (ষষ্ঠ দৃশ্য)

পঞ্চক-ই এ নাটকের প্রধান চরিত্র। সে নাট্যকারের প্রধান মুখপাত্র। সে ঈশ্বরের কর্মদূত। দাদাঠাকুর তাকে দিয়ে নোতুন শুভ্র সৌধ গড়ে তুলতে চান পুরনো অচলায়তনের ধ্বংসস্তূপের উপরে। পঞ্চক-ই এই নব কর্মযজ্ঞ ও জীবন-সাধনার প্রথম নায়ক রূপে নির্বাচিত।

শেষ গানে (২৩ সংখ্যক) পঞ্চকের এই ভূমিকাটি প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। পঞ্চকের সকল বাঁধন ঘুচেছে, আকাশ তাকে ডাকে, তার সকল দুয়ার খুলেছে, আজ সে ঘোড়া ছুটিয়ে যাবে ভুবন জয়ে। গুরু-দত্ত দায়িত্ব নিয়ে পঞ্চক নবোদ্যমে যাত্রা করেছে—এই গানে তারই ইঙ্গিত। বন্ধনহীন আকাশ, মুক্ত দুয়ার, পবনবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে যাবার পথের আমন্ত্রণ: এইসব উপাদানে পূর্ণ বাক্‌প্রতিমাটি এখানে বন্ধনমোচন ও মুক্তির আনন্দকে রূপান্বিত করে তুলেছে।

অচলায়তনের তেইশটি গানে বিবৃত বাক্‌প্রতিমাগুলিতে নাটকের মর্ম-সত্যটি ব্যক্ত হয়েছে—প্রাণহীন আচার ও প্রথার বন্ধন নাশো; উদার

আকাশতলে ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে সফল করো ; তাঁকে চিনতে ভুল করো না, তিনি আছেন ওই শোণপাংশুদের শ্রমে ও স্বেদে, কর্মে ও ঘর্মে, তিনি আছেন ওই অন্ত্যজ দর্ভকপল্লীতে, যেখানে মানুষের অবমাননায় তাঁরই অপমান হয়েছে এতদিন। তিনি শোণপাংশুদের দাদাঠাকুর, তিনি দর্ভকদের গোসাঁই, তিনিই অচলায়তনের আচার্য অদীনপুণ্য ও উপাচার্য সুতসোমের গুরু।

শ্রীমতী ক্যারলাইন স্পারজন বাক্‌প্রতিমার (ইমেজারি) সাহায্যে কবির ব্যক্তিত্বটি উন্মীলিত করতে চেয়েছেন। শেকসপীঅরের বাক্‌প্রতিমা আলোচনাপ্রসঙ্গে তাঁর ধারণা, 'It enables us to get nearer to Shakespeare himself, to his mind, his tastes, his experiences, and his deeper thought than does any other single way I know of studying him'. ('Shakespeare's Imagery'—Caroline Spurgeon). রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমার আলোচনায় অনুরূপ কথা বলা যায়। রবীন্দ্র-ব্যবহৃত বাক্‌প্রতিমা রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব উন্মীলনে সহায়ক। অচলায়তন নাটকে গানের বাক্‌প্রতিমাগুলি থেকে কেবল অচলায়তনের মূল বক্তব্য বা মর্মসত্যকে পাই না, সেই সঙ্গে নাট্যকারের ব্যক্তিত্বকেও সন্ধান করতে পারি।

॥ তিন

অচলায়তন নাটকে দৃশ্যসংখ্যা ছয়। যথাক্রমে—

১। অচলায়তনের গৃহ

২। পাহাড় মাঠ (শোণপাংশুদের বিচরণক্ষেত্র)

৩। অচলায়তন

৪। দর্ভকপল্লী

৫। অচলায়তন

৬। দর্ভকপল্লী

তিনটি দৃশ্যের পটভূমি বন্দীশালা অচলায়তন। বাকি তিনটি দৃশ্যে অচলায়তনের বাইরের জগৎ তার সমস্ত মুক্তি নিয়ে উপস্থিত। নাটকের সূচনা অচলায়তনের গৃহে, শেষ দর্ভকপল্লীতে। এটি তাৎপর্যপূর্ণ। নিষ্প্রাণ বিধানের কঠোর বেড়াজালে ঘেরা দৃশ্যে নাট্যের সূচনা, আর অন্ত্যজ দর্ভকদের

পল্লীতে প্রাণের মুক্তিতে নাট্যের শেষ। দৃশ্যগুলি পরম্পরাক্রমে বিন্যস্ত। প্রথমে বন্ধন (অচলায়তন), তারপর মুক্তি (পাহাড় মাঠ), তারপর ক্রমান্বয়ে বন্ধন (অচলায়তন) ও মুক্তি (দর্ভকপল্লী) এবং তার পুনরাবৃত্তি। শেষ পর্যন্ত অচলায়তনের পরাজয়—তার ধ্বংসস্তূপের উপর প্রাণের প্রতিষ্ঠা।

নাটকের গতি দ্রুত। প্রথম দৃশ্যে অচলায়তনের নিষ্প্রাণ বিধানের দাপট ও পঞ্চকের একক প্রতিবাদ। বালক সুভদ্রের পাপ (উত্তর দিকের জানলা খুলে দেখেছে পাহাড়, উদার প্রান্তরে গোচারণ), তাকে রক্ষার জন্য পঞ্চক ও আচার্য অদীনপুণ্যের প্রয়াস। দ্বিতীয় দৃশ্যে পাহাড় মাঠে শোণপাংশুদের সঙ্গে পঞ্চকের মেলামেশা—জগতের আনন্দযজ্ঞে তাদের অবাধ নিমন্ত্রণ, পঞ্চকও সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। দাদাঠাকুরের কাছে সে জীবনের আনন্দে পাঠ নিয়েছে। না না করেও পঞ্চক শোণপাংশুদের বনভোজনে যোগ দিয়েছে, 'হা রে রে রে রে রে—আমায় ছেড়ে দে রে দে রে' গান গেয়ে উঠেছে। পঞ্চকের মুখেই শোনা গেল, অচলায়তনে গুরু আসছেন। তাঁর আগমন অভ্যর্থিত, না, অনভ্যর্থিত, সেদিন জানা ছিল না। শোণপাংশুদের একজন, চণ্ডক বনের মধ্যে তপস্যা করছিল বলে স্থবিরপত্তনের রাজা মন্থরগুপ্ত তাকে কেটে ফেলেছে। তাই আজ দাদাঠাকুর চললেন স্থবিরপত্তনে অচলায়তন ধ্বংস করতে। তৃতীয় দৃশ্যে অচলায়তনে আচার্য অদীনপুণ্যের বিরুদ্ধে মহাপঞ্চকদের বিদ্রোহ ঘনীভূত হয়েছে। সুভদ্রকে মহাতামস ব্রত করতে না দেবার অর্থ তাকে মহাপুণ্য থেকে বঞ্চিত করা,—এই কথা জেনে রাজার সহায়তায় মহাপঞ্চক আচার্য অদীনপুণ্যকে দর্ভকপল্লীতে নির্বাসিত করেছে, আচার্যের সঙ্গী হয়েছে পঞ্চক। চতুর্থ দৃশ্যে দর্ভক পল্লীতে পঞ্চক ও আচার্য ভেবেছেন তাঁদের নির্বাসন সার্থক হল। অন্ত্যজ দর্ভকদের ঘৃণা করে দূরে ঠেলার দিন শেষ হয়েছে। আজ তাদের হাতের ছোঁয়া জলে স্নান ও পানে আচার্যের কোনো কুণ্ঠা নেই। গুরুর আগমনের জন্য ব্যাকুল হয়েছেন আচার্য। সুভদ্রের প্রায়শ্চিত্তকে নিষ্ঠুর বিধান বলে জেনেছেন। সুভদ্রের কান্না আজ তাঁর হৃদয়ের কান্না। আর সেই কান্নার মধ্যে গুরুর পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন আচার্য ও পঞ্চক। উপাচার্য সুভসোমও চলে এসেছেন দর্ভকপল্লীতে। এমন সময় ঘন মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে এল। বজ্রের পর বজ্র, নামল বৃষ্টি—মিটল মাটির তৃষ্ণা। দর্ভকদের উতল ধারা বাদলের গানে যোগ দিলেন আচার্য, উপাচার্য, পঞ্চক।

পঞ্চম দৃশ্য অচলায়তনে। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য। গুরু আসছেন। কিন্তু সে আগমন মহাপঞ্চকদের পক্ষে সর্বনাশা। দ্বার ভেঙেছে, প্রাচীর ভেঙেছে, দূরে দেখা যাচ্ছে শোণপাংশুদের রক্তবর্ণ টুপি। বালকদল আনন্দে নৃত্য করে। এমন সময় সকলকে স্তম্ভিত করে যোদ্ধবেশে দাদাঠাকুরের প্রবেশ। তিনিই গুরু। তিনিই শোণপাংশুদের নেতা। তিনি সকলকে নিয়ে গেলেন খোলা মাঠে, এতদিন যেখানে পদার্পণ ছিল নিষিদ্ধ। সবাই গেল, গেল না কেবল মহাপঞ্চক। ষষ্ঠ দৃশ্য নাটকের শেষ দৃশ্য। দর্ভকদলের মাঝে পঞ্চক আর আচার্য অদীনপুণ্য। তাঁরাও শুনেছেন—গুরু আসছেন। তবে সংশয় দূর হয় না। পঞ্চকের মনে একটা বাসনা—দাদাঠাকুরের সঙ্গে মিলিয়ে নেবে গুরুকে। এমন সময় দলবল নিয়ে গুরু এলেন দর্ভকপল্লীতে। পঞ্চক দেখলে, এ যে দাদাঠাকুর। দর্ভকেরা দেখলে, এ যে তাঁদের গোসাঁই-ঠাকুর। আর আচার্য চিনলেন তাঁকে, প্রণাম করে বললেন—জয়, গুরুজির জয়। আচার্য অদীনপুণ্যের প্রতি গুরুর আদেশ—'তোমার যে-কারাগারটাতে তোমায় নিজেকেই আঁটে না সেইখানে তাঁকে শিকল পরাবার আয়োজন না করে তাঁরই এই খোলা মন্দিরের মধ্যে তোমার আসন পাতবার জন্য প্রস্তুত হও'। আর পঞ্চকের প্রতি গুরুর নির্দেশ—তুমি যাও অচলায়তনে। কারাগার যা ছিল সে তো আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে মন্দির গেঁথে তুলতে হবে।' শোণপাংশুদলের প্রতি গুরুর নির্দেশ—মিলে যাও স্থবিরকদের অর্থাৎ অচলায়তনের অধিবাসীদের সঙ্গে। "সেই মিলনেই শেষ করলে চলবে না। এবার আর লাল নয়, এবার একেবারে শুভ্র। নূতন সৌধের সাদা ভিতকে আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করাও। মেলো তোমরা দুইদলে, লাগো তোমাদের কাজে।"

॥ চার ॥

অচলায়তনের গদ্যসংলাপে বাক্‌প্রতিমার অভাব নেই। এগুলির পরিচয়-সাধনের মধ্য দিয়ে নাটকের অন্তরঙ্গ পরিচয় পাই। ঘটনা ও পরিস্থিতির রূপায়ণে, পরিবেশরচনায়, চরিত্রচিত্রণে দৃশ্যাদির পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষায় বাক্‌প্রতিমার গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য। এখন দেখা যাক, অচলায়তনে গদ্য-সংলাপের বাক্‌প্রতিমা শুধু বাইরের অলংকরণ, না, নাটকের সক্রিয় ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

॥ ৪-ক ॥

প্রথম দৃশ্যে আচার্য অদীনপুণ্যের চিত্তসংশয় বিধৃত হয়েছে নিশ্চল শান্তির পাশে বর্তমানের সবল অশান্তির ছবিতে।

১। উপাচার্য সূতসোমের উক্তি :

'আমার অহোরাত্র একেবারে নিয়মে বাঁধা! সে হাজার বছরের বাঁধন। ক্রমেই সে পাথরের মতো বজ্রের মতো শক্ত হয়ে জমে গেছে। এক মুহূর্তের জন্যও কিছুই ভাবতে হয় না। এর চেয়ে শান্তি আর কী হতে পারে।'

২। আচার্য অদীনপুণ্যের উক্তি :

'অচেনার মধ্যে গিয়ে কোথায় তার অন্ত পাব। এখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যস্ত—এখানকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানকারই সমস্ত শাস্ত্রের ভিতর থেকে পাওয়া যায়—তার জন্যে একটুও বাইরে যাবার দরকার হয় না। এই তো নিশ্চল শান্তি। গুরু তুমি যখন আসবে, কিছু সরিয়ো না, কিছু আঘাত কোরো না—চারি দিকেই আমার শান্তি, সেই বুঝে পা ফেলো। দয়া কোরো, দয়া কোরো আমাদের। আমাদের পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, আমাদের আর চলবার শক্তি নেই।'

৩। উপাচার্য সূতসোমের উক্তি :

'প্রভু, আমাদের এখানে সেই প্রথম উষার বিশুদ্ধ অন্ধকারকে হাজার বছরেও নষ্ট হতে দিই নি। তারই পবিত্র অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে আমরা আচার্য এবং ছাত্র, প্রবীণ এবং নবীন, সকলেই স্থির হয়ে বসে আছি। তুমি কি বলতে চাও এতদিন পরে কেউ এসে সেই আমাদের ছায়া নাড়িয়ে দিয়ে যাবে।'

৪। আচার্য অদীনপুণ্যের উক্তি :

'আমার তো মনে হচ্ছে এই সমস্তই স্বপ্ন—এই পাথরের প্রাচীর, এই বন্ধ দরজা, এইসব নানা রেখার গণ্ডি, এই স্তূপাকার পুঁথি, এই অহোরাত্র মন্ত্রপাঠের গুঞ্জনধ্বনি—সমস্তই স্বপ্ন।'

৫। আচার্যের উক্তি :

'তোমাকে (পঞ্চককে) যখন দেখি আমি মুক্তিকে যেন চোখে দেখতে পাই।'

৬। মহাপঞ্চকের উক্তি :

'আলোকের এক রশ্মিমাত্র সে (সুভদ্র) দেখতে পাবে না। কেন না আলোকের দ্বারা যে অপরাধ অন্ধকারের দ্বারাই তার স্খালন।'

এই যড়োক্তিতে বাক্‌প্রতিমার ব্যবহার লক্ষণীয়।

নিয়মের বাঁধন = পাথরের মতো, বজ্রের মতো কঠিন।

বাইরের জীবন = অচেনা, অনভ্যস্ত, অন্তহীন অনিয়ম।

অচলায়তনের জীবন = চেনা অভ্যস্ত, প্রশ্নের স্পষ্টোত্তর সমন্বিত নিশ্চল শান্তি।

আড়ষ্ট পা = চলবার শক্তি নেই।

উষার অন্ধকার = পবিত্র অস্পষ্ট ছায়া, তা স্থির, অচঞ্চল।

স্পষ্ট প্রত্যক্ষ জগৎ = ⎫ পাথরের প্রাচীর, বন্ধ দরজা, রেখার
এ জগৎ সম্পর্কে ⎬ গণ্ডি,
স্বপ্নভ্রম (সংশয়) = ⎭ স্তূপাকার পুঁথি, মন্ত্রপাঠের গুঞ্জনধ্বনি।

মুক্তিকে চোখে দেখা = পঞ্চকের নিয়মভাঙা তারুণ্য।

অপরাধ, অন্ধকার = আলোর জগৎ থেকে বিচ্ছিন্নতা।

॥ ৪-খ ॥

দ্বিতীয় দৃশ্যে শোণপাংশুদের মাঝখানে বিদ্রোহী পঞ্চক। শোণপাংশুদের জগৎ সব দিক দিয়ে অচলায়তনের বিপরীত। স্বেদে ও শ্রমে, কর্মে ও ঘর্মে তারা থাকে মাটির কাছাকাছি। তারা দাদাঠাকুরের দল, কোনো গুরুকে মানে না।

গদ্যসংলাপে প্রথম যে বাক্‌প্রতিমার সাক্ষাৎ পাই, তা নাচের—শোণপাংশুদের নাচের বাক্‌প্রতিমা। অচলায়তনের ভূতের শাসন থেকে মুক্ত বলেই তারা নাচে, জীবনের আনন্দ আহরণে কোনো বাধা নেই। তাদের জগৎ আলোয় ভরা—তাই এই দৃশ্যে আলো আর গান, অকারণ আনন্দ আর নৃত্যের চাঞ্চল্য, উতলা বাতাস আর খেপা ঝড়, বাঁধনহারা শ্রাবণধারা আর দাবানলের নাচনের বাক্‌প্রতিমা গানে রূপ দিয়েছে।

পঞ্চকের উক্তি :

১। এরা (শোণপাংশুর দল) একটু থেমেছে অমনি সমস্ত আকাশটা যেন গান গেয়ে উঠছে।

২। এই আলোতে ভরা নীল আকাশটা আমার রক্তের ভিতরে গিয়ে কথা কচ্ছে, আমার সমস্ত শরীরটা গুন গুন করে বেড়াচ্ছে।

৩। খাঁচায় যে পাখিটার জন্ম, সে আকাশকেই সব-চেয়ে ডরায়। সে লোহার শলাগুলোর মধ্যে দুঃখ পায় তবু দরজাটা খুলে দিলে তার বুক দুর্ দুর্ করে, ভাবে, বন্ধ না থাকলে বাঁচব কী করে।

৪। আমি যখন বাইরে থেকে ফিরে যাই তিনি (আচার্য অদীনপুণ্য) আমাকে দেখলেই বুঝতে পারেন। আমাকে তখন কাছে নিয়ে বসেন, তাঁর চোখের যেন কী একটা ক্ষুধা তিনি আমাকে দেখে মেটান। যেন বাইরের আকাশটাকে তিনি আমার মুখের মধ্যে দেখে নেন।

৫। ঢেউ তোলো ঠাকুর, ঢেউ তোলো, কূল ছাপিয়ে যেতে চাই।

৬। আমি তো সেই বর্ষণের জন্যে তাকিয়ে আছি। যতদূর শুকোবার তা শুকিয়েছে, কোথাও এতটুকু সবুজ আর কিছু বাকি নেই, এইবার তো সময় হয়েছে— মনে হচ্ছে যেন দূর থেকে গুরু গুরু ডাক শুনতে পাচ্ছি। বুঝি এবার ঘননীল মেঘে তপ্ত আকাশ জুড়িয়ে যাবে, ভরে যাবে।

৭। ঠাকুর, আমার বুকের মধ্যে কী আনন্দ যে লাগছে সে আমি বলে উঠতে পারি নে। এই মাটিকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করে। ডাকো ডাকো, তোমার একটা ডাক দিয়ে এই আকাশ ছেয়ে ফেলো।

দাদাঠাকুরের উক্তি :

১। আমার মনে হয় আমি ঝরনার ধারার সঙ্গে খেলছি, সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে খেলছি।

২। যে ছেলের ভরসা নেই সে অন্ধকারে বিছানায় মাকে না দেখতে পেলেই কাঁদে। আর যার ভরসা আছে সে হাত বাড়ালেই মাকে তখনই বুক ভরে পায়। তখন ভয়ের অন্ধকারটাই আরো নিবিড় মিষ্টি হয়ে ওঠে। মা তখন যদি জিজ্ঞাসা করে, আলো চাই, ছেলে বলে তুমি থাকলে আমার আলোও যেমন অন্ধকারও তেমনি।

৩। যখন সমস্ত পাই তখনই আসল জিনিসকে পাই। সেইজন্যে ঘরে আমি দরজা দিতে পারি নে—দিনরাত্রি সব খুলে রেখে দিই।

৪। আমার মধ্যে ঢেউ উঠেছে বলেই তোমারও মধ্যে ঢেউ তুলছি।

৫। এই পাগল যে পাগলও হয়েছে শান্তিও পেয়েছে। তাই সে কাউকে খ্যাপায়, কাউকে বাঁধে। পূর্ণিমার চাঁদ সাগরকে উতলা করে যে মন্ত্রে, সেই মন্ত্রেই পৃথিবীকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে।

৬। তিনি চোখের জল মোছান, কিন্তু চোখের জল ঘোচান না।

৭। যেখানে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে না সেখানে খাল কেটে জল আনতে হয়। ওদেরও রসের দরকার হবে তখন দূর থেকে বয়ে আনবে।

৮। ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।

ঘটনাপ্রবাহের দিক থেকে দ্বিতীয় দৃশ্যের যেমন গুরুত্ব আছে, তেমনই পঞ্চক ও দাদাঠাকুরের গদ্যসংলাপে ইঙ্গিতগর্ভ বাক্‌প্রতিমার ব্যবহার। বেড়েছে। দু'জনের সংলাপে দুটি বিরোধী আদর্শের মধ্যে আসন্ন সংঘর্ষের আভাস পাই; সেই সঙ্গে স্থবিরপত্তনে অচলায়তনের বিরুদ্ধে প্রাণের বিদ্রোহ ক্রমশই দানা বেঁধে উঠেছে। বিপরীতধর্মী বাক্‌প্রতিমা উদ্ধৃত সংলাপগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে :

শোণপাংশুদের কর্মে বিরতি	আকাশ গান গেয়ে উঠেছে
খাঁচার পাখি আকাশকে ডরায়	আলোয় ভরা নীল আকাশ
খাঁচার বদ্ধ দরজা	খোলা আকাশ
চোখের ক্ষুধা	বাইরের আকাশ
নিশ্চল জীবন	ঢেউয়ে অস্থির জীবন
সবুজহীন শুষ্কতা	বর্ষণের আগমনী—মেঘের গুরু গুরু ডাক
তপ্ত আকাশ	ঘন নীল মেঘ
গানহীন প্রাণহীন অচলায়তন	আনন্দের ডাকে ভরা খোলা আকাশ ঝরনার ধারা, সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে খেলা
অন্ধকার শয্যায় ভরসাহীন ছেলের কান্না	জননীর ভরসাযুক্ত ছেলের কাছে নিবিড় মিষ্টি অন্ধকার অভ্যর্থিত
বদ্ধ জানালা, বদ্ধ দুয়ার	খোলা দরজার জগৎ—আসলকে পাবার জগৎ
	পূর্ণিমার চাঁদ, উতলা সাগর—

পাগলের পাগলামি ও শান্তি

চোখের জল মোছানো, না ঘোচানো

বৃষ্টিহীন আকাশতলে　　　　　রসের প্রয়োজনে ভরা বন্যা

খাল কেটে জল আনা

প্রাচীর আকারযুক্ত পাপ আকাশের　　　　সেই প্রাচীরকে ধুলোয়
জ্যোতিকে আচ্ছন্ন করে　　　　　লুটিয়ে দিতে হয়।

দুই বিপরীতধর্মী বাক্‌প্রতিমাগুলি পাশাপাশি সাজালে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, গানহীন প্রাণহীন নিয়ম ও আচারের অচলায়তন থেকে মুক্তিলাভের জন্য আজ স্থবিরপত্তনের পঞ্চক ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। শোণপাংশুদের কর্মচাঞ্চল্য তাকে বার বার অচলায়তনের বাইরে পাহাড়ের নীচে খোলা আকাশতলের প্রাঙ্গণে টেনে আনে। অপরদিকে স্থবিরপত্তনের রাজা মন্থরগুপ্ত যখন শোণপাংশু চণ্ডককে তপস্যা করার অপরাধে কেটে ফেলে, তখনি অচলায়তনের পাপ আকাশের জ্যোতিকে আচ্ছন্ন করতে চায়, আর সেই মুহূর্তে দাদাঠাকুরের নেতৃত্বে শোণপাংশুর দল ঐ পাপের প্রাচীর ধুলোয় গুঁড়িয়ে দিতে যাত্রা করে। অচলায়তনের দিন এবার শেষ হয়ে এলো।

॥ ৪-গ ॥

তৃতীয় দৃশ্যটি ছোট। সুভদ্রের প্রায়শ্চিত্ত-সাধন—মহাতামস ব্রত উদ্‌-যাপনের পক্ষে মহাপঞ্চকেরা, বিপক্ষে আচার্য, পঞ্চক। দু'দলে সুভদ্রকে নিয়ে টানাটানি। স্থবিরপত্তনের রাজা মন্থরগুপ্তের মুখে শোনা গেল দাদাঠাকুরের দল শোণপাংশুরা রাজ্যসীমার প্রাচীর ভাঙতে শুরু করেছে। এর জন্য দায়ী কে? —দায়ী, নিশ্চয়ই কোনো অনাচার, কোনো বিধিলঙ্ঘন। সুভদ্রের পাপই দায়ী। রাজার নির্দেশে আচার্য অদীনপুণ্যের দর্ভকপাড়ায় নির্বাসন ও আচার্যপদে মহাপঞ্চকের নিয়োগ। মূঢ় অন্ধ বিচারহীন আচারের কাছে বুদ্ধি ও যুক্তির শোচনীয় পরাভব এই ছোট দৃশ্যে দেখা যায়।

এই দৃশ্যের গদ্যসংলাপে ব্যবহৃত বাক্‌প্রতিমায় এরই ইঙ্গিত পাই।

আচার্যের উক্তি :

১। সেই জীর্ণ পুঁথির ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে কী চাইতে এসেছিলে? অমৃত বাণী? কিন্তু

আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই।

২। দেখছি হাজার বছরের নিষ্ঠুর বাহু অতটুকু শিশুর (সুভদ্র) মনকেও পাথরের মুঠোয় চেপে ধরেছে, একেবারে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিয়েছে রে।

পঞ্চকের উক্তি :

১। তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শুকনো পাতা—আয় রে নবীন কিশলয়—তোরা ছুটে আয়, তোরা ফুটে বেরো। ভাই জয়োত্তোম, শুনছ না, আকাশের ঘন নীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক উঠেছে—আজ নৃত্য কর্ রে নৃত্য কর্।

এখানেও দুই বিপরীতধর্মী বাক্‌প্রতিমার মধ্য দিয়ে অচলায়তনের প্রাণহীন জগৎ ও বাহিরের প্রাণ-হিল্লোল-পূর্ণ জগতের ছবি পাই।

জীর্ণ পুঁথির ভাণ্ডার	নবীন কিশলয়
শুষ্ক তালু, রসনায় রস নাই	নৃত্যের আবেগে অস্থিরতা
হাজার বছরের নিষ্ঠুর বাহু শিশুর	নববর্ষার সজল হাওয়ায়
মনকে পাথরের মুঠোয় চেপে ধরেছে	সব শুকনো পাতা উড়ে যায়
	ঘননীলমেঘে মুক্তির ডাক

জীর্ণ পুরাতন ও সতেজ নবীন—দুই বিপরীতকে এখানে পাশাপাশি রাখা হয়েছে। অচলায়তনের জীর্ণ পুঁথি যতই মনকে মুঠোয় চেপে ধরতে চাইছে ততই বহিঃপ্রকৃতির ডাকে মন ছুটে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। এ দুয়ের মধ্যে সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে উঠেছে। পরবর্তী দৃশ্যগুলিতে দুয়ের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটবে—এখানে তারই ইঙ্গিত। এভাবেই এইসব বাক্‌প্রতিমা নাটকের ঘটনা ও বক্তব্যকে অগ্রসর করে দিয়েছে।

॥ ৪-ঘ ॥

চতুর্থ দৃশ্যটিও বড়ো নয়। দর্ভকপল্লীতে সমস্ত শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের বাইরে জীবনের যে সহজ আনন্দ তারই স্রোতোধারায় অবগাহন করে আজ আচার্য অদীনপুণ্য, উপাচার্য সূতসোম ও পঞ্চকের দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি হল। এ শুদ্ধি মন্ত্রশুদ্ধি নয়, নামগানের শুদ্ধি। গদ্যসংলাপে ব্যবহৃত বাক্‌প্রতিমায় তারই

আচার্যের উক্তি :

১। (দর্ভকদের গান) শুনতে শুনতে আমার মনে হল যেন একটা পাথরের দেহ গলে গেল।

২। ভাবছি আমাদের গুরু আসবেন কবে। জঞ্জাল সব ঠেলে ফেলে দিয়ে আমাদের প্রাণটাকে একেবারে সরল করে দিন।

৩। তার (সুভদ্রের) কান্নাটা এমন করে আমাকে বেজেছে কেন জান। সে যে কান্না রাখতে পারে না তবু কিছুতে মানতে চায় না সে কাঁদছে।

৪। ওরা (মহাপঞ্চকের দল) ওদের দেবতাকে কাঁদাচ্ছে। সেই দেবতারই কান্নায় এ রাজ্যের সকল আকাশ আকুল হয়ে উঠেছে। তবু ওদের পাষাণের বেড়া এখনও শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেল না।

৫। ওই যে নেমে এল বৃষ্টি--পৃথিবীর কতদিনের পথ-চাওয়া বৃষ্টি—অরণ্যের কত রাতের স্বপ্ন-দেখা বৃষ্টি।

৬। আমাদেরও এমন করে ডাকতে হবে—বজ্ররবে যিনি দরজায় ঘা দিয়েছেন তাঁকে ঘরে ডেকে নাও—আর দেরি কোরো না।

পঞ্চকের উক্তি :

১। নির্বাসন, আমার নির্বাসন রে! বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি। কিন্তু এখনও মনটাকে তার খোলসের ভিতর থেকে টেনে বের করতে পারছি না কেন?

২। দে ভাই, আমার মন্ত্রতন্ত্র সব ভুলিয়ে দে, আমার বিদ্যাসাধ্যি সব কেড়ে নে, দে আমাকে তোদের ঐ গান শিখিয়ে দে।......ও ভাই আর একটা শোনা—অনেক দিনকার তৃষ্ণা অল্পে মেটে না।

৩। কেবল ভালো করে না ডাকতে পেরেই আমাদের বুকের ভিতরটা এমন শুকিয়ে এসেছে, একবার খুব করে গলা ছেড়ে ডাকতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু গলা খোলে না যে—রাজ্যের পুঁথি পড়ে পড়ে গলা বুজে গিয়েছে প্রভু। এমন হয়েছে আজ কান্না এলেও বেধে যায়।

৪। মনে হচ্ছে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্ছি, কোথায় যেন বর্ষা নেমেছে।

৫। আমরা তাঁকে (দেবতাকে) সকলে মিলে কত কাঁদালুম তবু তাড়াতে পারলুম না। তাঁকে যে-ঘরে বসালুম সে-ঘরের আলো সব নিবিয়ে দিলুম—তাঁকে আর দেখতে পাই নে—তবু তিনি সেখানে বসে আছেন।

৬। আঃ দেখতে দেখতে কী মেঘ করে এল। শুনছ আচার্যদেব, বজ্রের পর

বজ্র! আকাশকে একেবারে দিকে দিকে দগ্ধ করে দিলে যে।

৭। মিটল এবার মাটির তৃষ্ণা—এই যে কালো মাটি—এই—সকলের পায়ের নিচেকার মাটি।

চতুর্থ দৃশ্যের এইসব বাক্‌প্রতিমা নাটকের বক্তব্যকে অগ্রসর করে দিয়েছে। শুষ্ক পুঁথি পড়ে পড়ে গলা বুজে গিয়েছে, মন শুকিয়ে গিয়েছে, প্রাণের কান্না আর আনন্দ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কান্না অস্বীকারের চাপাকান্নায় মানুষের অপমৃত্যু ঘটেছে। সেই শুষ্কতার রাজ্যে মাটি তৃষাদীর্ণ, আকাশ কান্নায় আকুল। পাষাণ তপ্ত, তা শতধা বিদীর্ণ হবার অপেক্ষায় আছে। গুরু আসছেন, মনের তৃষ্ণায় চিত্ত হয়েছে অশান্ত। এমন সময় আকাশে দেখা দিল ঘন নীল মেঘ। তারপর বজ্রের পর বজ্র আকাশকে দগ্ধ করে দিল, তারপরই নামল বৃষ্টি—কতদিনের প্রার্থিত বৃষ্টি—কতো তৃষ্ণার শান্তি, কতো স্বপ্নের সার্থকতা, কতো কান্নার অবসান! আনন্দগানে চিত্ত উঠল ভরে। পাশাপাশি বিপতরীধর্মী বাক্‌প্রতিমা সাজালেই নাটকের মর্মসত্যটি ব্যক্ত হয়।।

গানহীন শুষ্ক পাথর	পাথরের দেহ গানে বিগলিত
জঞ্জালে আকীর্ণ জীবন	জঞ্জাল ঠেলে প্রাণবন্যায় গুরুর আগমন
সুভদ্রের কান্না দেবতার কান্না	আকুল আকাশের কান্না
তপ্ত পাষাণ	বজ্ররবে বিদীর্ণ আকাশ
শুষ্ক চিত্তক্ষেত্র	পৃথিবীর কতদিনের পথ-চাওয়া বৃষ্টি, অরণ্যের কত রাতের স্বপ্ন-দেখা বৃষ্টি
রাজ্যের পুঁথি পড়ে পড়ে রুদ্ধ কণ্ঠে কান্না বেজে ওঠে না	প্রাণহীন পুঁথির রাজ্য থেকে নির্বাসন
মন্ত্রতন্ত্র বিদ্যাসাধ্যির খোলস	খোলসের ভিতর থেকে মনের মুক্তি
শুষ্ক কণ্ঠ—কান্না নেই গান নেই	কান্না আর গানে ভরা মুক্ত কণ্ঠ
অন্ধকার রুদ্ধ ঘর	ভিজে মাটির গন্ধ
মাটির তৃষ্ণা	কালো মাটির তৃষ্ণার শান্তি বারিধারা

যখন বৃষ্টি নামল তখনি তৃষাদীর্ণ মাটির বেদনা দূর হল। যখন পুঁথি পড়া শুষ্ক চিত্তক্ষেত্রে ঐশী করুণাবন্যা প্রবাহিত হল তখনি প্রাণ জেগে উঠল।—এই মর্মসত্যটি এখানে বিপরীতধর্মী বাক্‌প্রতিমাগুলিতে রূপায়িত হয়েছে।

॥ ৪-ঙ

নাট্যপরিণতিবিচারে পঞ্চম দৃশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অচলায়তনে গুরু দেখা দিলেন। দৈবজ্ঞদের ঘোষণা, মন্ত্র ও শাস্ত্রীয় আচারকে অগ্রাহ্য করে গুরু এলেন। ভেঙে পড়েছে সহস্রাব্দের পাথরের প্রাচীর আর লোহার দরজা, আলোয় ভরে গেছে স্থবিরপত্তন রাজ্য। বালকদের খুশিতে সে আলোর প্রতিষ্ঠা। এতো আলো, এতো মজা, এতো পাখির ডাক, এতো অকারণ খুশি! সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে গুরু এসে পৌঁছলেন। শোণপাংশুদের নেতারূপে দাদাঠাকুর এলেন, দেখা গেল তিনিই প্রত্যাশিত গুরু। আজ তাঁর যোদ্ধবেশ—সব নিয়মশাসন নিষেধের বেড়াজাল ভেঙে তিনি দেখা দিলেন। আজ ধ্বনিত হল নোতুন মন্ত্র—শোণপাংশুদের গান—'তাঁরি বিপুল ছন্দে ছন্দে, মোরা যাই চলে আনন্দে'—অচলায়তনের প্রাচীর আর দরজা মাটিতে লুটিয়েছে। হার হল মহাপঞ্চকের, জয় হল দাদাঠাকুরের।

দ্রুতগতি পঞ্চম দৃশ্যে ঘটনার ঘনঘটা। যোদ্ধবেশে সজ্জিত দাদাঠাকুর সশস্ত্র শোণপাংশুর দল নিয়ে প্রাচীর ভেঙে অচলায়তনে প্রবেশ করেছেন। আজ সমস্ত বাধানিষেধের অবসান। ছেলেদের অকারণ খুশিতে মুক্তির আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে। দাদাঠাকুর একদিকে, মহাপঞ্চক অন্যদিকে। মহাপঞ্চকের প্রতি দাদাঠাকুরের উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ: 'আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না—আমি তোমাকে প্রণত করব।' আর 'আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেছি।' খুশিতে ভরা ছেলেদের দু'একটি উক্তি সমগ্র দৃশ্যের মধ্যে উজ্জ্বল পংক্তিরূপে দেখা দিয়েছে: 'দেখছ না সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এসেছে।' আর 'মনে হচ্ছে ছুটি—আমাদের ছুটি।' এই ছুটি ও মুক্তির আনন্দ বালকদের সম্মেলক গানে ব্যক্ত: 'আলো, আমার আলো, ওগো আলো ভুবন ভরা। আলো নয়ন-ধোওয়া আমার আলো হৃদয়হরা।'

॥ ৪-চ ॥

ক্ষুদ্রপরিসর দ্রুতগতি পঞ্চম দৃশ্য উত্তীর্ণ হয়ে আমরা ষষ্ঠ (শেষ) দৃশ্যে উপনীত হই। এই দৃশ্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, গতি মন্থর, গানের সংখ্যা দুই,

এবং পঞ্চম দৃশ্যে যার অনটন, সেই বাক্‌প্রতিমার অভাব নেই। দর্ভকপল্লীতে গুরু ওরফে দাদাঠাকুর ওরফে গোসাঁই সকলকে মেলালেন, অন্ত্যজ দর্ভকদের হাতে অন্ন গ্রহণ করলেন। আচার্য অদীনপুণ্য ও পঞ্চকের স্বপ্নকামনা সফল করলেন, সবাইকে মিলিয়ে অচলায়তনের ধ্বংসস্তূপের উপর নোতুন সৌধ পত্তনের আদেশ দিলেন।

এই দৃশ্যের বাক্‌প্রতিমাগুলিতে আলোর প্রাধান্য, যা সহস্রাব্দের আঁধারকে পরাভূত করে। আর আছে বন্ধনমুক্তি, কারামুক্তি, শৃঙ্খলমুক্তির ইমেজ। এ দৃশ্যে দাদাঠাকুরের সংলাপে ব্যবহৃত বাক্‌প্রতিমাগুলির শিল্পগুরুত্ব সর্বাধিক।—

১। যিনি তোমাকে মুক্তি দেবেন তাঁকেই তুমি কেবল বাঁধবার চেষ্টা করেছ।

২। যিনি সব জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে বসে আছেন তাঁকে একটা জায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।

৩। তোমার যে-কারাগারটাতে তোমার নিজেকেই আটে না সেইখানে তাঁকে শিকল পরাবার আয়োজন না করে তাঁরই এই খোলা মন্দিরের মধ্যে তোমার আসন পাতবার জন্য প্রস্তুত হও।

৪। যে-চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকেই বের করে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেছি।

৫। অচলায়তনে আর সেই শান্তি দেখতে পাবে না। তার দ্বার ফুটো করে দিয়ে আমি তার মধ্যেই লড়াইয়ের ঝোড়ো হাওয়া এনে দিয়েছি। নিজের নাসাগ্রভাগের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে থাকবার দিন এখন চিরকালের মতো ঘুচিয়ে দিয়েছি।

৬। এতদিন ঘর বন্ধ করে অন্ধকারে ও মনে করছিল চাকাটা খুব চলছে, কিন্তু চাকাটা কেবল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরছিল তা সে দেখতেও পায় নি। এখন আলোতে তার দৃষ্টি খুলে গেছে।

৭। ভাবনা নেই—আনন্দের বর্ষা নেমে এসেছে—তার ঝর ঝর শব্দে মন নৃত্য করছে আমার। বাইরে বেরিয়ে এলেই দেখতে পাবে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। ঘরে বসে ভয়ে কাঁপছে কারা। এ ঘনঘোর বর্ষার কালো মেঘে আনন্দ, তীক্ষ্ণ বিদ্যুতে আনন্দ, বজ্রের গর্জনে আনন্দ। আজ

মাথার উষ্ণীষ যদি উড়ে যায় তো উড়ে যাক, গায়ের উত্তরীয় যদি ভিজে যায় তো যাক—আজ দুর্যোগ একে বলে কে। আজ ঘরের ভিত যদি ভেঙে গিয়ে থাকে থাক না—আজ একেবারে বড়ো রাস্তার মাঝখানে হবে মিলন।

পঞ্চকের উক্তি :

১। কাল সমস্ত রাত মনে হচ্ছিল চারদিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ভেঙেচুরে পড়ছে। ঘুমের ঘোরে ভাবছিলুম স্বপ্ন বুঝি।

২। আমার প্রাণ ডাকছে। একটা কিসের মায়াতে মন জড়িয়ে রয়েছে প্রভু। যেন কেবলই স্বপ্ন দেখছি—আর যতই জোর করছি কিছুতেই জাগতে পারছি নে।...একেবারে লড়াইয়ের মাঝখানে গিয়ে পড়তে না পারলে কিছুতেই এ ঘোর কাটবে না।

৩। এখন তুমি আছ ভাই আর আমি আছি। দুজনে মিলে কেবলই উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিমের সমস্ত দরজা-জানালাগুলো খুলে খুলে বেড়াব।

আচার্য অদীনপুণ্যের উক্তি :

১। আমার সমস্ত চিত্ত শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে—আমাকে আমারই এই পাথরের বেড়া থেকে বের করে আনো। আমি কোনো সম্পদ চাই নে —আমাকে একটু রস দাও।

দাদাঠাকুর, পঞ্চক ও আচার্যের উক্তিগুলিতে বাক্‌প্রতিমার বিপরীতধর্মী ইমেজের মধ্যে দিয়ে বন্ধনমুক্তির ভাবটি বড়ো হয়ে উঠেছে।

যিনি মুক্তিদাতা	তাঁকে বাঁধবার প্রয়াস
যিনি সর্বত্র ধরা দিয়েছেন	তাঁকে এক জায়গায় বাঁধতে গেলে হারাতে হয়
নিজের তৈরী কারাগার	খোলা আকাশতলের মন্দির
অভ্যাসের চক্র ঘুরিয়ে মারে	চক্র থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্বের সোজা পথে যাত্রা
অচলায়তনের নিশ্চল শান্তি ও ধ্যানের অবসান	লড়াইয়ের ঝোড়ো হাওয়ায় প্রাচীর গেল ভেঙে
দ্বাররুদ্ধ ঘরে আঁধারে দৃষ্টি ব্যাহত হয়	আলোতে দৃষ্টি খুলে যায়
শুষ্ক চিত্ত, তপ্ত পাথর, তৃষাদীর্ণ মাটি	আনন্দের বর্ষার ধারাপতন—আনন্দ

	কালো মেঘে, তীক্ষ্ণ বিদ্যুতে, বজ্রের গর্জনে
পাথরের বেড়ার বন্ধন	বন্ধনমুক্তিতে রসের প্রাপ্তি
ঘরের ভিত ভেঙে যায়	বড়ো রাস্তার মাঝখানে মিলন ঘটে
বন্ধ দুয়ার জানলা	চারদিকের বন্ধ দুয়ার জানলা খুলে দেওয়া
ঘুমের ঘোর, স্বপ্নমোহ	লড়াইএর মাঠে মোহাবসান, চিত্তের জাগরণ

অচলায়তন নাটকের মর্মসত্য এইসব বাক্‌প্রতিমায় ব্যক্ত হয়েছে। নাট্যকার এখানে প্রকৃতি থেকে মুক্তির ইমেজ সংগ্রহ করেছেন, আর মানুষের তৈরী নানা সৃষ্টিকে (চক্র, ঘর, পাথরের বেড়া, রুদ্ধদ্বার, জানালা) বন্ধনের ইমেজ-রূপে দেখেছেন। সংকীর্ণ ঘরের ভিত ভেঙে বড়ো রাস্তার মাঝখানে যখন মানুষ উপনীত হয়, তখনই অচলায়তনের বন্ধন থেকে সে মুক্তি পায়—এই সত্য এখানে প্রতিষ্ঠিত। এটাই নাটকের মূল বক্তব্য। শ্রুতি ও দৃষ্টিনির্ভর বাক্‌প্রতিমাগুলি (ঝোড়ো হাওয়া, আলোর বন্যা, বর্ষার ধারাপতন, মেঘের ও বজ্রের গর্জন, তীক্ষ্ণ বিদ্যুচ্চমক) মুক্তির দ্যোতক। বন্ধনমুক্তিতে জীবনের আনন্দ ও রসের প্রাপ্তি : এই বক্তব্য এইসব বাক্‌প্রতিমায় স্পষ্ট রেখান্বিত।

অচলায়তন নাটকে রবীন্দ্রনাথ গান ও গদ্যসংলাপে যেসব বাক্‌প্রতিমা ব্যবহার করেছেন, সেগুলি নাটকের মর্মসত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছে, দৃশ্য ও নাট্যপরিস্থিতিকে রূপ দিয়েছে, পরিবেশ রচনায় সহায়তা করেছে এবং চরিত্রচিত্রণে সহায়ক হয়েছে। এইসব বাক্‌প্রতিমা নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বকেও উন্মীলিত করেছে। এদের শিল্পগুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য।

॥ পাঁচ ॥

অচলায়তন নাটকের গুরু-চরিত্র সম্পর্কে এখনো মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কিন্তু এ চরিত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে কেউ সংশয় প্রকাশ করেন নি। অচলায়তনের জীবনে পরিবর্তনের মূলে আছেন গুরু। তিনি নাটকের আর সব চরিত্রের উপরে।

তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য—"শুধু রূপের দাসখৎ মানুষের সকলের

অধম দুর্গতি। যাঁহারা মহাপুরুষ তাঁহারা মানুষকে এই দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিতে আসেন। তাই অচলায়তনে এই আশার কথাই বলা হইয়াছে যে, যিনি গুরু তিনি সমস্ত আশ্রয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়া একটা শূন্যতা বিস্তার করিবার জন্য আসিতেছেন না; তিনি স্বভাবকে জাগাইবেন, অভাবকে ঘুচাইবেন, বিরুদ্ধকে মিলাইবেন—যেখানে অভ্যাসমাত্র আছে সেখানে লক্ষ্যকে উপস্থিত করিবেন, এবং যেখানে তপ্তবালু বিছানো খাদ পড়িয়া আছে মাত্র সেখানে প্রাণ পরিপূর্ণ রসের ধারাকে বহাইয়া দিবেন।"

গুরু-চরিত্র সম্পর্কে নাট্যকারের বক্তব্য এখানেই শেষ নয়। গুরুর ভূমিকার গুরুত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেছেন,—"অচলায়তনের গুরু কি ভাঙ্গিবার কথাতেই শেষ করিয়াছেন, গড়িবার কথা বলেন নাই? পঞ্চক যখন তাড়াতাড়ি বন্ধন ছাড়াইয়া উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল তখন তিনি কি বলেন নাই,—না, তা যাইতে পারিবে না—যেখানে ভাঙ্গা হইল এইখানেই আবার প্রশস্ত করিয়া গড়িতে হইবে। গুরুর আঘাত নষ্ট করিবার জন্য নহে, বড় করিবার জন্যই। তাঁহার উদ্দেশ্য ত্যাগ করা নহে, সার্থক করা।"

রবীন্দ্রনাথের এইসব মন্তব্য থেকে অনুধাবন করা যায়, গুরু-চরিত্রকে তিনি নাটকের মুখ্য প্রবক্তা রূপে, অচলায়তনের দুর্গতির উদ্ধারকর্তারূপে দেখেছেন। গুরু-চরিত্র সম্পর্কে আজ পর্যন্ত পরস্পর-বিরোধী সমালোচনা হয়েছে। এই চরিত্র খুব বিশ্বাস্য নয়, এমন অভিমত কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন। যিনি শোণপাংশুদের দাদাঠাকুর ও দর্ভকদের গোসাঁইঠাকুর, তিনিই আচার্য অদীনপুণ্যের শ্রদ্ধাভাজন গুরু: তাঁর এই মহনীয় রূপটি যথাযোগ্য রূপে বিচিত্রিত নয় বলে কেউ কেউ মনে করেন। গুরুর আগমনকে কেন্দ্র করে যে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা অচলায়তনে ও দর্ভকপল্লীতে দেখা গিয়েছে তা যথোচিত কিনা, সে বিষয়ে সংশয় ব্যক্ত হয়েছে। কেবল মাঝে মাঝে আচার্য অদীনপুণ্যের উক্তিতে গুরু চরিত্রের রহস্যময়তা ও মাহাত্ম্যের তির্যক প্রকাশ ঘটেছে বলে কেউ কেউ মনে করেন।

গুরু-চরিত্র সম্পর্কে এই সংশয় কতদূর গ্রাহ্য?

গুরু ওরফে সদানন্দ মুক্ত পুরুষ দাদাঠাকুরের কণ্ঠে দুটি গান সংযোজিত। এই দুটি গানের মাধ্যমে দাদাঠাকুর চরিত্রের যে পরিচয় ব্যক্ত, তা গুরু-চরিত্রের গুরুত্ব ও রহস্যময়তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, তা বিচার্য।

দাদাঠাকুরের দুটি গানই দ্বিতীয় দৃশ্যে সংযোজিত। এই দুটি গানের

অব্যবহিত পূর্বে শোণপাংশুদের চতুর্থ সম্মেলক গানে দাদাঠাকুরের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই একলা মোদের হাজার মানুষ দাদাঠাকুর।
এই আমাদের মজার মানুষ দাদাঠাকুর ॥

দাদাঠাকুর যে মুক্ত প্রাণের অধিকারী, তিনিই যে সকলের মজার মানুষ (আনন্দের উৎস), মনের মানুষ (অন্তর সঙ্গী), সকল ক্ষণের মানুষ (নিত্য-সঙ্গী), হাজার মানুষ (সকলের সঙ্গী)—এই ভাবটি এই গানে ব্যক্ত। মুক্তির পটে তাঁর প্রতিষ্ঠা। ঘর থেকে বাহিরে নানা সাজে নানা কাজে তিনি ধরা দেন।

দাদাঠাকুরের প্রথম গান—'যা হবার তা হবে / যে আমাকে কাঁদায় সে কি অমনি ছেড়ে রবে / পথ হতে যে ভুলিয়ে আনে / পথ যে কোথায় সেই তা জানে / ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাড়ায় সেই তো ঘরে লবে।"

মুক্ত পুরুষ দাদাঠাকুরের পরিচয় এখানে ব্যক্ত। ঘর ছেড়ে পথে যাবার আনন্দ এখানে ধ্বনিত। সেই সঙ্গে আছে মানবিক আবেগ—ক্রন্দনের আনন্দ। অচলায়তনের বন্ধনমুক্তির ইঙ্গিত এই মুক্ত পুরুষের গানে ব্যঞ্জিত।

দাদাঠাকুরের দ্বিতীয় গান—'বুঝি এল বুঝি এল ওরে প্রাণ / এবার ধর দেখি তোর গান / ঘাসে ঘাসে খবর ছোটে ধরা বুঝি শিউরে ওঠে / দিগন্তে ঐ স্তব্ধ আকাশ পেতে আছে কান।'

এই গানে প্রাণের আহ্বান প্রকৃতির চাঞ্চল্যে ব্যক্ত। চঞ্চল ঘাস, শিউরে ওঠা ধরণী, উৎকর্ণ আকাশ, বনের মর্মর, কাঁপন-লাগা পাতা—প্রকৃতির এইসব উপাদান অচলায়তনের নোতুন জীবনের সঙ্কেত বহন করে এনেছে। দাদাঠাকুর প্রাণের মুক্তির সংবাদ নিয়ে এসেছেন—এ সত্য এখানে প্রতিষ্ঠিত। অরণ্যমর্মরে যে ক্রন্দনধ্বনি, তা বুঝি বদ্ধ প্রাণের মুক্তিকামনার ক্রন্দন—এই ইঙ্গিত এখানে রূপায়িত।

নাটকের পরিণতিতে দাদাঠাকুরের mission সফল হয়েছে, যখন অচলায়-তনের প্রাচীর ও লোহার দরজা ভেঙে গেছে, সহস্রাব্দের অন্ধ আচার ও বিধানের অবসান হয়েছে, বাইরের আলো হাওয়া বহুকালের সঞ্চিত অন্ধকারকে দূর করে দিয়েছে। প্রাণহীন আচার ও গানহীন জীবনের অন্ধ প্রহর গণনা শেষ হয়েছে, অচলায়তনের ধ্বংসস্তূপের উপরে প্রাণের শুভ্র সৌধ স্থাপিত হয়েছে। এই জয় গুরুর জয়, আর সে জয়ের অর্থ—তিনি যাদের

দাদাঠাকুর ও গোসাঁইঠাকুর, সেই অন্ত্যজ সাধারণ মানুষের জয়। এখানেই গুরু-চরিত্রের সার্থকতা।

'অচলায়তন' নাটকের (১৯১২) সংস্কৃত রূপ 'গুরু' নাটকে (১৯১৮) গুরু-চরিত্রের প্রাধান্য নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত।

আচার্য অদীনপুণ্যের দুটি উক্তিতে (প্রথম দৃশ্য) গুরুর মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব প্রথম উচ্চারিত।

১। যেদিন পত্র পেয়েছি গুরু আসছেন সেইদিন থেকে মনকে আর যেন চুপ করিয়ে রাখতে পারছি নে। সে কেবলই আমাদের প্রতিদিনের সকল কাজেই বলে বলে উঠছে—বৃথা, বৃথা, সমস্তই বৃথা।

২। তিনি পুঁথি নন, শাস্ত্র নন, বৃত্তি নন, তিনি গুরু।

সারা নাটক জুড়ে এই মানবিক ব্যাকুলতারই প্রতিষ্ঠা।

কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার

কটক শহরে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে এক অন্ধ মহারাষ্ট্রীয় কবি এসেছিলেন। তাঁর কাব্যরচনা-পরীক্ষা-সভায় বহু কবিযশঃপ্রার্থীদের মধ্যে এক তরুণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ছাব্বিশ বৎসর বয়সের সেই তরুণ কবি "বর্বর্তি সোঽত্র ভগবান্ জগদীশ্বরোঽয়ম্" এই চরণটি পাদ-পূরণের জন্য রচনা করে দিয়েছিলেন। বিস্মিত অন্ধ কবি ও সভাজন এই তরুণের মুখে শুনেছেন 'ঈশস্তুতিঃ'—

যস্যোচ্ছয়ানলময়াচ্চলবাষ্প পিণ্ডাৎ
জাতা বিবর্তনবশাৎ সুখদা ধরিত্রী
যস্যৈব শৈববিধয়ঃ প্রভবন্তি লোকে
বর্বর্তি সোঽত্র ভগবান্
জগদীশ্বরোঽয়ম্।

এইভাবে আরো তিনটি স্তবক অপরিচিত তরুণ সভামধ্যে রচনা করে শোনালেন। প্রতি স্তবকের শেষ চরণে "বর্বর্তি সোঽত্র ভগবান্ জগদীশ্বরোঽয়ম্" ধ্রুবপদরূপে দেখা দিয়েছে।

এই অখ্যাত তরুণ হলেন কবি-মনীষী বিজয়চন্দ্র মজুমদার। 'ঈশস্তুতিঃ' তাঁর প্রথম রচনা। পরবর্তী অর্ধশতাব্দী কাব্যপ্রতিভা ও মনীষার যৌগপদ্যে জাত কবিতার কাল। রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষপূর্তি বৎসরে বিজয়চন্দ্র জন্মশতবর্ষ-পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনযাত্রা শুরু করেছিলেন, যাত্রা সমাপ্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই। বিজয়চন্দ্র মজুমদারের জন্ম ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৬১, মৃত্যু ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ খ্রীঃ। রবীন্দ্রনাথের অল্প কিছুদিন পরে বিজয়চন্দ্র জন্মেছেন, রবীন্দ্র-তিরোভাবের পর বৎসর তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন। দীর্ঘ একাশি বছরের জীবনসাধনায় বিজয়চন্দ্র পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যে 'রিক্থ' রেখে গেছেন, আমরা অদ্যাবধি তার যোগ্য ব্যবহার করতে পারি নি।

বিজয়চন্দ্র শুধু কবি নন, তিনি 'কবির্মনীষী'। শাস্ত্রে এই অভিধায় যাঁদের ভূষিত করা হয়, তাঁরা কেবল বহুবিদ্যাপারঙ্গম নন, সেই সঙ্গে মৌলিক চিন্তা

ও গভীর ধ্যানদৃষ্টির অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী প্রতিভার দ্যুতিতে বাংলা কাব্যলোক উদ্ভাসিত হয়েছিল অর্ধশতাব্দী পর্বে (১৮৯০-১৯৪০)। যাঁরা রবি-প্রদর্শিত কাব্যপথের বাইরে যাবার প্রয়াস করেছিলেন, তাঁরা অনেকেই আজ আর কবিপ্রতিভার পূর্ণ মূল্য পান না। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোবিন্দ-চন্দ্র দাস, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং বিজয়চন্দ্র মজুমদার এই বক্তব্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বিজয়চন্দ্র কাব্যধর্মে দ্বিজেন্দ্রলালের সহযোগী, বোধ করি সে-কারণেই আমরা তাঁকে ভাল করে চিনতে পারি নি।

বিজয়চন্দ্র ধীমান পুরুষ ছিলেন। জীবনের প্রথমার্ধে তিনি ওড়িশায় অতিবাহিত করেছেন। কটকে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়, আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সম্বলপুরে আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন। সেই সঙ্গে ওড়িশার রাজন্যবর্গের আইন-উপদেষ্টা ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে তিনি অন্ধ হয়ে যান। অন্ধত্বকে তিনি অভিশাপ মনে করেন নি, বিধাতার দান বলে শান্ত মনে গ্রহণ করেছিলেন। অন্ধ বিজয়চন্দ্র স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচীন ভারত-সংস্কৃতির অধ্যাপনা করেন ও আশুতোষ-প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গবাণী' মাসিকপত্র সম্পাদনা করেন।

মনে হয় গত শতাব্দীর বাঙালী মনীষীদের যোগ্য উত্তরাধিকারীরূপে বিজয়চন্দ্র আমাদের শতাব্দে বর্তমান ছিলেন। অন্ধত্বের অভিশাপে তিনি ভেঙে না পড়ে আমৃত্যু জ্ঞানসাধনায় নিজেকে ব্যাপৃত করে রেখেছিলেন। মুণ্ডা, ওড়িয়া, পালি, প্রাকৃত, সংস্কৃত, ইংরেজী ভাষায় বিজয়চন্দ্রের দখল ছিল। নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্যে তাঁর স্বচ্ছন্দ অধিকার ছিল। সেই সঙ্গে কাব্যসুন্দরীর করুণা লাভ করেছিলেন।

বর্তমানের পরিশ্রমবিমুখতা, অসহিষ্ণুতা, শ্রদ্ধাহীনতা, লোভ, ঈর্ষা, মাৎসর্য ও অল্পবিদ্যাদম্ভের বাতাবরণে বিজয়চন্দ্রের নিষ্ঠা ও সাধনা আমাদের চমকিত করে। তাঁর রচনাবলীর তালিকা-দৃষ্টে এই বক্তব্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। আমার জানা বিজয়চন্দ্র-রচনার তালিকা দিচ্ছি। মৌলিক কবিতা : 'কবিতা' (১৮৮৯), 'যুগপূজা' (১৮৯২), 'কথা ও বীথি' (১৮৯৫), 'যজ্ঞভস্ম' (১৯০৪), 'ফুলশর' (১৯০৪), 'পঙ্কজমালা' (১৯১০), 'হেঁয়ালি' (১৯১৫), 'রুচিরা' (১৯৩৭), 'খেলাধুলা' (শিশুকবিতা)॥ অনুবাদ-কবিতা : 'বুদ্ধচরিত' (১৯০৩), 'সুত্তপিটক ক্ষুদ্দনিকায় উদানম্' (১৯১৩), 'থেরীগাথা,' 'গীত-

গোবিন্দ,' 'সচ্চিদানন্দ-গ্রন্থাবলী' ॥ সংকলন ও সম্পাদনা : 'টিপিক্যাল সিলেকশন্‌স্ ফ্রম্ ওড়িয়া লিটারেচার' (তিনখণ্ড । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ॥ ইংরেজি রচনা : 'দি হিস্ট্রি অফ্ বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ' (১৯২০ । কলিঃ বিশ্বঃ), 'ওড়িষ্যা ইন দি মেকিং' (স্যার এডোয়ার্ড গেইট-লিখিত ভূমিকা-সংবলিত (১৯২৫ । কলিঃ বিশ্বঃ), 'সোনপুর ইন দি সম্বলপুর ট্র্যাক্ট' (১৯১১), 'দি চোহান রুলারস্ অফ্ সোনপুর', 'দি এবরোজিন্‌স অফ্ দি হাইল্যাণ্ডস অফ্ সেন্‌ট্রাল ইণ্ডিয়া' (১৯২৭ । কলিঃ বিশ্বঃ), 'এলিমেন্টস্ অফ সোশ্যাল অ্যানথ্রপলজি' (১৯৩৬ । কলিঃ বিশ্বঃ) ।

বিজয়চন্দ্র-মনীষার বহুমুখিতা, রসগ্রাহিতা, নিষ্ঠা ও সাধনার পরিচায়ক এই গ্রন্থতালিকা । এছাড়া বিজয়চন্দ্রের আরো লেখা নব্যভারত, বঙ্গবাণী প্রভৃতি পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে ।

অন্ধ মহারাষ্ট্রীয় কবির রচনা-পরীক্ষা সভায় সংস্কৃতে 'ঈশস্তুতিঃ' রচনা করে যিনি কবিতাসাধনা শুরু করেন, তিনি উত্তরজীবনে অন্ধ হয়ে যাবেন তাই কি ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল ? বিজয়চন্দ্র যে শান্ত ধৈর্য ও অবিচলিত ভক্তিতে অন্ধত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন, তা জেনে আশ্চর্য হই । বার বার মিল্‌টন্-এর 'অন হিজ্ ব্লাইণ্ডনেস' কবিতাটি মনে পড়ে । মিল্‌টনের মতোই বিজয়চন্দ্র শান্ত ধৈর্যে ঈশ্বরের আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করেছেন । অপর বাঙালি অন্ধ-কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে অন্ধ হয়ে যান । জীবনের এই নব সূচনায় তিনি 'বিভু, কি দশা হবে আমার' কবিতায় বিলাপ করেছিলেন । ঈশ্বরের কাছে তাঁর সখেদ নিবেদন,

বৃথা এবে এ জীবন,
হয় না কেন এখন
বৃথা রাখা ধরণীর ভার ।
ধন নাই বন্ধু নাই,
কোথায় আশ্রয় পাই,
তুমিই হে আশ্রয়ের সার ।
জীবনের শেষকালে
সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার—
বিভু ! কি দশা হবে আমার ?

বিজয়চন্দ্র ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে অন্ধ হয়ে যান। তাঁর অন্ধত্বের বিষয়ে লেখা কবিতায় হেমচন্দ্রের খেদ, বিলাপ, দুর্ভাগ্যের জন্য হাহাকার নেই। মিল্‌টনের মতো বিজয়চন্দ্র ব্যক্তিগত দুঃখকে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। সকল ক্ষোভ ও বিলাপ পরিত্যাগ করে নির্বেদ, প্রশান্তি ও একান্ত-নির্ভরতায় উপনীত হয়ে নিরুত্তাপ শান্তগম্ভীর কণ্ঠে বলেছেন, 'অন্ধের নিবেদন'-এ—

আঁধার ঘরের মাঝে
আমার সাঁঝের বাতি জ্বেলে দাও।
ভেঙ্গে গেছে মাটির গড়া
পুরানো সেই দেল্‌কো-শরা;
আন কিরণ হিরণ-রুচি
খোলামকুচি ফেলে দাও।
কুলগ্নে আজ কি কালরাত্রি
আস্‌চে মাগো জগদ্ধাত্রী!
তোমার অভয় হাস্য
আমার অমাবস্যায় ঢেলে দাও।
বিশ্বজনে করে সাথী
চল্‌ব আমি, জ্বলবে বাতি;
পথের বাধা আঁধার রাতি
পিছন পানে ঠেলে দাও।

জীবনে নোতুন বিশ্বাস, প্রকৃতিতে নোতুন সৌন্দর্য, অন্তরলোকে নোতুন প্রত্যয় লাভ করে কবির নবজন্ম হয়েছে। অন্ধের মৃগয়াকালে ব্যর্থতা নয়, সংকল্পের সিদ্ধিই কবি লাভ করেছেন। তাই 'সঙ্কল্প' কবিতায় পূর্বতন দৃষ্টি-সুখের জন্য বেদনা ও বর্তমান অনুভূতিলব্ধ আনন্দ, দুই-ই প্রকাশিত হয়েছে।

কবি প্রশ্ন করেছেন,

তেমন-ই কি আসে উষা
সে সোনালি সুষমায়
সাজায়ে শ্যামল দেহ শরতের?
শুনি যবে পাখীদের আনন্দের ঘোষণায়
ভেঙ্গে যায় নীরবতা জগতের?

বিজয়চন্দ্র ব্যক্তিজীবনে বহু দুঃখের সম্মুখীন ছিলেন। তাঁর জ্ঞানসাধনার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, কাব্যসাধনাও বিশুদ্ধ আনন্দের ফল নয়। 'হেঁয়ালি' কাব্যের অন্তর্গত একটি বিভাগের নাম 'দ্বাদশীস্মৃতি'—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্মৃতিতর্পণ। বিজয়চন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্যসাধনার সাধর্মের প্রমাণ এখানে পাই। এই কাব্যের ভূমিকায় বিজয়চন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্যগাথা', 'মন্দ্র', 'আলেখ্য' কাব্যনিচয়ের প্রভাব বিজয়চন্দ্রের কবিতায় অনায়াসলক্ষণীয়। 'হেঁয়ালি'র 'দ্বাদশীস্মৃতি'র অন্তর্ভুক্ত 'পান্থ' কবিতার প্রকাশভঙ্গি ও দৃষ্টিকোণ অ-রাবীন্দ্রিক ও দ্বিজেন্দ্রপন্থী। বিজয়চন্দ্র বলছেন,—

রাস্তা হেঁটে আমি পথিক,
আধ শতাব্দীর চেয়েও অধিক,
দেখছি এসে অবশেষে সাথের সাথী যারা
চলে গেছে পাশ কাটিয়ে,
সিন্ধু পথে পাল খাটিয়ে,
কিংবা উর্দ্ধে পুষ্পরথে
এড়িয়ে দেহের কারা।

মনে হয় 'আলেখ্য'কার দ্বিজেন্দ্রলালের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি—

একলা এখন বসছি জুড়ে
পান্থশালার ভাঙ্গা কুঁড়ে ;
ধূ-ধূ কচ্ছে দূরে দূরে
সাগর-কূলের বালি।
মাথার উপর কুঁড়ের চালে
পথের ধারে শুক্‌নো ডালে
কাক ডাকিছে রুক্ষ স্বরে
দুঃখ ঢেলে খালি।

শেষে প্রৌঢ় জীবনের রুদ্ধকণ্ঠ আর্তনাদ :

দূরের পথে এ যে রাত্রি !
আর কত দূর যাবি যাত্রী ?
ঐ কে বলে চিরদীপ্ত
পরপারের ধারা ?

আলো নয় আলেয়ার খেলা,
ধাঁধাঁয় কাটে আঁধার বেলা ;
জীবন তারই স্মৃতি-ঘেরা
স্বপ্ন দিয়ে গড়া !

কিন্তু বিজয়চন্দ্র এখানেই ক্ষান্ত হননি। পরবর্তী 'ছায়াবাজি' কবিতায় বলেছেন—

বিশ্বপতি !
খেলাও তবে দৃশ্যপটে ছায়াবাজি।
এপার ওপার,
দেখি আমি বিশ্বরূপী আমার মাঝেই।

মানবজীবনের রোমান্টিক কবি বা জীবনবিরোধী তত্ত্বদর্শী—কোনো বর্ণনাতেই বিজয়চন্দ্রকে আমরা পাই না। অতিশয় বাস্তবচেতনার উপরে বিজয়চন্দ্র তাঁর কাব্যসৌধ গড়ে তুলেছিলেন। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সন্ধানে বা আদর্শ সৌন্দর্যের ধ্যানে বিজয়চন্দ্র জীবনপাত করেন নি। প্রকৃতিপ্রেমে উন্মত্ত হন নি। যৌবনোল্লাসে আত্মবিস্মৃত হন নি। অতিশয় বাস্তবচেতন ও গভীর জ্ঞানসমৃদ্ধ জীবনদৃষ্টি বিজয়চন্দ্রের কাব্যের ভিত্তিভূমি। মনে হয় পালি ভাষায় গ্রথিত বৌদ্ধদর্শনের নিরন্তর চর্চা ও অনুবাদের ফলে বিজয়চন্দ্র এই মনোবৃত্তির অধিকারী হয়েছিলেন : দুঃখ-তমিস্রাকে জ্ঞান-খড়্গের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করতে চেয়েছিলেন।

'হেঁয়ালি'-কাব্যে 'বেজায় হেঁয়ালি' খণ্ডের সূচনায় বিজয়চন্দ্র বলেছেন,

জন্মপরিগ্রহের পরে
খেয়ে পরে বেড়ে ওঠা,
ঠেলাঠেলি মারামারি করে'
দুটি পয়সা লোটা,
মাঝে মাঝে রোগে ভোগা
এবং শেষে শিঙ্গা ফোঁকা
সদাকারই ভাগ্যে ঘটে,
হোক সে জ্ঞানী কিংবা বোকা।
জীবন-তত্ত্বের সহজ অর্থের
চলছে তবু দীর্ঘ টীকা ;

গজিয়ে ওঠে কাঁটার বনে
সরুমোটা প্রহেলিকা।
ঘুরে ফিরে তত্ত্ব-জাহাজ লাগে
আবার ঘাটের তটে !
প্রমাণিত হচ্ছে কেবল
ধরা গোলাকারই বটে !

অতিশয় স্বচ্ছ দৃষ্টির বলে বিজয়চন্দ্র তত্ত্ব-প্রহেলিকা অগ্রাহ্য করেছেন, জীবনের অন্তহীন অর্থহীন বৃত্তপথকে লক্ষ্য করেছেন এবং মনে হয় সেকারণেই বৌদ্ধদর্শনে বিশ্বাসী হয়েছেন। 'হেঁয়ালি' কাব্য (১৯১৫) বিজয়চন্দ্রের পরিণত বয়সের কাব্যসাধনার ফল। উপরন্তু পূর্বতন কাব্য 'যজ্ঞভস্ম'-'ফুলশর'-এর কবিতাংশ এতে গ্রথিত হয়েছে। সুতরাং 'হেঁয়ালি' কাব্যকে বিজয়চন্দ্রের প্রতিনিধিস্থানীয় কাব্যরূপে গ্রহণ করতে পারি। এই কাব্যের উৎসর্গপত্রে দ্বিজেন্দ্র-সহচর ও কবি-বন্ধু দেবকুমার রায়চৌধুরীর উদ্দেশে বিজয়চন্দ্র যা বলেছেন, তা-ই কবির আত্মপরিচয় :

প্রমোদ-মথিত প্রভাত-কুঞ্জে
কুসুম চয়ন করি নাই,
চন্দ্রকিরণ-খচিত বর্ণে
স্বর্ণপ্রতিমা গড়ি নাই,
রাগ-রঞ্জিত সন্ধ্যার ছায়ে
মধুসঙ্গীত রচি নাই.
কান্তচিত্রে ইন্দ্রধনুর
বর্ণ-বিভব খচি নাই ;
গাঢ় তমিস্রায় গূঢ় বেদনায়
কম্পিত হাত বাড়ায়ে,
পেয়েছি শুষ্ক কঠিন
কৃষ্ণ প্রহেলি-উপল কুড়ায়ে ;
মাজিয়া মসৃণ করিতে উপল,—
বিমল সলিলে ঝরনার
দিতেছি তোমায় ; ঢাল তুমি ভাই,
খরধারা স্নেহ-করুণার ॥

কবি কায় কোবাদ

॥ এক ॥

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে যে-সকল অপ্রধান কবি বাংলা কাব্যসংসারে আপন সাধনার অর্ঘ্য উপস্থিত করেছিলেন, কায় কোবাদ তাঁদের অন্যতম। ঢাকা জেলায় তাঁর জন্ম (১৮৫৮ খ্রীঃ), ও মৃত্যু (১৯৫২ খৃঃ)। তাঁর পূর্ণ নাম, মোহাম্মদ কাজেম অল্‌ কোরেশী। কায় কোবাদ নামেই তিনি পরিচিত।

কায় কোবাদের কাব্যসাধনা ছেষট্টি বৎসর প্রসারিত। বঙ্গসাহিত্যে কবিরূপে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বেই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের 'বীথিকা'র সমসাময়িক। গীতিকাব্য, মহাকাব্য ও কাহিনীকাব্য তিন ক্ষেত্রেই কায় কোবাদ লেখনী চালনা করেছেন। এই দীর্ঘ সময়ে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে বার বার পালা-বদল হয়েছে। কিন্তু কায় কোবাদ তাঁর উনিশ-শতকী কাব্যভাবনায় অবিচলিত থেকেছেন।

কায় কোবাদের কাব্যগ্রন্থের তালিকা এখানে উদ্ধৃত হল :

১। বিরহবিলাপ (১৮৭০) গীতিকাব্য
২। কুসুমকানন (১৮৭৩) „
৩। অশ্রুমালা (১৮৯৪) „
৪। মহাশ্মশান কাব্য (১৯০৪) মহাকাব্য
৫। শিবমন্দির বা জীবন্ত সমাধি কাব্য (১৯১৭) কাহিনীকাব্য
৬। অমিয়ধারা (১৯২৩) গীতিকাব্য
৭। শশ্মানভস্ম (১৯২৪) কাহিনীকাব্য
৮। মহরম-শরিফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য (১৯৩৩) কাহিনীকাব্য।

এ ছাড়া কবির নিম্নলিখিত কাব্যগ্রন্থনিচয় অমুদ্রিত রয়েছে*—

* কবির সকল গ্রন্থের প্রকাশিকা তাহের উন্নিসা খাতুন, পূর্বপাড়া কবি-কুটির, আগলা পোঃ আঃ, ঢাকা, প্রদত্ত তালিকা।

(ক) প্রেমের ফুল (৪৮টি গীতিকবিতা)

(খ) প্রেমের নারী ও নীহারবালা (কাহিনীকাব্য ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

(গ) জোবেদা মহল কাব্য (কাহিনীকাব্য ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

(ঘ) মন্দাকিনীধারা (গীতিকাব্য)

(ঙ) অনুতপ্ত মুসলমান বা হজরত এমাম হোসেন হত্যার প্রতিশোধ কাব্য (কাহিনীকাব্য)

(চ) প্রেমপারিজাত কাব্য (গীতিকাব্য)

(ছ) পুষ্প ও পরাগ (গীতিকাব্য)

(জ) উপদেশ-রত্নাবলী

(ঝ) সঙ্গীতকুসুমাঞ্জলি

'মহাশ্মশান' কাব্যের তৃতীয় সংস্করণ (১৯৩২) এবং 'অশ্রুমালা' কাব্যের চতুর্থ সংস্করণ (১৯২৭) হয়েছিল। কাব্য দুটির জনপ্রিয়তা এ থেকে উপলব্ধি করা যায়। 'অশ্রুমালা' কবির শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য, 'মহাশ্মশান' শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র মহাকাব্য এবং 'মহরম-শরিফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য' শ্রেষ্ঠ কাহিনী-কাব্য। এই তিনটির আলোচনায় কবির কাব্যসাধনার স্বরূপ বোঝা যাবে।

দুই

কাব্যসম্পর্কে কায় কোবাদের ধারণা কাব্যপাঠেই জানা যায়। সৌভাগ্যের বিষয় "কাব্য—কবি ও সমালোচক" নামে এক প্রবন্ধে এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনী'র কলিকাতা অধিবেশনে কায় কোবাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতেও তাঁর অনুরূপ অভিমত প্রকাশিত হয়েছিল।

কায় কোবাদের কাব্যপাঠের পূর্বে তাঁর কাব্য-অভিমত বিচার করা যাক। "কাব্য—কবি ও সমালোচক" নানাদিক থেকে কৌতূহলজনক। ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা কাব্য ও উপন্যাস সম্পর্কে এখানে কবি নিজস্ব অভিমত অকুণ্ঠভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই প্রবন্ধটি বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে রচিত। এই প্রবন্ধের কয়েকটি মন্তব্য এখানে উদ্ধার করি। এ থেকে কবি-মানসকে বোঝা সহজ হবে :

"কতকগুলি মধুর ও কোমল শব্দ যোজনা করিয়া ও বিবিধ ছন্দে গ্রথিত করিয়া একটি শ্লোক দাঁড় করাইলে—কি অক্ষর গণনা করিয়া চরণ মিলাইয়া দিলে—কি নৃত্যপাগলছন্দে উহাকে নাচাইয়া তুলিলে কবিতা হয় না।

কবির কাব্য ধর্মগ্রন্থ নহে—রসাত্মক বাক্যই কাব্য, কিন্তু সকলে তাহা বুঝে না। কবিতা বুঝিবার ও লিখিবার হৃদয় স্বতন্ত্র, যে হৃদয়ে নাকি কবিতা বুঝিবার ও লিখিবার শক্তি আছে, সেই হৃদয়ই কবিতা বুঝিতে ও লিখিতে পারে—অন্যের পক্ষে দুরাশা।

কবিত্ব যে কেবল ছন্দোময় ললিত পদাবলীতেই নিবদ্ধ তাহা নহে; কবিত্ব গদ্য পদ্য উভয়েই থাকিতে পারে; কবিত্ব কি নাচনী ছন্দে?—কবিত্ব ভাবে। ভাবই কবিত্বের প্রাণ, তাই গদ্য পদ্য উভয়ই কবিতা; চন্দ্রশেখরের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'ই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। কবিতার পরীক্ষাস্থল অন্তরে,—কর্ণে নহে। আজকাল শব্দসম্পদে অনেকেই কবি—ভাবে নহে।

কবি হওয়ার ক্ষমতা মানবের আয়ত্ত নহে, উহা জগদীশ্বর দত্ত।"

কবিতার চরিত্র সম্পর্কে কবির এই ধারণা। এ থেকে কবি-মানসিকতা ধরা পড়ে।

আধুনিক কবিতা-লেখকদের উপর কবি কায় কোবাদ বড়ই চটা। এ বিষয়ে তাঁর মত তিনি অকুণ্ঠ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন: "আজকাল গৃহে গৃহে কবি; বালক মহলেও কবিতা লিখার ছড়াছড়ি। সকলেই অভিধান খুঁজিয়া মোটা মোটা শব্দ বাছিয়া লইয়া নিজের ইচ্ছামত নৃত্যপাগল ও নৃত্যদোদুল ছন্দে গ্রথিত করিয়া নূতন একটা করিতে চাহেন।...তাঁহারা ব্যকরণ মানেন না—ছন্দ মানেন না—যতি মানেন না; তাঁহারা কেবল নৃত্যপাগল ছন্দ লইয়াই পাগল। ভাবকে দুর্ভেদ্য দুর্গের ভিতর আবদ্ধ রাখিয়া কবিতাটিকে খুব জটিল করিতে পারিলেই তাঁহারা মনে করেন কবিতা লিখা সার্থক হইল।...প্রাঞ্জলতা ও মধুরতা যে কবিতার একটি প্রসাদ গুণ, তাহা তাঁহারা আদৌ মনে করেন না।...এইসব হেঁয়ালি-লেখক কবিতা লিখেন শুধু নামের জন্য।"

কবি-সমালোচক কায় কোবাদের মতে কবিতার আধুনিক বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বথা বর্জনীয়। তিনি যাঁদের কবিতা প্রশংসাযোগ্য মনে করেন, তাঁদের কথা প্রবন্ধে বলেছেন। তালিকাটি লক্ষণীয়। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, আলাওল, দৌলত কাজীর কাব্যসাধনার প্রশংসা কবি করেছেন। ভারতচন্দ্র রায়কে তিনি অশ্লীলতাদোষে অভিযুক্ত করেছেন। আধুনিক যুগের যে-সব

কবি তাঁর হাতে পাস-মার্কা পেয়েছেন, তাঁরা হলেন,—রঙ্গলাল, গোবিন্দচন্দ্র রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, রজনীকান্ত সেন, দীনেশচরণ বসু, হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, রাজকৃষ্ণ রায়, গোবিন্দচন্দ্র দাস, গিরীন্দ্রমোহন দাসী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়। নবীনচন্দ্র দাস ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতা তাঁর কাছে মামুলি ধরনের বলে মনে হয়েছে। অক্ষয়কুমার বড়াল, স্বর্ণকুমারী দেবী, যোগীন্দ্রনাথ বসু, নবীনচন্দ্র সেন ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা তাঁর কাছে ভাল বলে মনে হয়েছে।

বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক গীতিকাব্যের ধারা কায় কোবাদ ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁর কবিতা পড়লেই তা বোঝা যায়। প্রবন্ধেও সে-ব্যর্থতার পরিচয় রয়েছে। বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পর্কে তিনি যে অতি-সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন, তা উদ্ধারযোগ্য : "রবীন্দ্র-গুরু বিহারী-লালের লেখাও খুব মিষ্টি, তিনি কয়েকখানা কাব্যই লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে দুই একখানা খুবই উৎকৃষ্ট।" মধুসূদন দত্ত ও নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যে তিনি প্রচুর ত্রুটি আবিষ্কার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-উপন্যাস সম্পর্কে কায় কোবাদের ধারণা কৌতূহলোদ্দীপক : বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথ খুবই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। যে 'গীতাঞ্জলি' লিখিয়া তিনি নোবেল প্রাইজ লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তেমন কিছু আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। কিন্তু ইহার ইংরাজী অনুবাদখানি বাঙ্গালা 'গীতাঞ্জলি' হইতে অনেক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। তাহার জন্যই তিনি দেশ বিদেশে এত খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ব্যাকরণগত দোষ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কিছু কিছু আছে; সেগুলি কেহ দেখিয়াও দেখেন না। তাহার প্রথম কারণ, রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি অন্ধ স্তাবক জুটিয়াছেন; তাঁহারা মন্দকেও ভাল বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে আছেন মাসিকপত্রের সম্পাদক কয়েকজন। দ্বিতীয় কারণ, আজকাল ব্যাকরণের দিকে কেহই লক্ষ্য করেন না। এই রবীন্দ্র-পন্থীর দলই হেঁয়ালির সৃষ্টি করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস লিখিতে যাইয়া অশ্লীলতার নগ্ন চিত্র আঁকিয়াছেন। তাঁহার 'ঘরে বাইরে' ও 'নৌকাডুবি' পাঠ করিলে সুধী পাঠকবর্গ আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এগুলি ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য যুবকদের বড়ই মুখরোচক। কেন না ইহারই নাম মনস্তত্ত্ব। পরের স্ত্রীকে

লইয়া নিজের স্ত্রীর মত ছয় মাস ঘরকন্না করিয়া প্রেম আদায় করিয়া লইতে পারিলে নব্য যুবকদের মধ্যে অনেকেই আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু চরিত্রবান্ ও ইস্লাম ধর্মভীরু পাঠকের কাছে ঐ কার্য্যগুলি হারাম ও অবৈধ। জানি না এক্ষেত্রে হিন্দু নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ কি ব্যবস্থা দেন।

রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতা মিষ্টি ও উচ্চভাবপূর্ণ। কিন্তু সবগুলিই যে ভাল একথা আমি স্বীকার করিতে পারি না। আমি মনে করি রবীন্দ্রনাথের অন্ধ স্তাবক ব্যতীত কোন সুধী পাঠকই ইহা স্বীকার করিবেন না। তিনি মহাকাব্য একখানাও লিখেন নাই।"

এই সব উদ্ধৃতি স্বপ্রকাশ, ব্যাখ্যা বাহুল্যমাত্র। এই কথা বলা যায়, কবি কায় কোবাদ বিংশ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বটে, কিন্তু সাহিত্যভাবনা ও কবিমানসিকতার বিচারে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ।

প্রবন্ধশেষে কায় কোবাদ উপযুক্ত সমালোচকের শোচনীয় অভাবে ক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, "কাব্যের সমালোচনা করিতে হইলে—কাব্যের চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়া উহার দোষগুণ বুঝাইবার শক্তি ও কাব্যরসে অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। কবিত্বহীন ব্যক্তি সহস্র বিদ্যায় পারদর্শী হইলেও কাব্যের গুণাগুণ বুঝিতে ও বুঝাইতে অক্ষম।...কাব্যরসে অভিজ্ঞতা না থাকিলেও আজকাল অনেকেই সমালোচক সাজিয়া কবিকে দু-চারি কথা শুনাইয়া দিয়া পাণ্ডিত্য ফলাইতে চাহেন।...কবিকে চিনিতে হইলে তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়াই চিনিতে হইবে। কবিকে চিনিতে না পারিলে তাঁহার কাব্যের সমালোচনা করিতে যাওয়াও বিড়ম্বনামাত্র। আমি দেখিতেছি যাঁহারা কবিতার কিছুই বুঝেন না, তাঁহারাও মাসিকগুলির সমালোচনার স্তম্ভে যা ইচ্ছা তাই লিখিয়া সমালোচনার বহর ছুটাইয়া—নীতিশাস্ত্রের বোল আওড়াইয়া সমালোচকের উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইবার দাবী করিয়া থাকেন।"

'অশ্রুমালা' কাব্যভুক্ত 'কবি ও সামালোচক' কবিতায় কায় কোবাদ সমালোচককে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন,—

> ক্রিটিকের ঐ তীক্ষ্ণ ছোরায়
>
> ডরিস্ না রে মন্ পাগেলা!
>
> কল্পনার ঐ নীল্ সাগরে
>
> ভাসিয়ে দে তোর ভাবের ভেলা!

উর্মি দ'লে গানের ভরে
যা' চ'লে তুই আপন মনে !
কল্পনার ঐ শ্যাম সৈকতে
সাহিত্যের ঐ কুঞ্জবনে।

॥ তিন ॥

কায় কোবাদের মহাকাব্য-প্রীতি আন্তরিক। "কাব্য—কবি ও সমালোচক" প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "কাব্য বহু প্রকার :—কাব্য, খণ্ডকাব্য বা গীতি-কাব্য, চম্পুকাব্য ও মহাকাব্য ; তন্মধ্যে মহাকাব্যই প্রধান। একই বিষয়ের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ ও রাজ রাজর্ষিদের উৎকৃষ্ট বর্ণনা সংবলিত নানা রস ও অলঙ্কারে বিভূষিত অষ্টাধিক সর্গ সংযুক্ত কাব্যই—মহাকাব্য Epic Poem, উহা মাধুর্যে-গাম্ভীর্যে ও উৎকৃষ্ট বর্ণনায় সর্বশ্রেষ্ঠ। ভাষার অনন্ত জগতে ইহা ফুলকুল-সুশোভিত ও নির্ঝরিণীর কলতানে মুখরিত হিমাচলের ন্যায় অচল ও অটল। যতদিন ভাষা থাকিবে, ততদিন উহা মানবহৃদয়ের নিভৃত উদ্যানে স্বর্গের মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত করিয়া সকলকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিবে।" রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন, "তিনি মহাকাব্য একখানাও লিখেন নাই।" বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে উপনীত হয়েও কায় কোবাদ বিশ্বাস করতেন মহাকাব্যের চর্চা করা উচিত এবং আধুনিক যুগে মহাকাব্য বে-মানান নয়। তাঁর একমাত্র মহাকাব্য "মহাশ্মশান কাব্য" ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কাব্যটি জনপ্রিয় হয়েছিল, তার প্রমাণ এর তৃতীয় সংস্করণ (১৯৩২)। প্রায় ন' হাজার পৃষ্ঠায় কাব্যটি সম্পূর্ণ। ইতিহাস-বিখ্যাত পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ অবলম্বনে এই কাব্য রচিত। এই মহাযুদ্ধে সমস্ত দিন ধরে আহমদ্‌শাহ আব্‌দালী ও মুসলমান বীরপুরুষদের গগনভেদী 'দীন্-দীন্' শব্দ এবং তিন লক্ষ মারাঠা-বীরের 'হর্-হর্ মহাদেও' ধ্বনি, সেই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ অস্ত্রের ঝন্ঝনি, কামানের গভীর ঘর্ঘর রব ও বন্দুকের ক্রম্ ক্রম্ ধ্বনি গগনপবনকে মুখরিত করে তুলেছিল। সেই বীররসাত্মক ঘটনার বর্ণনায় এই কাব্য পরিপূর্ণ। এই রক্তক্ষরা রণভূমে মুসলিম গৌরবের চিত্র কবি অংকন করেছেন এবং "বঙ্গভাষায় এরূপ বৃহদাকারের ও উৎকৃষ্ট মহাকাব্য আর দ্বিতীয় নাই" বলে দাবি করেছেন।

কায় কোবাদের প্রধান কাহিনীকাব্য 'মহরম্ শরিফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য' (১৯৩৩)। কাব্যটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। "হজরত এমাম হাসান ও হজরত এমাম হোসেন ও তদীয় বংশধরগণের শাহাদাতনামা" অর্থাৎ কারবালার হৃদয়বিদারক শোকাবহ ঘটনা অবলম্বনে এই কাব্য রচিত। কারবালার শোকাবহ ঘটনা অবলম্বনে উর্দু ভাষায় 'আনাসেরাস শাহাদাতায়েন', বাংলা ভাষায় 'জঙ্গনামা', 'শহিদে কারবালা', 'মোক্তাল হোসেন' প্রভৃতি পুঁথি বা প্রাচীন ঢঙে রচিত গ্রন্থ পাওয়া যায়। মীর মোশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু', মহাম্মদ হামিদ আলীর 'কাসেম-বধ', ফজলুর রহিম চৌধুরীর 'মহরম্ চিত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে কবি কায় কোবাদ বহু ত্রুটি লক্ষ্য করেছেন। সেই সব ত্রুটি ও ধর্মবিচ্যুতির প্রতিবাদে তিনি 'মহরম্ শরিফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য' রচনা করেন। মোজাম্মেল হক, কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় কারবালার ঘটনার ভুল ব্যাখ্যা দেখে কবি ব্যথিত হয়েছেন এবং দাবি করেছেন, "আমি কাব্য লিখিতে যাইয়া সম্পূর্ণরূপেই ইতিহাসের অনুসরণ করিয়াছি।" (ভূমিকা, পৃ. ১৬)। বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ সনে লিখিত ভূমিকায় কায় কোবাদ আরো লিখেছেন, "মাইকেল ও হেম-নবীনের সময় যে ধরনের লেখা প্রচলিত ছিল, সে ধরনের লেখা এখন নেই। যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লেখারও পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ঐ প্রাচীন কবিদের সঙ্গে সঙ্গে কবিতার যুগও এখন চলিয়া গিয়াছে। এখন হেঁয়ালির যুগ, অনেকেই এখন সেই হেঁয়ালির মোহে পড়িয়াছেন। আজকাল পাঠকদেরও রুচি বিকৃত হইয়াছে, তাঁহারাও এই সব অর্থহীন হেঁয়ালিগুলিই ভালবাসিয়া থাকেন। এই হেঁয়ালির সৃষ্টিকর্তা রবীন্দ্রনাথ। সারা বঙ্গ জুড়িয়াই ইঁহার শিষ্য, এই রবীন্দ্রপন্থীর দলই এখন বাংলা ভাষার উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। কাজেই স্বভাবকবির কবিতার এখন আদর নেই। আসল ছাড়িয়া এখন নকল লইয়াই টানাটানি। এই সব লেখক পাঠক ও সমালোচকের দলও একই দরের, তাঁহাদের মাপকাঠির ওজনে যিনি জীবনে একখানা মহাকাব্য লিখেন নাই, সারাজীবন ভরিয়াই যিনি খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য (Lyric poem) লিখিয়াছেন, সেই খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য প্রণেতাই তাঁহাদের মতে কবিসম্রাট। হায় রে, নাওয়ারিশ বঙ্গভাষা !" (ভূমিকা, 'মহরম্ শরিফ' কাব্য, ১৯৩৩)। এই আক্ষেপের মধ্যেই কায় কোবাদের কাব্যাদর্শ ও কাব্যবক্তব্য নিহিত। কায় কোবাদ মনে-প্রাণে গত শতকের রবীন্দ্রপূর্ব কাব্যলোকের

অধিবাসী, তার স্পষ্ট পরিচয় এখানে পাই।

'মহরম্-শরিফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য' তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে তেরোটি, দ্বিতীয় খণ্ডে বারোটি, তৃতীয় খণ্ডে চারটি, মোট উনত্রিশ সর্গে কাহিনী প্রসারিত। দামেস্ক রাজপ্রাসাদে কাহিনীর সূচনা। কুফা নগরী, বসরা নগরী, মদিনা-মনুয়ারা, মোসল নগর ঘুরে শেষকালে ফেরাত নদীতীর ও কারবালা প্রান্তরে কাহিনীর সমাপ্তি। ৩৭০ পৃষ্ঠাব্যাপী এই কাহিনীতে মহরমের সত্য ঘটনাকে কাব্যরূপ দান করা হয়েছে। এই কাব্য কবিকে নিষ্ঠাবান ভক্ত মুসলমানরূপে পাঠকসমাজে পরিচিত করেছে। কবির ভক্তি ও কাব্যচেতনার রমণীয় পরিণয় সাধিত হয়েছে এই কাব্যে।

কবির বর্ণনক্ষমতার পরিচায়ক একটি অংশ উদ্ধার করি। প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত দশম সর্গের চিত্র, মদিনা-মনুয়ারা, হজরত এমাম হাসান ও হজরত এমাম হোসেনের গৃহ :

হাসানের গৃহমাঝে পুণ্যের প্রতিমা
সরলা হাসনেবানু পতি প্রতীক্ষায়
আছে বসে, প্রদীপের স্নিগ্ধ আভা পড়ে
শোভিছে মু'খানি তার ফুটন্ত কমল।
পরিধানে শুভ্রবাস, কণ্ঠে পুষ্পমালা
অশেষ করুণাময়ী জননীরূপিণী,—
—স্বর্গ হতে অবতীর্ণা দেবীমূর্তি যেন।
হাসান প্রবেশি সেই গৃহ-অভ্যন্তরে
ধীরে ধীরে, নিকটস্থ একটি আসনে
বসিলা, হাসনেবানু আনিলা তখনি
বেদানার সরবত করিয়া প্রস্তুত
অতি যত্নে, পান করি মহাত্মা এমাম
লভিলা বিমল শান্তি, জুড়াইল তার
ক্লান্ত দেহ, বানু তারে করিলা জিজ্ঞাসা
"এত রাত্রি কেন আজি হইল তোমার?
কত দুর্ভাবনা মোর হয়েছে হৃদয়ে
এতক্ষণ, বসে বসে কত যে ভেবেছি
এতটুকু শান্তি আমি পারি নি লভিতে।

চারিদিকে শত্রু তব, কে কবে তোমারে
করি হত্যা গুপ্ত ভাবে, দিবে নিভাইয়া
মদিনার শেষ আশা, সেই সঙ্গে হায়
ইস্লাম জগৎ ডুবে যাইবে আঁধারে।"

আর একটি বর্ণনা (প্রথম খণ্ড, ত্রয়োদশ সর্গ থেকে, দৃশ্যস্থল পূর্ববৎ) :

রজনী দ্বিযামা ; স্তব্ধ প্রকৃতি-সুন্দরী,
নাহি জাগে জীবজন্তু ; জন-কোলাহল
নাহি এবে, মৃতপ্রায় নাগরিকগণ।
আঁধারে নিমগ্ন ধরা, মদিনানগরী
স্পন্দহীন, নাহি কোথা শব্দ একটুকু,
না নড়ে গাছের পাতা, না বহে পবন।

মদিনার রাজপথে কে অই রমণী
চলিয়াছে দ্রুত বেগে আবরিয়া দেহ
কৃষ্ণ বাসে, মাঝে মাঝে পত্রের পতনে
ভীত চমকিত হৃদি, এদিকে ওদিকে
নিরখিয়া, সন্তর্পণে যাইছে আবার !
কিছুদূর অগ্রসরি, প্রহরীরে দেখি
খর্জ্জুর বৃক্ষের কুঞ্জে লুকাইল যেয়ে
ক্ষিপ্র বেগে, ধীরে ধীরে প্রহরী তখন
চলি গেল অন্য দিকে আপনার কাজে ;
চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তখন
অতি সন্তর্পণে—ধীরে সশঙ্কিত হৃদে
বাহিরিয়া সে নির্জন খর্জ্জুর বৃক্ষের
কুঞ্জ হতে, সে রমণী চলিল আবার
নিজ কার্যে দ্রুত বেগে ; কিছুক্ষণ পরে
আসিল সে হোসেনের বাড়ীর সম্মুখে।

ঘটনার স্বচ্ছন্দ বর্ণনা ও উপযুক্ত পরিবেশে রচনায় কবি কায় কোবাদের স্বভাব-নৈপুণ্য ছিল, একথা স্বীকার্য। কারবালার রক্তাক্ত মরু-প্রান্তরে নিষ্ঠুর হত্যা-কাণ্ডের বর্ণনায় কবি অনুরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

॥ চার ॥

কায় কোবাদ তাঁর হৃদয়ের অর্ধেকটা দান করেছিলে মহাকাব্য-কাহিনী-কাব্য রচনায়; বাকি অর্ধেকটা তিনি গীতিকবিতার সাধনায় নিযুক্ত করেছিলেন। এবং এই শেষোক্ত ক্ষেত্রেই তাঁর সাফল্য তর্কাতীত। পূর্বধৃত উদ্ধৃতিতে কবি একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন: "স্বভাবকবির কবিতার এখন আদর নেই। আসল ছাড়িয়া এখন নকল লইয়াই টানাটানি!" রবীন্দ্রনাথের সচেতন কাব্যপ্রসাধনের তিনি বিরোধী। 'মানসী' কাব্যের মহৎ শিক্ষাকে কায় কোবাদ গ্রহণ করেন নি। কবিতার ভাবচয়নই যথেষ্ট নয়, চাই প্রসাধন,—এই শিক্ষাকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। "কাব্য—কবি ও সমালোচক" প্রবন্ধে তাঁর এই অভিমত লক্ষণীয়: "এক শ্রেণীর লেখক আছেন যাঁহারা শুধু কোমল শ্রুতিমধুর শব্দগুলি বাছিয়া বাছিয়া এরূপ সুন্দরভাবে কবিতাতে গ্রথিত করিয়া থাকেন, যাহা আর্টের হিসাবে খুব সুন্দর ও উপাদেয় বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃত কবিতার হিসাবে উহার মূল্য কিছুই নহে। এইরূপ কবিতার লেখকই শব্দসম্পদের কবি। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা অবশ্যই উপলব্ধি হইবে যে সেই বাছা বাছা শব্দগুলি যেন কত সন্তর্পণে—কত সাবধানতার সহিত গ্রথিত হইয়া এক একটি কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে প্রকৃত কবিতা এত সন্তর্পণে এত সাবধানতার সহিত গ্রথিত হয় না। উহার গতি স্বাভাবিক (flow natural); স্বভাব-কবির হৃদয় হইতে উহা আপনা আপনিই বাহির হইয়া পড়ে। স্বভাব-কবির হৃদয় শুক্তি—কবিতা মুক্তা।......

আধুনিক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও সমালোচকগণ এই শ্রেণীর artificial কবিতারই পক্ষপাতী। ...সেইসব দায়িত্বহীন সম্পাদকগণ ভাল ভাল ও সুগভীর ভাবপূর্ণ প্রবন্ধের অভাবে এইরূপ রাবিশগুলি দিয়াই তাঁহাদের পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিয়া থাকেন। 'বঙ্গদর্শন', 'বান্ধব' ও 'সাহিত্যের' সময় এইরূপ রাবিশগুলি সেইসব পত্রিকায় স্থান পাইত না।...আমার এই কথাগুলি পাঠ করিয়া হেঁয়ালি-লেখক ও রবীন্দ্রনাথের অন্ধ স্তাবকের দল যে আমার উপরে খড়্গহস্ত হইবেন ও অজস্র গালি বর্ষণ করিবেন, তাহা আমি বুঝি।" এই উদ্ধৃতি কবি কায় কোবাদের কাব্যভাবনার প্রতিফলন।

এইবার কায় কোবাদের সার্থক সাহিত্যকর্ম গীতিকবিতার পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে। কবির শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্যগ্রন্থ 'অশ্রুমালা' (বঙ্গাব্দ ১৩০২, খ্রীস্টাব্দ ১৮৯৪)। এই কাব্যটি জনপ্রিয় হয়েছিল, চতুর্থ সংস্করণ (বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, খ্রীস্টাব্দ ১৯২৭) তার পরিচায়ক। কাব্যগ্রন্থটি দুই ভাগে বিভক্ত: 'বিবিধবিষয়ক কবিতা' ও 'প্রেমবিষয়ক কবিতা'। কবি নবীনচন্দ্র সেন, 'বঙ্গবাসী'-সম্পাদক, 'ঢাকা গেজেট'-সম্পাদক, 'বান্ধব'-সহকারী-সম্পাদক, নরেন্দ্রনাথ লাহা প্রমুখ সমালোচকদের প্রশংসাধন্য এই কাব্য কায় কোবাদের গীতিপ্রাণ কবিচিত্তকে উদ্‌ঘাটিত করেছে।

স্বভাবতই 'অশ্রুমালা'র প্রেমকবিতাগুচ্ছ পাঠকের মনোযোগ দাবি করে। ঊনবিংশ শতাব্দের শেষপাদে ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতাক্ষেত্রে বলদেব পালিত, গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, স্বর্ণকুমারী দেবী, মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, বরদাচরণ মিত্র, প্রিয়নাথ মিত্র, কুঞ্জলাল রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, গোবিন্দচন্দ্র দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে মুন্সী কায় কোবাদের নামও উল্লিখিত হওয়া উচিত।*

কায় কোবাদের প্রেমকবিতায় এমন একটি আন্তরিক আবেগ ও তীব্রতা আছে, যা বিরলদর্শন। শব্দঝংকারে ও উপমানির্বাচনে তা রসসমৃদ্ধি লাভ করেছে। 'কে তুমি' কবিতায় এইসব গুণগুলি ধরা পড়ে:

কে তুমি ?—কে তুমি ?
ওগো প্রাণময়ি
কে তুমি রমণীমণি !
তুমি কি আমার হৃদি-পুষ্প হার
প্রেমের অমিয় খনি
কে তুমি রমণীমণি ?

প্রণয়িণীকে নানা বিশেষণে ভূষিত করার মধ্যে কবি তাঁর অস্বীকৃত artificialityকে স্বীকার করে নিয়েছেন ; সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মণ্ডনচাতুর্য :

---

* বর্তমান লেখকের "ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য" গ্রন্থে (২য় সং ১৯৭০) এই প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা আছে।

কে তুমি ?—
তুমি কি চম্পক-কলি
গোলাপ মতিয়া বেলী ?
তুমি কি মল্লিকা যুথী ফুল্ল কুমুদিনী ?
সৌন্দর্যের সুধাসিন্ধু,
শরতের পূর্ণ ইন্দু
আঁধার জীবন-মাঝে পূর্ণিমা রজনী !
কে তুমি রমণীমণি ?—

কবি প্রেমকে অধিষ্ঠানভূমি থেকে তুলে জরামৃত্যুহীন অকলংক প্রণয়ের স্বপ্ন-জগতে উত্তীর্ণ করেছেনে :

কে তুমি ?—
তুমি কি আমার সেই
হৃদয়মোহিনী ?
সেই যদি—কেন দূরে ? এস, সেই হৃদিপুরে
এস প্রিয়ে প্রাণময়ি
এস সুহাসিনি !
এস যাই সেই দেশে—ফুল ফুটে চাঁদ হাসে
দয়েলা কোয়েলা গায়
প্রাণের রাগিনী।
জরা নাই—মৃত্যু নাই, প্রণয়ে কলঙ্ক নাই
চল যাই সেই দেশে
এস সোহাগিনি !
কে তুমি রমণীমণি ?

ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের বিচিত্র ফুলের স্তবক রচনা করেছেন কায়কোবাদ। প্রেমসঙ্গীত, প্রেমপ্রতিমা, বনফুল, ফুল ও কলি, বাসি ফুল, বেল ফুল, মানভঞ্জনের একটি চুম্বন, হৃদয়রাণী, কারে ভালবাসি, প্রণয়ের প্রথম চুম্বন, বিদায়ের শেষ চুম্বন, কেমনে ভুলিব, ভালবাসা, প্রিয়তমার প্রতি, প্রেমের স্বপ্ন,

সোহাগিনী প্রিয়া—কবিতার এইসব নামেই বিষয়বস্তুর পরিচয় বর্তমান। যদৃচ্ছা-উদ্‌ধৃত কয়েকটি স্তবকে তার পরিচয় পাই :

আ ছি ছি আ ছি ছি বেলি লাজ নাই তোর!
কেন লো ঘোমটা খুলে, ডাগর নয়ন তুলে
ভুলাস্ ভ্রমরে ছি ছি সে কি মনোচোর ?
হেরিলে চামেলী তোরে, সরমে সে যাবে মরে,
কি বলে বুঝাবি তারে সে বড় কঠোর!
আ ছি ছি আ ছি ছি বেলি লাজ নাই তোর! ['বেলফুল']

কেমনে ভুলিব আমি তারে ?
তার সে রূপের জ্যোতিঃ, হৃদয়ে পশিয়া গো,
পাগল করিয়া দিল মোরে।
না জানি কি ঘুম-ঘোরে, তারে দেখেছিনু গো,
তাই তারে ভুলিতে না পারি!
শয়নে স্বপনে ধ্যানে, তারে মনে পড়ে গো,
সে আমার—আমি যে তাহারি। ['মানস-প্রতিমা']

ভুলিলে কেমনে ?
প্রাণের অধিক হায়, ভালবাসে যে তোমায় ?
কও প্রিয়ে তুমি তারে ভুলিলে কেমনে ?
সেই প্রীতি, সেই স্মৃতি, সেই স্নেহ সুধা-গীতি
এখনো আমার হায় পড়ে সদা মনে!
ভুলিলে কেমনে ? ['ভুলিলে কেমনে']

'অশ্রুমালা' কাব্যের অপরার্ধ 'বিবিধ বিষয়ক' কবিতায় পূর্ণ। এই অংশে আত্মজিজ্ঞাসু দার্শনিক কবিমানসের সন্ধান পাই। আমি কে, ত্রিধারা (জন্ম, জীবন ও মৃত্যু), ভুল ভেঙ্গে দেও, ঐশচিন্তা, সংসার, মানবজন্ম, জীবনপ্রবাহ নীরব রোদন, ভ্রান্তি—প্রভৃতি কবিতার নামেই বিষয়-পরিচয় নিহিত। এক ভগবদ্ভক্ত নিষ্ঠাবান মুসলমানের পরিচয় এইসব কবিতায় পাই। দুয়েকটি উদাহরণেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে :

আমি কে ?—আছে কি তবে অস্তিত্ব আমার ?
জীবন, আকৃতি, রব,
শৈত্য-ঔষ্ণ্য অনুভব
শুধু কল্পনার খেলা ;—ছলনা আধার !
কে তুমি ? কে আমি বিভো ? দেও সত্যজ্ঞান।
আমি কি তোমারে ছাড়া ?
তুমি কি ব্রহ্মাণ্ড ভরা ?
কোথা তবে তুমি আমি ?—কত ব্যবধান ? ['আমি কে']

এ জটিল জৈব-কাব্য বিচিত্র কেমন,
প্রতি অঙ্কে নবরস,
তাহে ভাগ্য পরবশ,
জন্ম-মৃত্যু কর্ম-ভোগ,—বিচ্ছেদ-মিলন। ['ত্রিধারা,]

প্রভু, ভুল ভেঙ্গে দেও।
যে ভুলে তোমারে ভুলে, হীরা ফেলে কাঁচ তুলে
ভিখারী সেজেছি আমি—
—আমার সে ভুল প্রভু,
তুমি ভেঙ্গে দেও। ['ভুল ভেঙ্গে দেও']

আজি,—পুণ্যপ্রেমের পুণ্যপরশে হাসিছে জগৎ অমিয়-হাসি !
আজি,—কুঞ্জকাননে, সৌরভ বিলায়ে ফুটেছে অযুত কুসুমরাশি !
আজি,—কাননে কাননে, গাইছে পাপিয়া গাইছে কোকিল মধুর স্বরে !
আজি,—আসিবে সে জন, এ সৌরজগৎ বাঁধা আছে যার প্রেমের ডোরে !
['শব্ কদর্']

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে কায়কোবাদ লিখেছিলেন শোক কবিতা '৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' :

কোথা গেলে দীনবন্ধু এ জন্মের মত
ডুবাইয়া বঙ্গভূমি শোকের সাগরে !

তোমার বিচ্ছেদে চিত্ত ঘোর আকুলিত
শোকের উচ্ছ্বাস আজি প্রতি ঘরে ঘরে।

ঊনবিংশ শতকের কাব্য-ঐতিহ্যের নিষ্ঠাবান বাহক, বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবক কবি কায় কোবাদের কাব্যসাধনার এই পরিচয় তাঁর কবিমানসের ঈশ্বরভীরু রূপটিকে স্পষ্ট করে তোলে। 'অশ্রুমালা'র অন্তিম দুটি কবিতায় কবি ঈশ্বর ও বঙ্গভাষার কাছে বিদায় প্রার্থনা করেছেন। যদি গভীর আন্তরিকতা উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার মানদণ্ড হয়, তবে একথা স্বীকার্য কবি কায় কোবাদ সার্থক গীতিকবি। ঈশ্বর সমীপে কবির নিবেদন,—

নাথ, ভুলনা আমারে তুমি,
অর্থের লালসা, প্রেমের পিপাসা,
মিটিল না প্রাণে নিতি নব আশা,
কেবলি অতৃপ্তি কেবলি দুরাশা
সকলি ত জান তুমি।
ভয়ে ভয়ে আজি তোমার দুয়ারে,
আসিয়াছি নাথ প্রাণ কাঁপে ডরে
আমি পাপী তাপী ক্ষমা কর মোরে
হে প্রিয় প্রাণের স্বামি !
ভুল না আমারে তুমি। ['প্রার্থনা']

আর, 'বঙ্গভষার প্রতি (বিদায়)' কবিতায় কবি মাতৃরূপা বঙ্গভাষার কাছে বিদায় প্রার্থনা করে লিখেছেন :

দাও মা বিদায় মোরে এই ত আমার শেষ দেখা !
ডুবিয়া গিয়াছে ভানু, ঐ দেখা যায় ক্ষীণ রেখা !
সাথী মোর ছিল যারা, চলিয়া গিয়াছে তারা
আঁধার ঘনিয়ে এল, আমি যে রয়েছি পড়ে একা !
করেছি অনেক কষ্ট, তাতেই মা আমি তুষ্ট
সুখ দুঃখ মিথ্যা কথা—সবি যে মা অদৃষ্টের লেখা।
সারাটি জীবন ভরে সাজাইনু মা তোমরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল স্বর্গীয় সৌরভরাশি মাখা।

গোলাপ চামেলী বেলী, সবি ত দিয়েছি তুলি

আর ত কিছুই নেই—লিলি যে বিলেতী ছাঁচে আঁকা।

তোমার স্নেহের ধার, শোধিতে নারিনু আর

জীবন যে যায় যায়, আর তারে নাহি যায় রাখা।

আমার পশ্চাতে এসে, দাঁড়াতে মা তোর পাশে

কেহ নাই—কেহ নাই, সব শূন্য সকলি মা ফাঁকা

দাও মা বিদায় মোরে—এই ত আমার শেষ দেখা।

আশাকরি ভাষালক্ষী কবির প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন নি।

একটি পুরনো মফঃস্বল সাপ্তাহিক পত্রিকা

আজ থেকে বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে হুগলি জেলার বৈদ্যবাটী থেকে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি বৈদ্যবাটী নিবাসী শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে তার পুরনো ফাইল দেখার সুযোগ হয়েছিল। এটির নাম 'বৈদ্যবাটী পত্রিকা'।

কয়েকটি কারণে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছে।

এই প্রবন্ধের সঙ্গে মুদ্রিত ফটোচিত্র দুটি বৈদ্যবাটী পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রথম দুই পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। পত্রিকার আকার ১৩" × ৮"। প্রতি সংখ্যায় ছয়টি পৃষ্ঠা।

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত নিয়মাবলী—'বৈদ্যবাটী পত্রিকা প্রতি রবিবারে বাহির হইবে। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য এক পয়সা—সডাক বার্ষিক মূল্য ১৷০ সিকা—মোট ৪৮ সংখ্যায় বর্ষ পূর্ণ হইবে।'

শেষ পৃষ্ঠার নীচে মুদ্রাকরের লাইন—Printed and Published by Kanailal Mukherjee at the Karmisangha Press, Baidyabati.

পত্রিকার সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সেবক শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়।

পত্রিকার শিরোদেশে মুদ্রিত—"বাংলার জনগণের মুখপত্র"। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার (প্রথম সপ্তাহ) তারিখ—রবিবার ১১ই আশ্বিন ১৩৩২ সাল [১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর]।

প্রথম পৃষ্ঠায় পত্রিকার motto :

"উদ্দেশ্য কর 'কল্যাণ', উপায়—'সংস্কার'।
'সততা' অবলম্বনে উঠাও ঝঙ্কার ॥
প্রীতি রাখ বিশ্বপ্রতি বিশ্বপতির আশীষ পাবে।
সর্বশক্তিমানের শক্তি তোমার পানে তবেই ধাবে ॥"

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয়। এর শিরোদেশে একটি শ্লোক মুদ্রিত :

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার বিষয়সূচী :

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়—সম্পাদকীয়। দেশসেবা (নিবন্ধ)—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ২।৩ পৃষ্ঠায় উদ্বোধন (কবিতা)—ক্ষেত্রকুমার দাশশর্মা। আহ্বান (নিবন্ধ) —সরোজকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪র্থ পৃষ্ঠায়—পরাধীনতার পাষাণ (নিবন্ধ) —হেমন্তকুমার সরকার। ৪।৫ পৃষ্ঠায়—পূজার কাকলী (কবিতা)— নিত্যপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। আর্যস্বাস্থ্যবিধি—কবিরাজ সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্ত। ধর্মবল (নিবন্ধ)—জনৈক। ৫।৬ পৃষ্ঠায়—অভিযান (কবিতা)—শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়। মায়ের আশীর্বাদ—(শুভেচ্ছাবাণী)—মৃণালিনী দেবী।

১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে 'কর্মীসংঘ' বৈদ্যবাটী পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'মটো' ও বিষয়সূচী থেকে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যায়, দেশসেবা এই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের প্রেরণাস্থল।

কর্মীসংঘে ছিলেন সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সেবক শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বৃটিশ রাজরোষকে অগ্রাহ্য করে সেদিন এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। 'কর্মীসংঘ প্রেস' বৈদ্যবাটী সিদ্ধেশ্বরীতলার এক বাড়িতে স্থাপিত ছোট ছাপাখানা। হাতে বোনা হরফে এটি মুদ্রিত। দুই লাইনের মাঝে তামার পাতের অভাবে পিজবোর্ড দেওয়া থাকত। হাতে ঠেলা মেশিনে পত্রিকা মুদ্রিত হত। মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়, ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ছকু), ৺সুরেন্দ্রনাথ সাউ, বালক দাশরথি মুখোপাধ্যায় (তাঁর কাছ থেকে তথ্যাদি ও 'ফাইল' সংগৃহীত) পত্রিকার স্বেচ্ছাকর্মী। সম্পাদকের জ্যাঠাইমা ও দাশরথি মুখোপাধ্যায়ের জননী শ্রীমতী প্রমোদা দেবী (বর্তমানে অশীতিপর বৃদ্ধা), সম্পাদকের স্ত্রী ৺রেণুবালা মুখোপাধ্যায় এবং ৺বসন্তকুমারী দাসী গৃহকর্মের অবসরে টাইপ-কম্পোজ করতেন। শ্রীমতী প্রমোদা দেবী কর্মী-সংঘের সেবকদের কাছে 'জ্যাঠাইমা' ও ৺বসন্তকুমারী দাসী 'বড় কাকিমা' নামে পরিচিতা ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২১ খ্রীঃ) পর বৈদ্যবাটিতে যে দেশসেবকগোষ্ঠী বৃটিশ রাজরোষ উপেক্ষা করে কংগ্রেসের ভাবধারা প্রচার করতেন, তাঁদেরই মুখপত্র এই পত্রিকা। পূর্ববর্তী অসহযোগ আন্দোলন ও পরবর্তী তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ এবং

আইন অমান্য আন্দোলনে কর্মীসংঘের সদস্যরা যোগ দিয়েছিলেন। সেদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে কর্মীসংঘের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। লবণ সত্যাগ্রহে যে স্বেচ্ছাসেবকরা দীঘার পথে আরামবাগ থেকে যাত্রা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে এঁরাও ছিলেন। জাতীয় নৈশ বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, নানাবিধ জনহিতকর কর্মে এঁরা যোগ দিয়েছিলেন। বৈদ্যবাটী পত্রিকায় তার পরিচয় পাই।

পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের 'দেশসেবা' প্রবন্ধটি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই সংখ্যাটি জরাজীর্ণ, পাতাগুলি বিবর্ণ। এই সংখ্যার ২য় পৃষ্ঠার ১ম ও ২য় স্তম্ভে মুদ্রিত এই নিবন্ধের যতটা পাঠযোগ্য, তা এখানে উদ্ধৃত হল :

"[*] কথায় নয়, দেশসেবা মানবের শ্রেষ্ঠ সাধনা। স্বার্থগন্ধ থাকবে না, নামযশের আকাঙ্ক্ষা থাকবে না, প্রাণের ভয় পর্যন্ত থাকবে না, একদিকে দেশসেবক নিজে, আর দিকে তার দেশ, মাঝে আর কিছু থাকবে না। যশ, অর্থ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, ভাল, মন্দ, সব যে দেশের জন্য বলি দিতে পারবে দেশসেবা তার দ্বারাই হবে।

রাষ্ট্রীয় সাধনাতে নারীকেও নাবতে হবে—দেশের স্বাধীনতার জন্য নারী-পুরুষের সম্মিলিত সাধনা চাই, তা নইলে কিছু হবে না। আমি জানি ছেলেরা আর মেয়েরা যদি একসঙ্গে কাজে নামে, তাহলে দেশের লোকে নানা রকমের কুৎসা রটাবেই—তা রটাক। নিন্দুক তার কাজ করবেই, কিন্তু তাই বলে কি আমরা আমাদের কাজ বন্ধ রাখবো? দেশের জন্যে যে সুনামের প্রতিষ্ঠাই ত্যাগ কর্তে পারে না, তার আবার ত্যাগ কোথায়?

দেশের স্বাধীনতা কেউ চায় না—সবাই চায় নাম প্রতিষ্ঠা, বড় বড় বচন ঝেড়ে নেতা হতে—সত্যিকার কটা লোক পরাধীনতার জ্বালা অনুভব করে? দেশের কি দেখে আশান্বিত হব? আমাদের দেশের ছেলেরা ম্যালেরিয়ায় ভুগে মরবে তবু দেশের জন্য মহিমাময় মৃত্যুবরণ কর্তে পারবে না। দেশের জন্য লাঞ্ছনা সওয়া, দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া সে কি সোজা সৌভাগ্য? দেশ উঠবে কি করে? দেশের জন্য কি কেউ প্রা[ণ দিতে চায়?] দেশের জন্য কি কেউ ত্যাগস্বীকার কর্তে চায়? [*] যেদিন দেশের নগরে স্বার্থত্যাগী [*] জন্মাবে, সত্যিকার দেশের কাজ সেই [দিন হবে।]"

---

* কীটদষ্ট। [*] অনুমিত রচনাংশ।

প্রথম সংখ্যা চতুর্থ পৃষ্ঠায় হেমন্তকুমার সরকারের নিবন্ধ 'পরাধীনতার পাষাণ'। এ অংশটিও জরাজীর্ণ, তবে আজো পাঠোদ্ধার করা যায়। নিবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত হল :

"গলায় কলসী বেঁধে দিয়ে নদী সাঁতরে পার হতে বলা যেমন একটা বদ্ ফরমাস, তেমনি অবিচারের জগদ্দল পাষাণ জাতির বুকে চাপিয়ে দিয়ে তাকে স্বরাজের জন্য অগ্রসর হতে বলাও তাই। জগতে এত দেশ থাকতে আমরাই বা পরাধীন কেন—আর শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যায়, তবু আমাদের বাঁধন খোলে না—এর মূলে কি আছে? কেউটে সাপের বাচ্চার লেজে পা ঠেক্‌লেই যেমন সে ছোবল মারবেই, কিন্তু ঢোঁড়ার লেজটা রগ্‌ড়ে দিলেও সে কেবল পালাবার পথ দেখবে। কিংবা বড় জোর একটা অহিংস কামড় দেবে। আমাদের জাতির স্বভাবটা ঢোঁড়া জাতীয় হয়ে পড়েছে। তবে বিষ নেই কুলোপানা চক্র আছে। জাতি মরেছে জা'ত আছে। মানুষ নাই, দেশ আছে। বিদেশী শাসনে, সমাজের উচ্চবর্ণের অত্যাচারে, জমিদার, মহাজনের নির্মম শোষণে আমাদের মনটা ভোঁতা হয়ে পড়েছে—এবং ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে যেমন দড়ি কাটা যায় না, তেমনি এই ভোঁতা মন দিয়ে পরাধীনতার বাঁধন কাটা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশের বিজ্ঞগণ বলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই বাংলাদেশের সুখ সৌভাগ্যের কারণ। আমি বলি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই বাংলার বুকের জগদ্দল পাষাণ। দু-কোটি টাকা আদায়ের জন্য যে জাতি ১২ কোটি টাকা খরচ করতে বাধ্য হয়—এত বড় অবিচার নির্বিবাদে সহ্য করে, সে স্বরাজ চাইবে কেন? আমাদের দেশে যে স্বরাজের কর্মসংকল্পে ভূমিস্বত্বের কথা নাই, সে স্বরাজ আন্দোলন কখনই সফল হ'বে না। নিরস্ত্র যুদ্ধেই যদি আমাদের জয়লাভ করতে হয়, তবে খাজনা বন্ধ করাই তার একমাত্র শেষ অস্ত্র। কিন্তু এখন সে অস্ত্র ব্যবহার করতে গেলে কার গায়ে লাগে? জমিদার সে আঘাতের ভাগী হবে। আমলাতন্ত্রের হাতে টাকা গুণে দিয়ে প্রজা যখন বিনিময়ে কিছুই পাবে না—তখন সে সচেতন হয়ে নিজের দাবী আদায় করতে পারে। এখন জমিদারের সে দাবী পূরণের ক্ষমতা নাই—কারণ রাষ্ট্র তার হাতে নয়, অথচ প্রজা জমিদারের অতিরিক্ত আর কিছু দেখতে পায় না। দু-কোটি টাকা ভূমিরাজস্ব আদায়ের জন্য

জমিদার ১২ কোটি টাকা লয়—বিনিময়ে প্রজা অত্যাচার ভিন্ন কিছুই পায় না। তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান না হ'লে দেশের কল্যাণ নাই। এই জগদ্দল পাষাণ আগে সরাও—স্বাধীনতা-সংগ্রামে কোটি লোক আপনিই ছুটবে।"

শরৎচন্দ্র ও হেমন্তকুমার সরকারের রচনার সুতীক্ষ্ণ বাস্তব রাজনীতিবোধ, বৃটিশ সরকারের অত্যাচারের স্বরূপ নির্ধারণ ও জাতীয় সংগ্রামের ত্রুটি উদ্‌ঘাটন পত্রিকার সুর বেঁধে দিয়েছিল।

এবার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার 'সম্পাদকীয়' লক্ষ্য করা যাক :

"দুর্গা দুর্গতিনাশিনী জগৎজননী আসিয়াছেন। বাঙ্গালীর আজ উৎসবের দিন। যাহার যেমন অবস্থাই হউক আনন্দময়ীর আগমনে সকলে আনন্দিত। এমন সময় এই শুভলগ্নে সহসা বৈদ্যবাটীর মত স্থান হইতে বিশ্বের কল্যাণসাধ লইয়া 'বৈদ্যবাটী পত্রিকা' জন্মগ্রহণ করিবে কবির কল্পনাতেও তাহা কেহ ভাবেন নাই। সুতরাং এ সংবাদে সকলের—বিশেষত শিক্ষিত জনমণ্ডলীর বিশেষরূপে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবারই কথা। ভগবানের কোন্ আশীর্বাদে, কোন্ শুভেচ্ছায় আজ আমরা এখানে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের প্রথম প্রবর্তকরূপে অগ্রসর হইতে চলিয়াছি তাহা কে জানে! কে জানে তাঁহার কোন্ শক্তির বলে কোন্ প্রেরণার বশে এই গুরুতর কার্যের ভার মাথায় লইতে সাহসী হইয়াছি। তবে এ যুগ-মহিমায় ভরসা করিতে পারি যে দেশবাসী শিক্ষিত জনসাধারণ গ্রাহকগণের সহানুভূতি, জিতাত্মা মহাপুরুষগণের আন্তরিকতা, পরার্থপরতা ও তাঁহাদিগের ভগবদ্ভাবের আবেশ, লেখক লেখিকাগণের উৎসাহ, আনুকূল্য এবং সর্বোপরি সর্বপ্রাণ সর্বেশ্বরের শুভেচ্ছায় এই গুরুভার সহনীয় হইবে এবং সময়ে ইহা গ্রাম গ্রামান্তর ক্রমে সমুদায় বাংলাদেশে প্রসার লাভ করিতে পারিবে।"

সম্পাদকীয়ের শেষভাগে লেখা হয়েছিল—"জনসাধারণ—ভাই ভগ্নী ও আত্মীয়স্বজনগণের মধ্যে সংবাদপত্র প্রচার বৃদ্ধি করিয়া তদ্দ্বারা মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ সংস্কার উদ্দেশ্যে আমরা এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচারে ব্রতী হইয়াছি।"

পত্রিকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটি এখানে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় নি। না হওয়াই স্বাভাবিক। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে বৃটিশ রাজরোষের কথা মনে রেখে

আপাতনিরীহরূপে 'বৈদ্যবাটী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বৃটিশবিরোধী মনোভাব শরৎচন্দ্র ও হেমন্তকুমার সরকারের রচনায় ব্যক্ত হয়েছে।

প্রথম সংখ্যাতেই শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের অভিযান কবিতায় তা ব্যক্ত :

যাত্রী ওগো যাত্রাতব
সুরু হ'ল আজ। দশদিক হতে যবে ছুটে আসে
দুরন্ত ক্রন্দন, প্রবলের ক্রুদ্ধ উৎপীড়নে দুর্বলের
ক্ষীণ কণ্ঠ চিরি' উদ্ধত অন্যায় যবে দৃপ্ত অহঙ্কারে
সত্যেরে বিদ্রূপ করে আপনার ঐশ্বর্য প্রভায়, ভোগান্ধ
মানব যবে আপনার উন্মত্ত বিলাসে, ধ্বংস করি
সাধনার লীলাভূমি, কত শত তপস্যামন্দির, গড়ি
তোলে সযতনে সৌধমালা সারি সারি অতি ঘৃণ্য
কদর্য্যতা পূর্ণ যত সম্ভোগের তরে। সেই ক্ষণে পাপের
পূর্ণতা মাঝে—সত্যেরে বসাতে পুনঃ রাজসিংহাসনে—
হে যুগমানব! যুগান্তর স্রষ্টা ওগো হে মহাতাপস!
যাত্রা তব সুরু হল আজ।

এই কবিতার জাতীয়তা প্রেরণা-মন্ত্রটি পাঠকের শ্রুতিকে এড়িয়ে যায় না।

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৮ আশ্বিন ১৩৩২ বঙ্গাব্দ) রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহের উপর 'টিপ্পনি' লিখেছেন শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসরোজকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। টিপ্পনির বিষয়—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অসমাপ্ত পল্লীসংগঠন-ব্রত, 'বিজলী'তে (পূজাসংখ্যা ১৩৩২) নজরুল ইসলামের 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতার প্রশংসা, মহাত্মা গান্ধীর চিরবাঞ্ছিত হিন্দু-মুসলমান মিলনের পরিকল্পনার ক্ষীণপ্রাণতা সম্পর্কে কটাক্ষ।

প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যার উল্লেখযোগ্য রচনা রাজনৈতিক কর্মী শ্রীসতীশচন্দ্র দাসের 'বঙ্গে নষ্ট-রেশম ও পশমশিল্প', শ্রীসরোজকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভাবিবার কথা' (স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নিম্নবর্ণ হিন্দুদের সম্পর্কে প্রচারিত আবেদনের আলোচনা), শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'জাতীয় শিক্ষা সংসদ' বিবরণী—হুগলির বিদ্যামন্দিরের অনুষ্ঠান। এই সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় বড়ো হরফে ঘোষণা :

"রাখি-বন্ধন

আগামী ৩০শে শুক্রবার রাখি-বন্ধন। এইদিন বঙ্গজননীর পুত্র কন্যাগণ জননী জন্মভূমির সেবার জন্য স্বদেশী ব্রত অবলম্বন করিয়া পরস্পর পরস্পরের হাতে প্রাণের মিলন-স্মৃতি রক্ষার জন্য এই পবিত্র রাখি-বন্ধন করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালীর জাগরণ ও মিলনের সেই পুণ্যস্মৃতি—এই রাখি-বন্ধন প্রথা বাঙ্গালীর চিরস্মরণীয়।"

প্রথম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় 'সেবক' শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের পত্রিকার দায়িত্বভার বর্জন ও বিদায় গ্রহণ, 'আমার কৈফিয়ৎ'এ তাঁর উক্তি— "আমি মুক্তিকামী, আমি চণ্ড, আমি বিপ্লবী।......শান্তির মন্ত্র, সংযমের সাধনা আমার জন্য নয়।" (১৬ অক্টোবর ১৯২৫ খ্রীঃ)

প্রথম বর্ষ অষ্টম সংখ্যা (রবিবার ৬ অগ্রহায়ণ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ) থেকে অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী (সেনশর্মা)-র দীর্ঘ কবিতা 'মহাভারত' প্রকাশিত হতে থাকে। এ এক নব মহাভারত—সূচনাংশ (আশা):

চাষী ভাই তাঁতী ভাই আর ভাই যত।
ভারতের দুঃখ কথা শুন অবহিত ॥
গাহিব ভারতকথা দুখময় বাণী।
বাজিবে হৃদয়বীণা বিষাদ রাগিণী ॥
ভাঙ্গিবে মোহের বাধা নয়নের জলে।
মিলিত হইবে সবে গলি দুখানলে ॥...
কোথায় সে দিন হায়, কোথায় সে দিন।
স্বরাজে যে দিন সব দুঃখ হবে লীন ॥
ভারতের দুঃখকথা দুঃখী জন গায়।
পায়ের শিকল যেন খসে গো ত্বরায় ॥

প্রথম বর্ষ ঊনবিংশ সংখ্যার (রবিবার ২ ফাল্গুন ১৩৩২ বঙ্গাব্দ) পরবর্তী সংখ্যা দেখি নি। বোধ হয় এর পর পত্রিকা কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এই সংখ্যার পত্রিকার মূল্য ছিল প্রতি সংখ্যা এক পয়সা (৫ গণ্ডা)। একটি পুরনো সংখ্যায় (১৯২৬ খ্রীঃ) আবদুল হালিমের একটি প্রবন্ধ "মুক্তিপথ"— প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে: "কৃষক ও শ্রমিক দলকে কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।" প্রবন্ধ-সূচনায় লেখা আছে: "মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।"

কিছুকাল বিরতির পর শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় বৈদ্যবাটী পত্রিকা পুনঃ প্রকাশিত হয়। এবার প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা, বার্ষিক মূল্য দু টাকা। নব পর্যায় প্রথম সংখ্যাকে বলা হয়েছে—১ম বর্ষ, ৩৬শ সংখ্যা। সোমবার ৫ নভেম্বর ১৯২৮ খ্রীঃ, ১৯ কার্তিক ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা সংখ্যা হয়েছে বারো।

এই সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের (দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র) আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। ডিসেম্বর ১৯২৮-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য নিখিল ভারতীয় কৃষক শ্রমিক দল সম্মিলন (The First All India Workers and Peasants Party Conference)-সংবাদকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

নব পর্যায় প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়—'কি করা চাই'। জাতীয় জীবনে এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করেছেন সম্পাদক। "আজ দেশের নেতৃত্ব নিতে হবে দেশের লোকের নিজের হাতে।......ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য চাই গণআন্দোলন, Mass Movement। দেশের দারিদ্র্য মোচনের জন্য দরকার অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম, শোষকশ্রেণীর হীন শোষণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সংগ্রাম। ......এ আন্দোলন পরিচালনা করবে দরিদ্র নগণ্য বুভুক্ষিত সঙ্ঘবদ্ধ জনসাধারণ, যাদের নাম স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় দরিদ্রনারায়ণ। কার্লমার্ক্সের ভাষায় প্রলিটারিয়েট।"

পত্রিকার চরিত্র দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, তার ইঙ্গিত এখানে পাই। এই সংখ্যাতেই সংবাদ দেওয়া হয়েছে, সম্প্রতি (অক্টোবর ১৯২৯ খ্রীঃ) রাজবন্দী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ (চুঁচুঁড়া) ও নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া) মুক্তিলাভ করেছেন। এ সংখ্যায় নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক নিবন্ধ 'আমাদের কর্তব্য' প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মতে "সর্বপ্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইতেছে—স্বাবলম্বী হওয়া।" জেলার লুপ্তপ্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধারের আহ্বান তিনি দিয়েছেন।

এই সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় 'বাংলার সভ্যতা-গৌরবের শুভ্রতম বিভা' শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লোকান্তর প্রাপ্তির সংবাদ মুদ্রিত হয়েছে। সেই সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে।

পত্রিকার সোমবার ১২ নভেম্বর ১৯২৮ খ্রীঃ, ২৬ কার্তিক ১৩৩৫-সংখ্যায় সম্পাদকীয় 'আমাদের কাম্য স্বাধীনতা' খুব স্পষ্ট ভাষায় পূর্ণ স্বাধীনতার

দাবিকে তুলে ধরেছে। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন নয়, পূর্ণ স্বরাজই কাম্য।

এই সংখ্যার শেষে পরবর্তী সংখ্যাগুলির লেখকদিগের তালিকা ঘোষিত হয়েছে। এটি লক্ষণীয় :

নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকুমার সেন, শচীন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, কাজি নজরুল ইসলাম, হেমন্তকুমার সরকার, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। সোমবার ৩ ডিসেম্বর ১৯২৮, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ (১ম বর্ষ ৩৮-৩৯ যুগ্মসংখ্যা) তারিখে প্রকাশিত সংখ্যায় কাজি নজরুল ইসলামের 'নগদ কথা' নামে একটি কবিতা মুদ্রিত হয়। তা এখানে উদ্ধার করি :

দুন্দুভি তোর বাজল অনেক।
অনেক শঙ্খ ঘন্টা কাঁসর।
মুখস্থ তোর মন্ত্ররোলে
মুখর আজি পূজার আসর,—
কুম্ভকর্ণ দেব্‌তা ঠাকুর
জাগবে কখন সেই ভরসায়
যুদ্ধভূমি ত্যাগ করে সব
ধান্না দিলি দেব-দরজায়।
দেবতাঠাকুর স্বর্গবাসী
নাক ডাকিয়ে ঘুমান সুখে।
সুখের মালিক শোনে কি—কে
কাঁদছে নীচে গভীর দুখে!
হত্যা দিয়ে রইলি পড়ে
শত্রু হাতে হত্যা-ভয়ে,
করবি কি তুই ঠুঁটো ঠাকুর
জগন্নাথের আশীষ লয়ে!
দোহাই তোদের! রেহাই দে ভাই
ঔ চুর ঠাকুর দেবতাদেরে,
শিব চেয়েছিস শিব দিয়েছেন
তোদের ঘরে ষণ্ড ছেড়ে!
শিবের জটার গঙ্গাদেবী
বয়ে বেড়ান ওদের তরী

ব্রহ্মা তোদের রম্ভা দিলেন
ওদের দিয়ে সোনার জরি!
পূজার থালা বয়ে বয়ে
যে হাত তোদের হল ঠুঁটো,
সে হাত এবার নীচু করে
টান না পায়ের শিকল দুটো।
ফুটো তোর ঐ ঢক্কা নিনাদ
পলিটিক্সের বারোয়ারীতে—
দোহাই থামা! পারিস যদি
পড় নেমে ঐ লাল নদীতে
শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে
গয়া সবাই গেলি ক্রমে।
একটু দূরেই যমের দুয়ার
সেথাই গিয়ে দেখ না ভ্রমে!

বৈদ্যবাটী পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের (নব পর্যায় প্রথম বর্ষের) আর কোনো সংখ্যা দেখবার সুযোগ হয় নি। কয়েক বৎসর যাবৎ প্রকাশিত এই সাপ্তাহিক ১৯২৫-২৮-৩০ খ্রীস্টাব্দে হুগলি জেলার গ্রামাঞ্চলে ও শহরে যথেষ্ট উদ্দীপনা এবং দেশসেবী কর্মীদের উৎসাহ সঞ্চার করেছিল। সেই সঙ্গে স্মরণীয় অবরোধবাসিনী নারীদের সক্রিয় সহযোগিতা। বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বেকার মফঃস্বল বাংলার এই সাপ্তাহিক পত্রিকার ইতিহাসমূল্য অবশ্যস্বীকার্য।

গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধন ও বাঙালি লেখক

এলিঅট একদা বলেছিলেন, কবিরা স্বভাবত গদ্যের সুলেখক। তাঁর মতে, গদ্যরচনায় কবিদের সিদ্ধি তাঁদের বিচিত্রগামী প্রতিভাকে প্রমাণ করে না, বরং এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করে যে, শিল্পচর্চা প্রকারভেদের মুখাপেক্ষী নয়। কবি যখন গদ্যরচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন স্বকীয় চিন্তাধারার সরলবাহন হিসেবে তিনি গদ্যকে গ্রহণ করেন না, তার মধ্যে কাব্যশোভন লাবণ্যের আবিষ্করণে যত্নশীল হন। এবং তা থেকেই প্রমাণ হয় যে গদ্য পদ্য আসলে একই উৎসজাত, গদ্যচর্চাও শিল্পচর্চা।

আজও ভারতীয় সমাজজীবনে বর্ণাশ্রম ধর্ম যেমন দৃঢ়ভিত্তিক, আমাদের সাহিত্যসমাজে গদ্য-পদ্যের বর্ণাশ্রম তেমনি দুরপনেয় হয়ে আছে। কয়েকটি সুলভ ভ্রান্তি আজো আমাদের পরিচালিত করে; যেমন—কবিতা বলতে সমিল কবিতার অনন্য সমাদর, শব্দ ব্যবহারের ও বিন্যাসপদ্ধতির প্রতি বিমুখতা, মাত্রাবিন্যাসই গদ্যপদ্যের পার্থক্যসীমা বলে বিশ্বাস, গদ্য ও পদ্যের স্বতোবিরুদ্ধতায় আস্থা। এ সবই ভ্রান্ত ধারণা।

এইসব ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে যে-সব শিল্পী লড়াই করেছেন, তাঁদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যক্ষেত্রে আছেন ওয়েবস্টার, কলিন্স, পোপ, বার্নস, শেকসপীঅর, ওঅর্ডস্ওঅর্থ, বায়রন, টেনিসন, হুইটম্যান, ব্রাউনিং, এমিলি ডিকিনসন, এলিঅট।

গদ্য ও পদ্যের মধ্যে যে উপাদানগত পার্থক্য, তার পরিচয় দিতে গিয়ে মারজোরি বোল্টন ('দি অ্যানাটমি অফ প্রোজ', ১৯৫৪) তিনটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন।

প্রথমত, পদ্যের ছন্দ (রীদম্) নির্ভর করে পর্ব ও মাত্রাগত ছাঁচের (প্যাটার্নের) নিয়মিত পুনরাবৃত্তির উপর। অন্ত্যমিল, অন্তর্মিল, স্বরধ্বনির মিল, অনুপ্রাস, ধ্রুবপদের ছাঁচও পদ্যে ব্যবহৃত হয়। গদ্যের ছন্দ নির্ভর করে বৈচিত্র্যের উপর। গদ্যে চরণ ও মিলের ব্যবহার দোষ বলেই গণ্য হয়।

দ্বিতীয়ত, গদ্যে ও পদ্যে শব্দের কাজ এক নয়। পদ্যে শব্দের স্পষ্ট অর্থ

সব সময় দাবি করা হয় না। দ্ব্যর্থবোধক ও অনুকার শব্দ পদ্যে ব্যবহৃত হয়, কখনো বা অর্থ ছেড়ে ছন্দের খাতিরেই শব্দের ব্যবহার ঘটে কিন্তু গদ্যে শব্দের ব্যবহার হয় প্রয়োজনের খাতিরে, নির্দিষ্ট অর্থের প্রকাশে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে শব্দের যে একটিমাত্র অপরিবর্তনীয় অর্থ, তার দিকে লক্ষ্য রেখেই পদ্যে শব্দ প্রয়োগ করা হয়। স্বচ্ছতা বা স্পষ্টতা (ক্ল্যারিটি) গদ্যের প্রধানতম গুণ, পদ্যে তা অপ্রধান। গদ্যে চাই স্পষ্টতা, পদ্যে ইশারা।

তৃতীয়ত, সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে ও ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধনে শব্দের যে ব্যবহার, তা গদ্যকে করে তুলেছে চিন্তার ভাষা, মননের ভাষা, কাজের ভাষা। পদ্য এইসব উদ্দেশ্য সাধন করে না। পদ্য আমাদের আনন্দ বেদনাকে, হৃদয়ানুভূতিকে প্রকাশ করে বলে আলংকারিক রূপ ধারণ করে, স্পষ্টতা ছেড়ে ব্যঞ্জনায়, প্রত্যক্ষতা ছেড়ে অপ্রত্যক্ষতায়, অর্থ ছেড়ে ধ্বনিতে সার্থকতা খুঁজে পায়। পদ্যে যে আবেগ ও অনুভূতি ব্যক্ত হয়, তা গদ্যে ব্যক্ত আবেগ-অনুভূতি থেকে তীব্রতর।

গদ্য ও পদ্যের মধ্যে উপাদানগত ব্যবধান এখানে লক্ষ্য করা হয়েছে। কিন্তু দুয়ের মধ্যে মিল আছে একটি ক্ষেত্রে—সিমিলি ও মেটাফর্-এর ব্যবহারে। উপমা উৎপ্রেক্ষা ও রূপক অলংকার ব্যবহারের স্বাধীনতা ও সুযোগ দুয়েরই আছে। এই মেটাফর বহিরঙ্গ অলংকার নয়, স্টাইলেরই অঙ্গীভূত।

উপমা উৎপ্রেক্ষা রূপক (সিমিলি-মেটাফর) আমাদের কী দেয়? অ্যারিস্তোতল এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন—স্বচ্ছতা (ক্ল্যারিটি), স্ফূর্তি (ডিলাইটফুল্‌নেস) ও নবীনতা (আন্‌ফ্যামিলিয়ারিটি) ('Rhetoric'. III, 2)। এই তিনটি গুণ কেউ কাউকে ধরে দিতে পারে না, নিজেকেই অর্জন করতে হয়। সার্থক গদ্যরচয়িতার লেখায় এই গুণগুলি ধরা পড়ে।

আর যেখানে এইসব স্বতোৎসারিত, সেখানেই গদ্য-পদ্যের কৃত্রিম ব্যবধান ভেঙে যায়, গদ্য-পদ্য পরস্পরের সন্নিহিত হয়।

ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যান্দোলনের পুরোধা ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ পদ্যকে প্রাত্যহিক জীবনের সমীপবর্তী করতে চেয়েছিলেন বলেই অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি পদ্যভাষায় কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। কবিতার ব্যাকরণনির্দেশ শিরোধার্য করে কবিতারচনার দিন অবসিত, একথা তিনিই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন। কবিতায় তিনি প্রাত্যহিক সংলাপকে আভাসিত করতে চেয়েছিলেন।

A violet by a mossy stone
Half-hidden from the eye!
—Fair as a star, when only one
Is shining in the sky.

এখানে ওঅর্ডসওঅর্থ যদিচ অন্ত্যমিল ও মাত্রার ছাঁচকে পরিত্যাগ করেন নি, তথাপি প্রাত্যহিক গদ্য-উচ্চারণরীতি এ কবিতাংশ থেকে সম্পূর্ণ বর্জিত নয়।

ওঅর্ডসওঅর্থ-এর অনেক আগে শেকসপীঅর তাঁর সনেটগুচ্ছে গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনে যত্নপর হয়েছিলেন।

শেকসপীঅরের গোড়ার দিকের ট্রাজেডি 'ম্যাকবেথ' ও শেষ দিকের ট্রাজেডি 'হ্যামলেট'—দুয়ের সূচনা-দৃশ্যের সংলাপ পাশাপাশি রাখলে দেখা যায়, নাট্যকার প্রথমোক্ত নাটকের সূচনায় যে আকস্মিক লিরিক ব্যবহার করেছেন, শেষোক্ত নাটকের সূচনায় তা পরিহার করে প্রাত্যহিক সংলাপের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং তার মধ্য থেকেই এক ভৌতিক শিহরণ সৃষ্টি করেছেন।

ম্যাকবেথ নাটকের সূচনা-দৃশ্য :

[Thunder and lightning. Enter the Witches]

1 Witch : When shall we three meet again?
In thunder, lightning, or in rain?

2 Witch : When the hurlyburly's done,
When the battle's lost and won.

3 Witch That will be ere the set of Sun.

1 Witch Where the place?

2 Witch Upon the heath.

3 Witch There to meet with Macbeth.

1 Witch I come, Graymalkin.

2 Witch Paddock calls.

3 Witch Anon!

All. Fair is foul, and foul is fair,
Hover through the fog and filthy air.

[Witches Vanish.]

হ্যামলেট নাটকের সূচনা-দৃশ্য :

[Elsinore. The guard-platform of the Castle. Francisco at his post. Enter to him Bernardo.]

Ber : Who's there ?

Fran : Nay, answer me. Stand and unfold yourself.

Ber : Long live the king !

Fran : Bernardo ?

Ber : He.

Fran : You come most carefully upon your hour.

Ber : 'Tis now struck twelve ; get thee to bed,
Francisco.

Fran : For this relief much thanks. 'Tis bitter cold.
And I am sick at heart.

Ber : Have you had quiet guard ?

Fran : Not a mouse stirring.

Ber : Well, good night.
If you do meet Horatio and Marcellus,
The rivals of my watch, bid them make haste.
[Enter Horatio and Mercellus.]

Fran : I think I hear them. Stand, ho ! Who is there ?

Hor : Friends to the ground.

Mar : And liegemen to the Dane.

Fran : Give you good night.

Mar : O, Farewell, honest soldier !
Who hath reliev'd you ?

Fran : Bernardo hath my place.
Give you good night. [Exit]

Mar : Holla, Bernardo !

Ber : Say—
What, is Horatio there ?

Hor : A piece of him.

Ber : Welcome, Horatio ; welcome, good Marcellus.

Hor : What, has this thing appear'd again to-night ?

Ber : I have seen nothing.

Mar : Horatio says 'tis but our fantasy,
And will not let belief take hold of him
Touching this dreaded sight, twice seen of us ;
Therefore I have intreated him along with us
to watch the minutes of this night,
That, if again this apparition come,
He may approve our eyes and speak to it.

Hor : Tush tush, 'twill not appear.

Ber : Sit down a while,
And let us once again assail your ears, that are
so fortified against our story,
What we have two nights seen.

Hor : Well, sit we down.
And let us hear Bernardo speak of this.

Ber : Last night of all,
When yond same star that's westward from the
pole.
Had made his course t' illume that part of heaven.
Where now it burns, Marcellus and myself,
The bell then beating one—

[Enter Ghost]

Mar : Peace, break thee off ; look where it comes again.

Ber : In the same figure, like the King that's dead.

Mar : Thou art a scholar ; speak to it, Horatio.

Ber : Looks'a not like the King ? Mark it, Horatio.

Hor : Most like. It harrows me with fear and wonder.

Ber : It would be spoke to.

Mar : Question it, Horatio.

Hor : What art thou that usurp'st this time of night
Together with that fair and warlike form.
In which the majesty of buried Denmark
Did sometimes march ?
By heaven I charge thee, speak !

প্রাত্যহিক সংলাপের ছন্দকে বজায় রেখে নাট্যকার কী কৌশলে ভাষাকে ভৌতিক শিহরণ ও আবেগের বাহনে পরিণত করেছেন, তা এখানে লক্ষণীয়। এই ভাষা কোথাও লঘু তরল হয় নি, অথচ মৃত নৃপতির প্রেতের আবির্ভাবে এক শিহরণ সমস্ত সংলাপে নিশ্চিত অলক্ষিত গতিতে সঞ্চারিত হয়ে গেছে। এখানে গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনের প্রথম সূচনা হয়েছে।

'ম্যাকবেথ' ও 'হ্যামলেট' নাটকের সূচনা-দৃশ্যের বিচারপ্রসঙ্গে কোলরিজের সিদ্ধান্ত এখানে স্মরণযোগ্য :

Compare the easy language of common life, in which this drama (Hamlet) commences, with the direful music and wild wayward rhythm and abrupt lyrics of the opening of Macbeth. The tone is quite familiar ;—there is no poetic description of night, no elaborate information conveyed by one speaker to another of what both had immediately before their senses ; and yet nothing bordering on the comic on the one hand, nor any striving of the intellect on the other. It is precisely the language of sensation among men who feared no change of effiminacy for feeling what they had no want of resolution to bear. Yet the armour, the dead silence, the watchfulness that first interrupts it, the welcome relief of the guard, the cold, the broken expressions of compelled attention to bodily feelings still under control—all excellently accord with, and prepare for, the after gradual rise into tragedy ;—but, above all, into a tragedy, the interest of which is as

eminently *ad et apud intra,* as that of Macbeth is directly *ad extra.*

['Literary Criticism', The Selected Poetry and Prose of S. T. Coleridge, pp. 459-60.]

গদ্য ও পদ্যের স্বতোবিরুদ্ধতায় অনাস্থার সূচনারূপে 'হ্যামলেট' নাটকের সূচনাদৃশ্যকে গ্রহণ করা যায়। গদ্য পদ্য পরস্পর বিরোধী তো নয়ই, বরং একে অন্যের পরিপুষ্টি সাধন করে, শেকসপীঅরের শিল্পস্বভাবে তা ধরা পড়েছিল। তাঁর সনেটগুচ্ছ তার প্রমাণ। শেকসপীঅরের দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও ওঅর্ডসওঅর্থ গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনে ততটা সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। এবং ব্রাউনিঙও পারেন নি। কিন্তু এ দের ব্যর্থতা থেকেই আমরা হুইটম্যান, এমিলি ডিকিনসন ও এলিঅটের সাফল্যে উপনীত হই। স্বীকার্য, এঁরা সকলেই কথ্য রীতিকে কাব্যে যোগ্য মর্যাদা দিতে চেয়েছেন এবং কম-বেশি সাফল্য অর্জন করেছেন।

এলিঅট কাব্যে কথ্য রীতিকে যোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন, কবিতায় গদ্যের ধর্ম ও কথ্যরীতির স্পন্দন রক্ষা করেছেন, এবং আমাদের মানতেই হয়, কথ্যরীতি তাঁর কবিতার অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ, আর তা উন্নীত চৈতন্যেরই ভাষা। এলিঅটের কবিতার ভাষা আটপৌরে কথ্যভাষা নয়, তা কথ্যরীতির ভাষা, এবং গদ্য-পদ্যের যোজক। এলিঅট বিশ্বাস করতেন, কবিতা কবির আত্মসংগ্রামেরই বাণীমূর্তি; আত্মসংগ্রাম যত তীব্র হবে, কবিতা ততই কথ্যরীতির দিকে ঝুঁকবে, কবিপ্রসিদ্ধির কুসুম-শয়ন ছেড়ে গদ্যের কঠিনোজ্জ্বল ধর্মের মধ্যেই পাবে অন্বিষ্ট উৎসকে। এলিঅটের নিম্নধৃত কবিতায় কথ্যরীতির শিল্পোরূপ লক্ষণীয় :

After such knowledge, what forgiveness? Think now
History has many cunning passages, contrived corridors
And issues, deceives with whispering ambitions,
Guides by vanities. [Gerontion.]

এই কবিতাংশে গদ্যের ধর্ম ও কথ্যরীতির স্পন্দন যে সুরক্ষিত আছে, তার পরিচয় 'cunning passages', 'contrived corridors' শব্দাবলীর অভিঘাতে। এলিঅটের এই শিল্পসাফল্য গদ্য-পদ্যের বিরোধ ও ভ্রান্ত ধারণার অপনোদনে সক্ষম হয়েছে। 'দি মিউজিক অফ্ পোয়েট্রি' প্রবন্ধে (পৃ ৩১) এলিঅট

এই বক্তব্য সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে-গদ্য পদ্যের অদ্বৈতোপলব্ধির ধারাটি এবার সন্ধান করা যেতে পারে।

এর প্রথম সূচনা ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় যদিচ, সাফল্য তাঁর অনায়ত্ত।

ঈশ্বর গুপ্তের ভাষারীতির আদর্শ কি? সংস্কৃত ও ইংরেজি গদ্যের আদর্শ ঈশ্বর গুপ্ত গ্রহণ করেন নি, করেছিলেন বিদ্যাসাগর। ঈশ্বর গুপ্তের আদর্শ ছিল বাংলার মৌখিক ভঙ্গি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বাংলা ভঙ্গিওয়ালা ভাষা'। সুতরাং একথা স্বীকার্য, ঈশ্বর গুপ্তের গদ্যভাষার ভিত্তি বাংলা মৌখিক ভঙ্গি, তাকে তিনি সংবাদপত্রের উপযোগী করে গড়ে তুলেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত কবির দলে গান বাঁধতেন, এই ঘটনার তাৎপর্য এখানেই নিহিত। সংস্কৃত ও ইংরেজি প্রভাবমুক্ত এই খাঁটি বাংলা অর্থাৎ মৌখিক ভঙ্গির বাংলার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

"যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায় আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই।...বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহ লেখেন নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনা নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই দুটি উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ।

ঈশ্বর গুপ্তের পদ্য ও গদ্যের একই রীতি—খাঁটি বাংলা রীতি। তাঁর পদ্যভাষা কথ্যভঙ্গির রীতিতে গঠিত (পয়ারের অলঙ্ঘনীয় শাসন ছাড়া তার মধ্যে কাব্য-ভাষার নামগন্ধ নেই), আসলে তা সংবাদপত্রের ভাষা—সাংবাদিকের কলমে লেখা পদ্যভাষা।

এই পদ্যভাষার অনেক ছত্রই আজ প্রবাদে পরিণত, জনচিত্তে তা স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

কলকাতার বর্ণনা : রেতে মশা দিনে মাছি।
এই তাড়য়ে কল্‌কেতায় আছি।

ঈশ্বর সম্বোধন : তুমি হে আমার বাবা। হাবা আত্মারাম।

বিবিদের বর্ণনা : বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে।

বা বিবিজান চলে যান, লবেজান করে।

বঙ্গদেশ সম্বন্ধে স্মরণীয় উক্তি : এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা।

দেশপ্রেমমূলক উক্তি : কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি।
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার ব্যঙ্গপ্রচ্ছন্ন স্তুতি—পদ্যের চরণবিভাগ তুলে দিলে একে গদ্যভাষা বলে অনায়াসে চালানো যায়: তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গোরু। / শিখি নি শিং বাঁকানো, কেবল খাব খোল বিচিলি ঘাস। / যেন রাঙা আমলা, তুলে মামলা/গামলা ভাঙে না। আমরা ভুষি পেলেই খুশি হব/ঘুসি খেলে বাঁচব না।

এই পদ্যাংশে গদ্যের চেহারা আছে। কিন্তু গদ্যের ধর্ম ও কথ্যরীতির স্পন্দন সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত সচেতন ছিলেন না বলে শিল্পসাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। গদ্য-পদ্যের অদ্বৈতোপলব্ধি এখানে অনায়ত্ত, কিন্তু তার প্রচ্ছন্ন সূচনা ঘটেছে।

গদ্যশিল্পী বঙ্কিম তাঁর শিল্পবুদ্ধিতে জানতেন যে, ফারসি-প্রভাব বর্জনেই বাংলা গদ্যের মুক্তি, সংস্কৃত ভাষার ছন্দঃস্রোত ও ইংরেজি বাক্যাদর্শ-স্বীকরণেই তার ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। তাই প্রশংসা সত্ত্বেও তিনি টেকচাঁদী রীতিকে গ্রহণ করেন নি, নিন্দা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরী রীতি আত্মসাৎ করেছিলেন। টেকচাঁদী (বা আলালী) গদ্যরীতির কোন উত্তরপুরুষ নেই, বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতি উত্তরপুরুষদের মধ্য দিয়ে নিজেকে সফল করে তুলেছে। বঙ্কিমীরীতি তার কীর্তিমান উত্তরপুরুষ।

বরং হুতোমী ভাষার শিল্পসম্ভাবনা আলালী ভাষা অপেক্ষা বেশি। বঙ্কিমের নিন্দা সত্ত্বেও হুতোমী ভাষার সরসতা, লঘুতা, ধাবৎশক্তি ও অদম্য প্রাণশক্তি আমাদের প্রশংসা কাড়ে। নিছক কথ্যভাষার শক্তি কতোটা, তার পরীক্ষা কালীপ্রসন্ন সিংহ করেছিলেন 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য়। এর ভিত্তি খাঁটি কলকাত্তাই উপভাষা। স্বামী বিবেকানন্দ ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের ভাষা-রীতিতে এই কথ্যরীতির অনুসৃতি অনায়াসলক্ষণীয়। এখানেই হুতোমী ভাষা সফল।

"আজ নবমী; আজ পূজোর শেষ দিন; এতদিন লোকের মনে যে আহ্লাদটি জোয়ারের জলের মত বাড়তেছিল, আজ সেইটির একেবারে সারভাটা।" (হুতোম প্যাঁচার নকশা, ১৮৬২)

এই ভাষা কলকাত্তাই উপভাষার প্রতি অনুগত। কথ্যরীতির প্রাণশক্তি এখানে প্রকাশ পেয়েছে লঘুতায় ও ধাবৎশক্তিতে।

প্রাকৃতভাষার প্রতি কালীপ্রসন্ন সিংহের পক্ষপাত, স্বামী বিবেকানন্দ ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের রচনায় সমর্থিত।

"যে ভাষা যথার্থই স্বকীয়—যার সাহায্যে নিজের কথা নিজের কাছে পৌঁছায়, তাতে সাধু সাহিত্যের কৃত্রিম শুদ্ধি অচল।" (পুনশ্চ, ১৮ জুন, ১৯৫৬, 'স্বগত' ২য় নং, ১৯৫৭)।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এই মূল্যবান মন্তব্য শতাব্দী-পূর্বে হুতোমী ভাষায় স্বীকৃত।

সর্বকর্মে কথ্যভাষাকে কালীপ্রসন্ন ব্যবহার করেন নি, করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', 'পরিব্রাজক', 'ভাববার কথা' ও 'পত্রাবলী'তে (রচনাকাল ১৮৯৩-১৯০০)।

'পরিব্রাজক' গ্রন্থের সামান্য উদাহরণে উপলব্ধি করা যায়, নিপুণ শিল্পীর কলমে কথ্যভঙ্গিম গদ্যরীতির প্রাণশক্তি কত দুর্বার।

"জলে কি আর রূপ নেই? জলে জলময়, মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপরে দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, রাশি রাশি তাল নারিকেল, খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে যে ধারাসম্পাত বইছে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ—এতে কি রূপ নাই? সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ, তাল নারিকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেলছে, তার নীচে ফিকে ঘন, ঈষৎ পীতাভ, একটু কালো মেশান, ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি ঢালা আম নীচু জাম কাঁটাল—পাতাই পাতা—গাছ ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না, আশেপাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলছে দুলচে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দী ইরাণি তুর্কিস্থানি গাল্‌চে দুল্‌চে কোথায় হার মেনে যায়, সেই ঘাস, যত দুর যাও, সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুটে ঠিক করে রেখেছে।"

আশ্চর্য স্বভাবানুগামী আলেখ্য। সত্যেন্দ্র দত্তের চিত্ররস, অবনীন্দ্রনাথের বাকস্পন্দ, বাণভট্টের ও পিয়ের লোতির বর্ণসমারোহ মনে করিয়ে দেয় এই বর্ণনা। স্বভাবোক্তি ও উৎপ্রেক্ষার কী নিপুণ ব্যবহার, বর্ণসমারোহের কত সুনির্বাচিত বিশ্লেষণ, কতো বর্ণধ্বনিময় রূপচিত্র এখানে সিদ্ধশিল্পীর হাতে অনুরূপ সুষমা লাভ করেছে। বাক্যগুলি মনে হয় দীর্ঘ—আসলে তা একটি ছবি, খণ্ড চিত্রযুক্ত উপবাক্যের সমষ্টি। এর সংযোজন-কৌশলটি দক্ষ হাতের। আটপৌরে ভাষা, ঘরোয়া ইডিয়ম, বাক্‌স্পন্দ—সবটা মিলিয়ে এক অখণ্ড শিল্পরূপ, যার মূলে আছে প্রাকৃতভাষার প্রতি আনুগত্য।

গিরিশচন্দ্রের নাটকের গদ্য সংলাপ কলকাত্তাই উপভাষার ভিত্তিতে রচিত। গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনে গিরিশচন্দ্র সচেতন ছিলেন কিনা তা স্পষ্ট করে বলা কঠিন। 'গৈরিশ ছন্দে'র ভারী চাল থেকে তা ভিন্নতর, অক্ষর বৃত্তের আশ্রয় ছেড়ে তা স্বরবৃত্তকে অবলম্বন করেছে। তানপ্রধান ছন্দের heavy drawl আছে গৈরিশ ছন্দে। কিন্তু গদ্য-সংলাপে আছে শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের চটুলতা। যেমন,

জনার উক্তি—

পতির মঙ্গল যদি চাহ, গুণবতি,
ইষ্টদেবে পূজা কর পতির কল্যাণে।
রাজকার্য পুরুষের ভার,
অংশী তুমি কেন হও তার? ['জনা' ২।১]

বিদূষকের উক্তি—

নিন্দে কেন? তোমার শ্রীহরির গুণ!
যেখানে যান—জ্বালান আগুন।
যদি পদার্পণ হ'লো মথুরায়,
অমনি সেখানে উঠ্‌লো হায় হায়!

পদ্য-সংলাপের ছন্দ অক্ষরবৃত্ত, চলন ভারী। গদ্য-সংলাপের ছন্দ ছড়ার ছন্দ, চলন লঘু।

গিরিশ-নাটকের গদ্য-সংলাপ অনেক সময় পদ্যভঙ্গিম। যেমন, 'জনা' নাটকের বিদূষকের গদ্য-সংলাপ, তাকে মিত্রাক্ষর গদ্যরূপেও সাজানো যায়। যেমন,

আমিই কি আর একলা জানি, তুমিই কি আর জান না
আমায় পেয়েছ কি ধান কানা?
শুন্‌বে তোমার দয়াময় হরির গুণ বর্ণনা?
পাথর চাপালেন মা-বাপের বুকে,
তারপর বৃন্দাবনে ঝুঁকে—
গোপ-গোপিনীর হাড়ির হাল,
যশোদা মাগী নাকাল,
অবোধ রাখাল
কেঁদে সারা

নন্দ মিন্‌সে দিশেহারা
আর রাধা ?
তার কাঁদা
সার,
এক শবচ্ছর দেখলে আঁধার
এদিকে দয়াময় হরি যমুনা পার।
কান দেন না কথায় কার,
যেন কারুর কখনও ধারেন না ধার। ['জনা', ১।১]

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য এই গদ্য-সংলাপকে বলেছেন, পদ্যের সুরে বাঁধা, "ভাষা লঘু হইলেও সাধুভাবাপন্ন" (তৎসম্পাদিত 'জনা' ৩য় সং ১৩৭৫, ভূমিকা, পৃ ৮৮)। আমার ত মনে হয় ভাষা এখানে কথ্যভঙ্গিম। একে 'সাধুভাবাপন্ন' বলতে মন চায় না। এখানে স্মর্তব্য 'জনা' (১৮৯৪) ও বিবেকানন্দের কথ্যরীতির গদ্যরচনা একই কালে রচিত।

কথ্যরীতি বলতে এখানে ইঙ্গিত করছি, বাঙালির মুখের ইডিয়ম নির্ভর যে রীতি। পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের রূপভেদের উপর সাধুরীতি বা কথ্যরীতি নির্ভরশীল নয়। এ সত্য এ আলোচনায় অবশ্যস্মর্তব্য।

এই কথ্যরীতি, কথ্যস্পন্দ, ও কথ্যভঙ্গির চর্চা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও সুধীন্দ্রনাথের রচনায় লক্ষণীয়।

গদ্য-পদ্যের আত্মীয় সম্পর্ক শিল্পীমন্য মুখাপেক্ষী এবং গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধের মধ্য দিয়েই যে শিল্পসৃষ্টি সম্পূর্ণ—এ কথার প্রথম উপলব্ধি রবীন্দ্র-রচনায়। ঈশ্বর গুপ্তে যার আভাস, বঙ্কিমে ও প্যারীচাঁদে ব্যর্থতা, কালীপ্রসন্ন, বিবেকানন্দ ও গিরীশচন্দ্রে আংশিক সাফল্য, রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকা, পলাতকা, লিপিকায় তার ভীরু পদপাত এবং পুনশ্চ কাব্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। গদ্য-পদ্যের অদ্বৈতোপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চে' স্পষ্টতর হল, কিন্তু লিপিকায় তার সূচনা, পলাতকা ও পরিশেষ কাব্যে তার যোগ্য ভূমিকা। এটি প্রথম লক্ষ্য করে ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে (১৯৩৩। 'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থে, ১৯৫৭, সংকলিত)। এই মূল্যবান প্রবন্ধের আলোকে রবীন্দ্র-রচনায় গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনের পরিচয় গ্রহণ করা যায়।

এই প্রবন্ধের তিনটি উক্তি আমাদের বক্তব্য বিস্তারে সাহায্য করবে।—
১। 'গদ্যপদ্যের মধ্যে কোনও প্রকৃতিগত বিরোধ আমি আজ অবধি ধরতে পারি নি, বরং অনেক সময়ে ভেবেছি যে ওই দুই ধারার সঙ্গমই সাহিত্যতীর্থ নামে সুপরিচিত।'
২। 'গদ্য ও পদ্য সাধারণত যতই স্বাবলম্বী হোক, তাদের স্কন্ধে যখন রসসৃষ্টির দায়িত্ব চাপে, তখন আর এই সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ থাকে না, তখন তারা তাদের স্ব স্ব মূলধন একত্র করে যে যৌথ-কারবার পাতে, তা'ই জন-সমাজে পায় কাব্য-আখ্যা।'

৩। 'আমার বিবেচনায় প্রাত্যহিক জীবনে পদ্যের স্থান খুব নগণ্য নয়। কাজেই মুক্তছন্দেও পদ্যের প্রভাব প্রচুর। এমন কি আমরা এতদূর পর্যন্ত মানতে বাধ্য যে তা'তে যে-গদ্য ব্যবহৃত, তা একেবারে সাংসারিক গদ্য নয়। কারণ কবিতার প্রসঙ্গ যতই সামান্য হোক, তার তলায় তলায় একটা অসাধারণ আবেগের উৎস থাকেই থাকে ; এবং আবেগজাত বাক্য যেহেতু উচ্ছ্রিত বাক্য, তাই মুক্তচ্ছন্দের ভাষাও গৃহকর্মের ভাষা নয়, মানুষের উন্নীত চৈতন্যের ভাষা।'

এই উন্নীত চৈতন্যের ভাষা আমরা পেয়েছি শেকস্‌পীঅরের সনেটগুচ্ছে।

কথ্যভঙ্গিম বাণীরূপ শেকস্‌পীরীয় সনেটকে দিয়েছে গদ্যোচিত প্রত্যক্ষতা, ঋজুতা, আর প্রেমের প্রচণ্ড আবেগ দিয়েছে পদ্যের সযত্নলালিত অনুষঙ্গ ও আবেদন। মানতেই হয় সনেটের কাব্যভাষা উন্নীত চৈতন্যের ভাষা এবং কথ্যরীতির প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতি এখানে অনুপস্থিত নয়। নিম্নধৃত সনেটটি (৮ সংখ্যক) এর পরিচায়ক।

Shall I compare thee to a summer's day ?
Thou art more lovely and more temparate
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date :
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm'd ;
And every fair from fair sometimes declines,
By chance, or nature's changing course, untrimm'd ;
But thy eternal summer shall not fade
Not lose possession of that fair thou ow'st,

Nor shall Death brag thou wand'rest in his shade,
When in eternal lines to thou grow'st.

So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.

অবশ্যই এ ভাষা আটপৌরে কথ্যভাষা নয়, তা কথ্যরীতির ভাষা, উন্নীত চৈতন্যের ভাষা। রোমান্টিক কবিদের কাব্যভাষাগত বিদ্রোহ ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর জীবন-বিচ্ছিন্ন কৃত্রিম ছদ্ম-ক্লাসিক কাব্যভাষার বিরুদ্ধে, আর এই শতাব্দে এলিঅট কাব্যচর্চা ও গদ্যচর্চা যে মূলত অভিন্ন তা প্রমাণ করলেন। তিনি একদা বলেছিলেন, কবিরা স্বভাবত গদ্যের সুলেখক। তাঁর মতে, গদ্য রচনায় কবিদের সিদ্ধি তাঁদের বিচিত্রগামী প্রতিভাকে প্রমাণ করে না, বরং এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করে যে, শিল্পচর্চা প্রকারভেদের মুখাপেক্ষী নয়। কবি যখন গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন স্বকীয় চিন্তাধারার সরলবাহন হিসেবে তিনি গদ্যকে গ্রহণ করেন না, তার মধ্যে কাব্যশোভন লাবণ্যের আবিষ্করণে যত্নশীল হন। আর তা থেকেই প্রমাণ হয় যে, গদ্য-পদ্য আসলে একই উৎসজাত; গদ্যচর্চাও শিল্পচর্চা। এর প্রথম সফল প্রয়োগ লক্ষ্য করি হ্যামলেট নাটকে ও শেকসপীঅরের সনেটগুচ্ছে। গদ্য পদ্য পরস্পর বিরোধী তো নয়ই, বরং একে অন্যের পরিপুষ্টি সাধন করে, শেকসপীঅরের শিল্পস্বভাবে তা ধরা পড়েছিল।

কবি রবীন্দ্রনাথের গদ্যচর্চা এ দৃষ্টিতেই বিচার্য। তাঁর পদ্যচর্চায় গদ্য-পদ্যের অদ্বৈতোপলব্ধি কতদূর সার্থক, তা অন্বেষণের বিষয়। ক্ষণিকা ও পলাতকার শিল্পসম্ভাবনা ও পরবর্তী পরাগতিতে, লিপিকা, পরিশেষ ও পুনশ্চ-র সাফল্যে গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনে রবীন্দ্রনাথ কতদূর যত্নশীল ছিলেন তা ধরা পড়ে।

রবীন্দ্র-রচনায় গদ্য-পদ্যের অদ্বৈতোপলব্ধিতে ক্ষণিকা (১৯০০) ও পলাতকার (১৯১৮) শিল্পসাফল্য ও পরবর্তী পরাগতি প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমি যে বেশ সুখে আছি
অন্তত নই দুঃখে কৃশ,
সে কথাটা পদ্যে লিখতে
লাগে একটু বিসদৃশ।
সেই কারণে গভীরভাবে
খুঁজে খুঁজে গভীর চিতে

বেরিয়ে পড়ে গভীর ব্যথা
স্মৃতি কিম্বা বিস্মৃতিতে।
কিন্তু সেটা এত সুদূর
এতই সেটা অধিক গভীর
আছে কি না আছে তাহার
প্রমাণ দিতে হয় না কবির।
মুখের হাসি থাকে মুখে,
দেহের পুষ্টি পোষে দেহ
প্রাণের ব্যথা কোথায় থাকে
জানে না সেই খবর কেহ! ['কবি', ক্ষণিকা]

এই কবিতার ভঙ্গিটি গদ্যপ্রতিম। গদ্যের উপাদান—সংযোজক অব্যয়, প্রাত্যহিক ইডিয়ম—এখানে পাঠকশ্রুতি এড়িয়ে যায় না। বক্তব্য উপস্থাপনায় গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনেব অঙ্গীকার এখানে লক্ষণীয়।

এই শিল্পপ্রয়াসেব সাফল্য প্রতিষ্ঠিত হল পলাতকা কাব্যের কাহিনীগুলিতে। প্রাত্যহিক সংলাপের তুচ্ছতা ও রূঢ়তা থেকে কতো অনায়াসে গভীর আবেগের স্তরে শিল্প-উত্তরণ ঘটতে পারে, তার প্রমাণ এইসব কাহিনী।

হোলির সময় বাপকে সেবার বাতে ধরল ভারি
পাড়ায় পুলিন করছিল ডাক্তারি,
ডাকতে হল তারে।
হৃদয়যন্ত্র বিকল হতে পাবে
ছিল এমন ভয়।
পুলিনকে তাই দিনের মধ্যে বারেবারেই আসতে যেতে হয়।
মঞ্জুলী তার সনে
সহজভাবে কইবে কথা যতই করে মনে
ততই বাধে আরো।
এমন বিপদ কারো
হয় কি কোনো দিন।
গলাটি তার কাঁপে কেন, কেন এতই ক্ষীণ,
চোখের পাতা কেন

কিসের ভারে জড়িয়ে আসে যেন।

ভয়ে মরে বিরহিনী

শুনতে যেন পাবে কেহ রক্তে যে তার বাজে রিনিঝিনি।

পদ্মপাতায় শিশির যেন, মনখানি তার বুকে

দিবারাত্রি টলছে কেন এমনতরো ধরা পড়ার মুখে।

এই কবিতাংশে গদ্য-উপাদানের অভাব নেই। প্রাত্যহিক ইডিয়ম, রূঢ় ক্রিয়াপদিক শব্দবন্ধ, কথ্যরীতির ক্রিয়াপদের প্রাধান্য সহজেই শ্রুতিতে ধরা পড়ে। 'সনে' ছাড়া একটিও পদ্য-উপাদান নেই, তথাপি এ প্রাত্যহিক গদ্য নয়, সংসারিক গদ্য নয়। কারণ কবিতার প্রসঙ্গ তার আপাত-তুচ্ছতার অন্তরালে একটা অসাধারণ আবেগের ফল্গুকে বহন করে। এবং আবেগজাত বাক্য যেহেতু উচ্ছ্রিত বাক্য, তাই মুক্তছন্দের ভাষাও গৃহকর্মের ভাষা নয়, উন্নীত চৈতন্যের ভাষা। এই ভাষারূপ ধরা পড়েছে শেষ সাত চরণে।

আক্ষেপের বিষয়, পলাতকার এই শিল্পসম্ভাবনা অব্যবহিত পরবর্তী পর্বের কবিতায় (পূরবী ১৯২৪, মহুয়া ১৯২৯) উপেক্ষিত। কিন্তু তার স্থানে দেখা দিয়েছে লিপিকা, যার শিল্পসম্ভাবনা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যেখানে কবির আত্মস্বীকৃত 'ভীরুতা' গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনে বাধা হয়েছে। লিপিকার (১৯২২) দ্বিধা ঘুচেছে দশ বৎসর পরে পরিশেষ (১৯৩২) ও পুনশ্চ-এ (১৯৩২)।

"আজ দেখি, সেই দুরন্ত মেয়েটি বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে, বাদলশেষের ইন্দ্রধনুটি বললেই হয়। তার বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ আজ অচঞ্চল, তমালের ডালে বৃষ্টির দিনে ডানাভেজা পাখির মতো।

ওকে এমন স্তব্ধ কখনো দেখি নি। মনে হল, নদী যেন চলতে চলতে এক জায়গায় এসে থমকে সরোবর হয়েছে।" (বাণী, লিপিকা)

এই অংশটি গদ্যাংশ, না, পদ্যাংশ ?

পদ্যের শাসন ও গদ্যের অবরোধ—দুই এখানে অস্বীকৃত। এই অংশ সাংসারিক গদ্য নয়। একে কবিতার রূপ দিলে দোষ ঘটত না। পুনশ্চ-এর আলোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কবুল করেছেন, সেদিন তিনি সাহস পান নি। আবার পদ্যের অবরোধকেও এ' অংশ অস্বীকার করেছে পদে পদে, তাও স্বীকার্য। মুক্তছন্দের প্রতিষ্ঠায় গদ্য-পদ্যের সঙ্গম শিল্পসার্থকতা পায়, এ সত্য মনে রেখে এই অংশকে পুনর্বিন্যস্ত করা যায়।

আজ দেখি,

সেই দুরন্ত মেয়েটি

বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে,

বাদলশেষের ইন্দ্রধনুটি বললেই হয়।

তার বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ

আজ অচঞ্চল,

তমালের ডালে বৃষ্টির দিনে

ডানাভেজা পাখির মতো।

ওকে এমন স্তব্ধ

কখনো দেখি নি।

মনে হল,

নদী যেন চলতে চলতে

এক জায়গায় এসে

থমকে সরোবর হয়েছে।

সন্দেহ নেই যে এই অংশের ভাষা উন্নীত চৈতন্যের ভাষা।

আরো দশ বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনে সাহসী ও যত্নবান হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পরিশেষ ও পুনশ্চ। পরিশেষ-এ এই সাধনা ততটা অগ্রসর নয় যতটা পুনশ্চ-এ।

বটের জটায় বাঁধা ছায়াতলে

গোধূলিবেলায়

বাগানের জীর্ণ পাঁচিলেতে

সাদাকালো দাগগুলো

দেখা দিত ভয়ংকর মূর্তি ধরে।

ওইখানে দৈত্যপুরী,

অদৃশ্য কুঠরী থেকে তার

মনে মনে শোনা যেত হাউমাউ খাঁউ।

লাঠি হাতে কুঁজোপিঠ

খিলিখিলি হাসত ডাইনী বুড়ী।

কাশিরাম দাস

পয়ারে যা লিখেছিল হিড়িম্বার কথা

ইট-বের-করা সেই পাঁচিলের 'পরে
ছিল তারি প্রত্যক্ষ কাহিনী।
তারি সঙ্গে সেই সঙ্গে নাক কাটা সূর্পণখা
কালো কালো দাগে
করেছিল কুটুম্বিতা।
['আতঙ্ক', পরিশেষ, রচনা ২৩ জুলাই, ১৯৩২]

পরিশেষ থেকে পুনশ্চের ব্যবধান সময়ের দিক থেকে স্বল্প, শিল্পভাবনার দিক থেকে গুরুতর। পুনশ্চ-এর গদ্যকবিতায় রবীন্দ্রনাথ সমস্ত ভীরুতা ও দ্বিধা বর্জন করে দেখা দিয়েছেন। "পদ্য ছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস" দেওয়ার প্রথম পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ করেছিলের লিপিকায়। "ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি—বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।" পুনঃ প্রয়াসের ফল পুনশ্চ কাব্য। "গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই নয়। পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ রীতিতে যে একটি সমস্যা সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে।" (পুনশ্চ, কবির ভূমিকা, ২ আশ্বিন, ১৩৩৯)।

১। মন বলে, এই আমার যত দেখার টুকরো
চাই নে হারাতে।
আমার সত্তর বছরের খেয়ায়
কত চল্‌তি মুহূর্ত উঠে বসেছিল,
তারা পার হয়ে গেছে অদৃশ্যে।
তার মধ্যে দুটি-একটি কুঁড়েমির দিনকে
পিছনে রেখে যাব
ছন্দে গাঁথা কুঁড়েমির কারুকাজে,
তারা জানিয়ে দেবে আশ্চর্য কথাটি,—
একদিন আমি দেখেছিলাম এই সব-কিছু। ('দেখা', পুনশ্চ)

২। সময় হয়েছে আজ।
যে আনে আমার রান্নার কাঠ
ডেকেছি সেই সাঁওতাল মেয়েটিকে।
তার হাত দিয়ে পাঠাব

শালপাতার পাত্রে।

তাঁবুর মধ্যে বসে তখন পড়ছি ডিটেকটিভ গল্প।

বাইরে থেকে মিষ্টি সুরে আওয়াজ এল, 'বাবু, ডেকেছিস কেনে

বেরিয়ে এসে দেখি ক্যামেলিয়া

সাঁওতাল মেয়ের কানে,

কালো গালের উপর আলো করেছে।

সে আবার জিগেস করলে, 'ডেকেছিস কেনে।'

আমি বললেম, 'এই জন্যেই।'

তার পরে ফিরে এলেম কলকাতায়। [ক্যামেলিয়া, পুনশ্চ]

এই দুটি কবিতাংশের ভাষা উন্নীত চৈতন্যের ভাষা, সাংসারিক গদ্য থেকে তা ভিন্নতর, কিন্তু একান্তভাবে পদ্যের ভাষা নয়। গদ্যকবিতার ভাষাই গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনে চরম কথা নয়, এ কথাও এখানে অবশ্যস্বীকার্য। গদ্য-পদ্যের উপাদানগত পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিগত বিরোধ নেই,—এই সত্যই আমাদের আশ্রয়। রসসৃষ্টির দায়িত্ব কী ভাবে পালিত হল, তা'ই মূল বিবেচ্য।

সুধীন্দ্রনাথ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন :

"গদ্য ও পদ্য সাধারণত যতই স্বাবলম্বী হোক, তাদের স্কন্ধে যখন রসসৃষ্টির দায়িত্ব চাপে, তখন আর এই সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ থাকে না, তখন তারা তাদের স্ব স্ব মূলধন একত্র করে যে-যৌথ কারবার পাতে, তা'ই জন-সমাজে পায় কাব্য-আখ্যা"। ('ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ', 'কুলায় ও কালপুরুষ'-এ সংকলিত)।

ক্ষণিকা পলাতকা লিপিকা পরিশেষ ও পুনশ্চ এবং পরবর্তী গদ্যকবিতা (শেষ সপ্তক, পত্রপুট, শ্যামলী) ও নৃত্যনাট্য (চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা) সমূহে রবীন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ যত্নপর হয়েছিলেন। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের গদ্য-পদ্যের অদ্বৈতচিন্তা স্পষ্টতর ও প্রখরতর। গদ্য-পদ্যের আত্মীয় সম্পর্ক শিল্পীমন্য দায়িত্বের মুখাপেক্ষী এবং গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধের মধ্য দিয়েই শিল্পসৃষ্টি সম্পূর্ণ—এ কথার প্রথম উপলব্ধি রবীন্দ্র-রচনায়। কিন্তু সজ্ঞান পরিণাম প্রত্যাশায় সুধীন্দ্রনাথই সেই অদ্বৈত সাধনাকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মর্যাদা দিয়েছেন।

পুনশ্চ কাব্যের ভূমিকায় (১৯৩২) রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, গদ্য-পদ্যর

আত্মীয়-সম্পর্ক স্থাপনের দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথকে ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে। শেষোক্ত জন সে দায়িত্ব গ্রহণে অগ্রসর হন নি। আর অবনীন্দ্রনাথের সে চেষ্টা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত, "তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল, কেবল ভাষাবাহুল্যের জন্যে তাতে পরিমাণ রক্ষা হয় নি।"

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি বিবেচ্য। "গদ্যে কবিতার রস দেওয়া" বা গদ্য-পদ্যের আত্মীয়-সম্পর্ক স্থাপন শিল্পমাত্রেরই লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসাফল্য কতদূর, তা বিচার্য। রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য ১৯৩২এ ; রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের (১৯৪১) পর অবনীন্দ্রনাথ কেবল বুড়ো আংলা (১৯৪১), ঘরোয়া (১৯৪১), জোড়াসাঁকোর ধারে (১৯৪১), আপনকথা (১৯৪৬) লিখেছেন, তা নয়, আরো লিখেছেন, (মৃত্যুর পর প্রকাশিত) লম্বকর্ণপালা (১৯৪৯), মাসি (১৯৪৮), একে তিন তিনে এক (১৯৫৪), মারুতির পুঁথি (১৯৫৬), চাঁইবুড়োর পুঁথি (১৯৫৮), রং বেরং ১৯৫৮)।

অবনীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের রচনা যাত্রাপালা (একে তিন তিনে এক, লম্বকর্ণ পালা, রং বেরং, মারুতির পুঁথি, চাঁইবুড়োর পুঁথি) রবীন্দ্রনাথ দেখে যেতে পারেন নি, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অভিমত সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। এই পর্যায়ের রচনায় অবনীন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধন করেছেন। তাঁর এক রচনায় একই প্রবাহে গদ্য-পদ্য মিশে যায়। পর পর বাক্যবন্ধে গদ্য-পদ্যের সহাবস্থান অনায়াসলক্ষণীয়। গদ্য থেকে পদ্যে, গদ্য থেকে পদ্যে চলে যাবারই বিস্ময়কর অনায়াসসামর্থ্য অবনীন্দ্রনাথের ছিল। আর তা প্রমাণ করে, গদ্য-পদ্যে প্রকৃতিগত বিরোধ নেই।

এই শিল্পসামর্থ্যের উৎস অবনীন্দ্র-প্রতিভা—যার বাক্-বিভূতি অসামান্য, বাক্-ভাণ্ডার অফুরান, কল্পনাশক্তি ও অতিকল্পনাশক্তি তুলনাহীন। এই শক্তি যুগপৎ গদ্য-ও কাব্যধর্মী। সামান্য উদাহরণেই এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যাত্রা-পালার রচনাংশকে অনায়াসে পর্ববিন্যস্ত করা যায়।

১। দ্রম্ দদ্দড় / ধ্রম্ ধদ্দড়্ /
কিপ্‌পোলো / কিপ্‌পোলো /
যমজম্ভীর তোপ্‌পোলো /
যমদণ্ড ভঙ্গ হলো /
দণ্ডবত হলে /

কালদণ্ড ফাল হলো, / ফাল্লালো ॥ (চাঁইবুড়োর পুঁথি)

২। এস করি হিড়িকিড়ি /
ইাঁড়ি পেট নখে চিড়ি /—করি ফাঁক ! ॥
সেই পথে প্রাণপাখি / বারায়ে যাক্ /—তিড়িবিড়ি /
ঝট হোক কাজ সাফ ॥
ঢুকে যাক্ লাফালাফ ॥—আড়ি ভাব, / দন্ত কিড়িমিড়ি /
আমরা এখানে পড়ে থাকি /
দেশে উড়ে যাক্ প্রাণপাখি ।/—যেখানে তার ইস্তিরী /
বসে চিবোচ্ছে কাঁচা পাকা তিন্তিড়ী ॥॥ (মারুতির পুঁথি)

৩। দুবার 'ওয়াক থক' করে / একটা পটল তুলে / বুড়ো দাদার দমবন্ধ /—শিবনেত্র / –অঙ্গস্থির / অক্ষয় স্বর্গ / লাভ করলেন / হক্কিয় রায় / (তদেব)

৪। খুঁড়ে লঙ্কার ভিত্তি। তুমি রাখলে কিত্তি।
বিত্তি লাভ। করতে এসে। পিত্তি পলো।। (চাঁইবুড়োর পুঁথি)

৫। হুকুমও আসবে না, / হাকিমও আসবে না, / দরজাও খুলবে না, / দর্জিও পাওয়া যাবে না ?। (একে তিন তিনে এক)

৬। দেখহে খালাসিগণ কইরা খুব নিরীক্ষণ
বিপদে পইড়াছে জানি হবে কোন্ মোহাজন।
কিবা কোন্ ছওদাগর যেতেছিল ছপর
তুফানে পইরা ডিঙ্গা হৈল তর এইক্ষণ।

(রং-বেরং)

এইসব উদাহরণে গদ্য-পদ্যের প্রকৃতিগত বিরোধ অস্বীকৃত।

গদ্য-পদ্যের অদ্বৈতচর্চার প্রয়াস করেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী, যদিচ তা সজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ীভূত হয় নি। সজ্ঞান প্রয়াস করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। সুধীন্দ্রনাথ এই পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। 'সংবর্ত' কাব্যের (১৯৫৩) ভূমিকায় তারই সবিনয় স্বীকৃতি ; "বিশ বৎসর যাবৎ আমি যদিও জ্ঞানত গদ্যপদ্যের নির্বিরোধ চাই, তবু এখনও আমার সাধ ও সাধ্য মাঝে মাঝে পরস্পরের বাধ সাধে। ফলত ছন্দোরক্ষার খাতিরে অথবা মিলের গরজে সাধু ও প্রাকৃত ভাষার সংমিশ্রণ, নামধাতুর বাহুল্য, বিভক্তি বিপর্যয় ইত্যাদি বাংলাকাব্যের অভ্যাসদোষ একাধিক কবিতায় রয়ে গেল।"

গদ্যপদ্যের অদ্বৈতচর্চায় সুধীন্দ্রনাথ অগ্রসর শিল্পী, একথা স্বীকার্য, কিন্তু এই অদ্বৈতোপলব্ধি বাংলাসাহিত্যে পূর্বেই হয়েছে।

গদ্যের ভূমিকা সম্পর্কে প্রথম সচেতন হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক'-এ সন্নিবেশিত তিনটি গদ্যকবিতার কৈফিয়তে বঙ্কিমের উক্তি ইতিহাসের গুরুত্ব অর্জন করেছে—

"এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে কবিতা পদ্যেই লিখিতে হইবে, তাহা সঙ্গত কিনা, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি, অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। বিষয় বিশেষে গদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভালো।"

বঙ্কিমের এই সিদ্ধান্ত অশেষ মূল্যবান: বিষয়বিশেষে গদ্যের ব্যবহারই সমুচিত। গদ্যের অদ্বৈতোপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে স্পষ্ট উচ্চারিত—'গদ্য ও পদ্যের ভাসুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক আমি মানি না। আমার কাছে তারা ভাই ও বোনের মতো, তাই যখন দেখি গদ্যে পদ্যের রস ও পদ্যে গদ্যের গাম্ভীর্যের সহজ আদানপ্রদান হচ্ছে, তখন আমি আপত্তি করি নে।' (জানুঅরি ১৯৪০-এ প্রদত্ত ভাষণ, 'ছন্দ', পৃঃ ২২৫)।

সার্থক গদ্য কখনোই নিছক গদ্য নয়, তা কবিতার লক্ষণাক্রান্ত: এই বোধ এখানে শিল্পস্বীকৃতি পেয়েছে। সুধীন্দ্রনাথে তা ব্যাখ্যাত ও শিল্পরূপান্বিত। 'লিপিকা' সম্পর্কে আপন ভীরুতার কথা রবীন্দ্রনাথ কবুল করেছেন। সে ভীরুতা কেবল কাব্যরূপে নয়, বক্তব্যেও। লিপিকার গদ্যছন্দকে তিনি হাজির করেছিলেন কথিকার ছদ্মবেশে, প্রসঙ্গ নির্বাচনেও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় ছিল না। লিপিকার পরে পুনশ্চ ও পরবর্তী তিনটি কি চারটি গদ্যকবিতা গ্রন্থে নোতুন কাজ দেখা দেয় নি, যদিচ তিনি বলেছিলেন 'এককালের খাতিরে অন্যকালকে অস্বীকার করা যায় না।' সেই 'অন্যকাল' কি রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতায় প্রশ্রয় পেয়েছিল? এক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সরলতার জগৎ যেখানে যুগের সকল সংশয় ও প্রশ্ন, অমঙ্গলবোধ ও পাপবোধ নিঃশেষে সমাবৃত হয়ে যায়, সে জগতকেই তিনি নির্মাণ করেছিলেন শিল্পনিপুণতায়। গদ্যছন্দই কি কাব্যের মুক্তির শেষতম বাহক? সংশয়মুক্ত সরলতা ও সৌন্দর্যই সত্য (Beauty is truth)—এই উপলব্ধিই কি কবিতার শেষ কথা? "বিষয়ই যদি প্রথার গণ্ডী ছাড়াতে পারলে না, তবে ছন্দের জীবন্মুক্তি কি অসার্থক

নয় ?"—সুধীন্দ্রনাথের এই অভিযোগ অমোঘ, এর থেকে রবীন্দ্র-গদ্যকবিতার পরিত্রাণ নেই। 'গৃহস্থপাড়ার ভাষা' রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতায় ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সেখানে স্ফূর্তি পেয়েছে অনাদিকালের বিরহবেদনা। সংশয়ের অন্ধকার নয়, বিশ্বাসের সূর্যালোক তাঁর প্রার্থিত। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যদিও বা কখনো 'দুর্যোগের ফসল', কিন্তু দুর্যোগ কদাপি তাঁর অনুভবে প্রশ্রয় পেল না। স্মৃতি ও শৈশব তাঁকে বার বার সাহায্য করেছে, তাদের সহায়তায় তিনি বর্তমানের অবসাদ ক্লান্তি সংশয় নাস্তিকতা উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন।

সুধীন্দ্রনাথের আনন্দ মননে, আশ্রয় নিরালোক এক নাস্তিকতা, সহায় গদ্য-পদ্যের অদ্বৈতোপলব্ধি, সাহিত্যের তীর্থসঙ্গম। সুধীন্দ্রনাথ কখনো গদ্যকবিতা লেখেন নি, তথাপি তাঁর প্রবন্ধ ও কবিতায় গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ যে সম্ভবপর, তার পরিচয় পাই। জনপ্রিয় ধারণায় তাঁর ছিল বৈমুখ্য। ভাবগত ছেদ এবং বাগ্‌যন্ত্র-নির্দেশিত ছেদ যে যথাক্রমে গদ্য ও পদ্যের মৌল বিচ্ছেদ লক্ষণ, ব্যাকরণের এই অনুশাসনে তাঁর আদৌ আস্থা ছিল না। কবিতায় আটপৌরে শব্দ অবাধে ব্যবহার করেছেন, কথ্যরীতি কবিতার অন্বিষ্ট বলে জেনেছেন, অথচ অন্ত্যমিল, ছন্দের কঠিন বন্ধন, চিত্রকল্পরচনায় শিল্পীমন্ত তাগিদ প্রভৃতি কবিতার যাবতীয় নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে মেনেছেন, এবং তা মেনেও স্বরচিত কবিতায় গদ্যের স্বভাবধর্ম সংরক্ষণ করেছেন, কখনো মনে করেন নি গদ্যের চরিত্রলক্ষণ সংহতিচর্চার বিপক্ষ, এবং কখনো গদ্যকবিতার স্বৈরাচারের হাতে আত্মসমর্পণ করেন নি।

তাঁর কবিতার সামান্য উদাহরণে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন—

> কখনো ওঠে পাতাল ভেদ করে অসম্ভূত অমা।
> বায়ুর বেগ সহসা যায় মরে দ্রাঘিমা দেয় ক্ষমা।

এখানে কথ্য বাগ্‌ধারা, মৌখিক আলাপের শব্দের সঙ্গে দুরূহ আভিধানিক শব্দের আত্মীয়বন্ধন নিবিড় হয়ে উঠেছে। 'মরে যাওয়া' বা 'ক্ষমা দেওয়া' সহজেই 'অসম্ভূত' ও 'দ্রাঘিমা' শব্দের পাশাপাশি বসেছে। অথচ কবিতায় ধ্রুপদী সংহতি বা ভাবগাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হয় নি। কবিতার যাবতীয় প্রসিদ্ধি নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে মেনেও এখানে গদ্যের স্বভাবধর্মকে রক্ষা করেছেন।

গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধের এই উজ্জ্বল কাব্য-উদাহরণ থেকে আমরা সুধীন্দ্রনাথে অনায়াসে উপনীত হই। কারণ তাঁর গদ্যরচনা কবিতার বিরোধী নয়।

তাঁর গদ্য আধুনিক অর্থে কাব্যধর্মী। সংস্কারানুগ অর্থে সুধীন্দ্রনাথের গদ্য কাব্যধর্মী নয়, তাঁর প্রবন্ধ বক্তব্যের উপস্থাপনামাত্র নয়, বরং একটি শিল্পসমর্থ প্রতিবেশ সৃষ্টি। গদ্যের প্রধান চারিত্র্যলক্ষণ মনন ও যুক্তিনিষ্ঠা তিনি কখনো বর্জন করেন নি, তত্রাচ তাঁর গদ্য তাঁর কাব্যের মতোই বিশিষ্ট অনুশীলন, সচেতন শিল্পচর্চা।

একটি উদাহরণেই তা প্রমাণিত।

"স্বপ্নাদ্য প্রতীকের মতোই উৎকৃষ্ট কবিতার চিত্রকল্প দ্বন্দ্ব সমাসের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ; এবং সাধ থাকলেও, সাধ্যের অভাববশত আমি সে রকমের রচনায় অপারগ বটে, কিন্তু বাংলাভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় যেহেতু জন্মগত, তাই উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার শিখতে আমাকে শেক্‌স্‌পীয়রের কাছে ছুটতে হয় না। এদেশের ঝাঁ ঝাঁ রোদেই আমি চোখকানের ঝগড়া মেটাই। তবে মহাকবিরা জানেন যে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনেক সময়ে স্বকীয় বিশ্ববীক্ষার সর্বনাশ সাধে ; এবং সাহিত্যে শুধু বিষয়-বিষয়ীর সঙ্কেত নয়, রসসামগ্রীর মায়ামুকুরে দর্শক আবার বহুরূপী।" (মুখবন্ধ, 'কুলায় ও কালপুরুষ')

সুধীন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনে কথ্যরীতিকে আশ্রয় করেছিলেন, তার ফলে তাঁর রচনায় আটপৌরে শব্দ, ক্রিয়াপদ ও ইডিয়মের প্রয়োগ অনায়াসলক্ষণীয় : 'ঝাঁ ঝাঁ রোদ', 'চোখকানের ঝগড়া মেটাই', 'সর্বনাশ সাধে', 'শেকস্‌পীয়রের কাছে ছুটতে হয় না।' গুরু তৎসম শব্দের পাশে এগুলি নিপুণভাবে খাপ খেয়ে গেছে।

শব্দপ্রয়োগনৈপুণ্যের বিস্ময়কর উদাহরণ 'দ্বন্দ্বসমাস' শব্দটি। পরিচিত বৈয়াকরণিক আবেষ্টনী থেকে সরে এসে এই শব্দটি রসসৃষ্টির উপাদান হয়ে উঠেছে। এই শব্দটি কবিতাতেও ব্যবহার করে সুধীন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্যের নিবিড় আত্মীয়তাই স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন—

> অবশ্য বুঝেছি আজ এ সিদ্ধান্ত নিতান্তই মেকী ;
> কারণ অন্বয় ব্যতিরেকী
> সত্যমিথ্যা, ভালোমন্দ, সুন্দর-কুৎসিত
> এবং সে নিত্যবিপরীত
> দ্বন্দ্বসমাসের সঙ্গে তুলনীয় মেরু বিপর্যয়
> বিকল্প স্বভাবক্ষেত্রে।

কাব্যাস্বাদনের সমস্ত পূর্বার্জিত সংস্কার বর্জনের পরই আমরা এই

কবিতাংশের রসাস্বাদন করতে পারি। গদ্যশব্দের ব্যবহার, অকাব্যিক গদ্যোচিত বিন্যাসপদ্ধতি এই কবিতাংশের উপভোগে পদে পদে বাধা দেয়, যেমন বাধা দেয় উপরোক্ত গদ্যাংশে সরলতার নিতান্ত অনটন।

আসল কথা, সুধীন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্যে শব্দ ব্যবহারে সংস্কারমুক্ত ছিলেন। শুধু তাই নয়, শব্দ ব্যবহারে তাঁর ছিল আত্যন্তিক মনোযোগ। আভিধানিক ও অপ্রচলিত শব্দের প্রতি তাঁর ছিল মোহ। 'অদ্বৈতের অত্যাচার' প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণযোগ্য: "আমার মতে সাহিত্যের শব্দ অভিপ্রায়ের জন্য গৃহীত হয় না। গৃহীত হয় রূপের তাগিদে; এবং সেখানে যেমন প্রত্যেকটি শব্দ এক-একটি ধ্যান, তেমনিই ধ্যান বলে, প্রত্যেক শব্দ স্বাধিকার গুণে আনন্দদায়ক।"

পূর্বধৃত গদ্যাংশের এই বাক্যটি এই ক্ষেত্রে লক্ষণীয়—"কিন্তু বাংলাভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় যেহেতু জন্মগত, তাই উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার শিখতে আমাকে শেক্‌স্‌পীয়রের কাছে ছুটতে হয় না, এদেশের ঝাঁ ঝাঁ রোদেই আমি চোখকানের ঝগড়া মেটাই।" এখানে 'শেকসপীয়র' শব্দটি বিদ্যাভিমানের পরিচায়ক নয়, একটি অনুষঙ্গময় ধ্বনি, স্বায়ত্ত শিল্পরীতির অনিবার্য উপাদান। এলিঅটের মতোই সুধীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, অন্বয়ের আশ্রয় ও অনুষঙ্গের ব্যঞ্জনা ব্যতীত শব্দে সঙ্গীতের আবেদন কখনোই পৌঁছায় না। 'শেকসৃপীয়র' শব্দটি অনুষঙ্গের ব্যঞ্জনায় সঙ্গীতের আবেদন-সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এখানে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যাকে পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনের উপায় না করে শিল্পসৃষ্টির তাগিদেই ব্যবহার করেছেন, কবিতার মতো গদ্যকেও একটি স্পষ্ট শিল্পরূপ দেবার জন্যই শব্দটি প্রয়োগ করেছেন।

গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনে সুধীন্দ্রনাথের এই শিল্পসাফল্য আমাদের ভাবায়, কবিতা ও গদ্যের শিল্পসামর্থ্যকে বহুদূর অগ্রসর করে দেয়।

গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনে যত্নবান হয়েছেন ও সচেতনভাবে তার প্রয়াস করেছেন, এমন দুজন বাঙালি কবির উল্লেখ এখানে করা প্রয়োজন। সে দুজন হলেন শ্রীঅন্নদাশংকর রায় ও শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়। দুজনেই কবিতার ভাষা ও ছন্দ নিয়ে ভেবেছেন, ছন্দ ও সুরের মর্যাদা নিয়ে চিন্তা করেছেন, কথ্যরীতি ও কথ্যছন্দ ব্যবহার করেছেন, আর এইসব শিল্পপ্রয়াসের মধ্য দিয়ে গদ্যপদ্যের নির্বিরোধ সাধনে যত্নপর হয়েছেন।

অন্নদাশংকর একদিন লিখেছিলেন:

"জনগণের হৃদয়ে যদি সামান্যতম স্থান পাই, আমার একটা ছড়াও যদি তাদের মনে গাঁথা থাকে, কানে কানে সঞ্চারিত হয়, মুখে মুখে পুরুষানুক্রমিক চলিত হয় তাহলেই আমি ধন্য।......মডেল হিসেবে আমি নিয়েছিলুম ছেলে-ভোলানো ছড়া। আগডুম্ বাগডুম্ ইত্যাদি। যার বয়স হাজার বছরেরও বেশী।" (ছড়ার কথা ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫, 'প্রবন্ধ'-এ সংকলিত)।

কি গদ্যে, কি পদ্যে অন্নদাশংকর নিয়ত-অন্বেষী, নিত্য-অতৃপ্ত লেখক। তাই ছড়া ছেড়ে ব্যালাডে যেতে চেয়েছেন। আরো বলেছেন,

"বিশ বছর আগে কবিতা লিখতে গিয়ে আমার মনে হল কবিতার ভাষা ঠিক না হলে কবিতা ঠিক হবে না।"

সেই সঙ্গে তাঁর শিল্পীস্বভাবে ধ্বনিত হয়েছে জিজ্ঞাসা—

"কবিতাকে পদ্য রেখে, পদ্যছন্দের শাসন মেনে তার ভাষা বদ্‌লে দেওয়া যায় কিনা তখকার দিনে আমার প্রথম জিজ্ঞাসা। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি জিজ্ঞাসা এল। ছন্দ তো যথেষ্ট হয়েছে, এবার একটু সুর এলে মন্দ হয় না। সুর কিন্তু গানের সুর নয়।......আমি চাই কবিতার সুর, কথার সুর।"

[তদেব]

'বিশ বছর আগের ভাবনা' অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের কাছাকাছি সময়ের ভাবনা। এই সময় রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ (১৯৩২) প্রকাশিত হয়েছে, গদ্য-কবিতার পথ খুলে গেছে, এবং গদ্যপদ্যের নির্বিরোধ সাধনের শিল্পসম্ভাবনা স্পষ্টতর হয়েছে। এ সময়েই সুধীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৩৩)। তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি স্পষ্ট-ভাষায় বলেছিলেন, গদ্যপদ্যের মধ্যে কোনো প্রকৃতিতে বিরোধ নেই এবং "আবেগজাত বাক্য যেহেতু উচ্ছ্রিত বাক্য, তাই মুক্তছন্দের ভাষাও গৃহকর্মের ভাষা নয়, মানুষের উন্নীত চৈতন্যের ভাষা।" রবীন্দ্ররচনার গদ্যপদ্যের অদ্বৈ-তোপলব্ধিতে ক্ষণিকা ও পলাতকার শিল্পসাফল্য ও পরবর্তী পরাগতির দিকে তিনিই প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সেই সময়েই অন্নদাশংকর গদ্য-পদ্য নিয়ে সচেতনভাবে ভেবেছেন। তার ফলে তিনি ছড়া রচনায় মনোনিবেশ করলেন। অন্নদাশংকরের ছড়া কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শ্যামলী-পরবর্তী ছড়া নয়, তা হাজার বছরের পুরনো ছড়া, তা কথ্যরীতি-আশ্রয়ী, প্রাত্যহিক সংলাপের অনুবর্তী। পদ্যছন্দের সামনে বেঁধে প্রচ্ছন্ন সংগীতের সুরকে তিনি মুক্তি দিতে চাইলেন 'কবিতার সুরে' বা 'কথার

সুরে'। অন্নদাশংকরের ছড়া তাই গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধন পথে এগিয়েছে। তার যৎসামান্য উদাহরণ নিই।

১। তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর 'পরে রাগ করো।
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারতে ভেঙে ভাগ করো।
তার বেলা ?……
যুদ্ধ-জাহাজ জঙ্গী-মোটর
কামান বিমান অশ্ব উট।
ভাগাভাগির ভাঙাভাঙির
চলছে যেন হরির লুট।
তার বেলা ?
তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর 'পরে রাগ করো।
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
বাংলা ভেঙে ভাগ করো।
তার বেলা ? [খুকু ও খোকা]

২। মশা
তুচ্ছ মশা।
মশার জ্বালায় সেদিন হতো
ডানকার্কের দশা।
মশায়।
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায়। [কাঁদুনি]

৩। করেছি পণ, নেব না পণ
বৌ যদি হয় সুন্দরী।
কিন্তু আমায় বলতে হবে
স্বর্ণ দেবে কয় ভরি।……

মানতে হল দরকারটা
উভয়তই আর্থিক।
স্বর্ণের নাম সুন্দরী আর
মাইনের নাম কার্তিক। [পদ]

সন্দেহ নেই, এই সব ছাড়া শিল্পগুণান্বিত ছড়া। এখানে বক্তব্য সমাজচেতন ও বিশ্লেষণাত্মক, প্রকাশভঙ্গি তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল, ছন্দোবাহন গদ্যপদ্যের সীমানাবর্তী এখানে বক্তব্যের সঙ্গে ছন্দোবাহনের যেমন পারস্পরিক অপরিহার্য সম্পর্ক, তেমনই গদ্যপদ্যের অদ্বৈতোপলব্ধির সচেতন প্রয়াস অনিবার্য।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কাব্যচর্চার শুরু থেকেই আঙ্গিক-সচেতন। আর শুরুতেই তাঁর প্রকরণসিদ্ধি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' (ষষ্ঠ সং, ১৯৬২) তার উল্লেখ পাই ('ছন্দে নূতন ধারা' অধ্যায়)।

সুভাষ নিজেই ছন্দ প্রসঙ্গে ভেবেছেন এবং অনিবার্যভাবেই ছড়ার ছন্দের শিল্পসম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করেছেন।

সুভাষের দুটি বক্তব্য এখানে উদ্ধার করি :

(ক) "আধুনিক কবিতায় চলতি প্রবাদ প্রবচনের হাওয়া লেগেছে অনেক দিন আগে। কিন্তু তাকে নাচাতে পারে নি। ছড়ার সুরও কিছু কিছু লেগেছিল। কিন্তু সেটা ছিল মাঝে মধ্যে বাড়ীতে বাউল ডেকে একতারায় গান শোনার মত ভদ্দর লোকের শখ মেটানোর ব্যাপার। কিন্তু এই পাঁচ বছরে দেখা যাচ্ছে ছড়া হয়ে উঠেছে আধুনিক কাব্যের অন্যতম বিশিষ্ট বাহন।" ('পাঁচ বছরের কবিতা', "সাহিত্য মেলা", ১৩৬৪)

(খ) "প্রসঙ্গ আর প্রকরণ বলতে যদি আধেয় আর আধার হয়, তাহলে আমি আধারের ওপরই জোর দেব। সত্যি বলতে কি, এ ধরণের বিমূর্ত বিদেহী প্রশ্নে আমার একটু গা ছমছম্ করে। প্রসঙ্গের জন্যের প্রকরণ—এ তো ছেঁদো কথা। কিন্তু প্রসঙ্গত কি এমন হবে না, যা প্রকরণে সয়। প্রসঙ্গের ক্ষেত্র সর্বজনীন—সেই এজমালি জমিতে শিল্পীর আলাদা কোনো স্বত্ব নেই। শিল্পী আর অ-শিল্পী সেখানে সমান-সমান। কিন্তু প্রকরণের সাহায্যে যখন তাকে শিল্পজাত করার কথা ওঠে, তখন আগে হাতযশের কথা।" ('কবিমনন ও কাব্যচিন্তা প্রসঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়,' "অন্যমনে", শরৎ-সংখ্যা, ১৩৭৬)

ছড়া হয়ে উঠেছে আধুনিক কবিতার বিশিষ্ট বাহন, আর প্রকরণের সাহায্যে যখন প্রসঙ্গকে শিল্পজাত করার কথা ওঠে তখন আসে হাতবশের কথা: এ দুটি উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ। গত বিশ বছরে প্রকাশিত কবিতায় ('চিরকুট' ১৯৫০, 'ফুল ফুটুক' ১৯৫৭, 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা' ১৯৫৭, 'যত দূরেই যাই' ১৯৬২, 'কাল মধুমাস' ১৯৬৬) সুভাষ গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনে কতটা যত্নবান হয়েছেন তার পরিচয় পাই। কয়েকটি উদাহরণ নিই।

১। যৌবন বিদায় নিয়ে
এতক্ষণে পৌঁছে গেছে যেখানে যাবার।
মিষ্টি হেসে
হাত নেড়ে তাকে বলেছিলাম বিদায়।
মেয়েলি ঈর্ষায়
প্রৌঢ়ত্বও করছে যাব যাব। [কাল মধুমাস]

২। ফুলকে দিয়ে মানুষ বড় বেশি মিথ্যে বলায় বলেই
ফুলের ওপর কোনোদিনই আমার টান নেই।
তার চেয়ে আমার পছন্দ
আগুনের ফুলকি—
যা দিয়ে কোনোদিন কারো মুখোশ হয় না। [ফুল ফুটুক]

৩। পদচারণায় দূরে নিয়ে যায়
তার কায়া তার ছায়া
দু-চরণে বোনা যাব কি যাব না
ও-বনে ও-যৌবনে
নেমে গেল এক্ষুনি
থাকতে দেখি নি চেয়ে অকপটে
তার সে মুখচ্ছবি
দেখি আকাশের প্রচ্ছদপটে
ছাপা সে মুখচ্ছবি
নেমে গেল এক্ষুনি

ট্রেন খালি করে ভোরের শেফালি
নেমে গেল এক্ষুনি।   [কাল মধুমাস]

ও। আমি জানি, আমি দাবা খেলতে বসলেই
পেছনে হুমড়ি খেয়ে পড়বে এক লক্ষ ফড়ে—
যে যার হাতের কাজ ফেলে রেখে
আমার প্রত্যেকটা চাল
পাখি-পড়ানোর মতো করে বলে দিতে চাইবে।
আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না
এরপর
আমি কি তাদের করজোড়ে বলব—
হে ভদ্রমহোদয়গণ,
হয় চুপচাপ বসে থেকে দেখুন
নয় যে যার জায়গায় ফিরে যান
আমার খেলাটা, দোহাই
এখন থেকে আমাকেই খেলতে দিন।

('ফড়েদের প্রতি' ; কাল মধুমাস)

গদ্যপদ্যের নির্বিরোধ সাধনে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে কৌশলে অবলম্বন করেছেন, তা এইসব উদাহরণে প্রতিষ্ঠিত। তানপ্রধান ছন্দ ও ছড়ার ছন্দের (শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ) অনিবার্য ও স্বাভাবিক মিশ্রণ, ব্যঞ্জনান্ত ও যৌগিক স্বরান্ত শব্দের ব্যবহার, কথ্যরীতি ও কথ্যচ্ছন্দের প্রতি নির্ভরতা, অন্ত্যমিলের আড়ালে কথ্যরীতির প্রতিষ্ঠা, ছড়ার ধ্বনিস্পন্দনের সঙ্গে বাক্‌ছন্দের মিশ্রণ এখানে অবলম্বিত। 'যতদূরেই যাই' ও 'কাল মধুমাস' কাব্যের ছড়াগুলি প্রমাণ করে সুভাষ গদ্যপদ্যের অদ্বৈতোপলব্ধির পথে এগোচ্ছেন। তার উদাহরণ—

(ক) তার কড়ি গাছে কড়ি হল
লক্ষ্মী এলেন রণ পায়ে। (যত দূরেই যাই)

(খ) ধানের কী দর ?
ভজ গোবিন্দ !
আসেন বাবু, ভাল হোটেল।
ভজ গোবিন্দ ! আসেন। (কাল মধুমাস)

গদ্য পদ্যের নির্বিরোধ সাধনে সুভাষের সচেতনতার প্রমাণ একটি উক্তি উদ্ধার করি, "আমার তো মনে হয় পদ্য-গদ্যের কাছে এসেছে বলার চেয়ে গদ্য এবং পদ্য উভয়েই ক্রমশ কাছাকাছি চলে আসছে বলা সঙ্গত হবে। সাহিত্য যতই জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে ভাষাকেও ততই সহজ ও সুস্পষ্ট করে তোলবার প্রয়াস চলেছে, তা গদ্য কি পদ্য যে কোনো শাখাতেই হোক।" ('আধুনিক বাংলা কবিতা প্রসঙ্গে' 'ক্ষপণক', বৈশাখ ১৩৭৪)।

আশা করি এইসব শিল্পসাফল্য একালের কবিদের অনুপ্রাণিত করবে গদ্যপদ্যের নির্বিরোধ সাধনে। আর সেক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সতর্কবাণী অবশ্যস্মর্তব্য: "বিশ বৎসর যাবৎ আমি যদিও জ্ঞানত গদ্যপদ্যের নির্বিরোধ চাই, তবু এখনও আমার সাধ ও সাধ্য মাঝে মাঝে পরস্পরের বাধ সাধে। ফলত ছন্দোরক্ষার খাতিরে অথবা মিলের গরজে সাধু ও প্রাকৃত ভাষার সংমিশ্রণ, নামধাতুর বাহুল্য, বিভক্তি-বিপর্যয় ইত্যাদি বাংলাকাব্যের অভ্যাস-দোষ একাধিক কবিতায় রয়ে গেল।" ('সংবর্ত' কাব্যের ভূমিকা ১৯৫৩)। আরো স্মর্তব্য, এলিঅটের বিশ্বাস: কবিতা আত্মসংগ্রামেরই বাণীমূর্তি; আত্মসংগ্রাম যত তীব্র হবে, কবিতা ততই কথ্যরীতির দিকে ঝুঁকবে, কবি-প্রসিদ্ধির কুসুম-শয়ন ছেড়ে গদ্যের কঠিনোজ্জ্বল ধর্মের মধ্যেই পাবে অন্বিষ্ট উৎসকে। ('দ্য মিউজিক অভ্ পোয়েট্রি')।

সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ বৎসর (১৯৫০-৭০) যাবৎ তাঁকে কাছের থেকে আমি দেখেছি। আরো অনেকেই আরো ঘনিষ্ঠভাবে দীর্ঘতরকাল ধরে তাঁকে দেখেছেন। আমরা তাঁকে দেখেছি বাংলা সাহিত্যের নিয়ামকরূপে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগের প্রধানরূপে। বস্তুত আমাদের কালে তিনি সমাজ-নেতারূপেও বহু লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। নিকট থেকে দেখার ফলে তাঁকে যেভাবে জেনেছি, তা আমার জীবনের পরম অভিজ্ঞতা। অধ্যাপকরূপে, গবেষণা-নিয়ামকরূপে, সহযোগী গ্রন্থকাররূপে, সাহিত্যক্ষেত্রে নেতারূপে তাঁকে পেয়েছি।

আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কি? এ প্রশ্নের উত্তরে নানাজন নানা কথা বলেছেন। আমার মনে হয়েছে, তাঁর প্রথম কীর্তি বাংলা সাহিত্য পঠন-পাঠনের উচ্চমান প্রতিষ্ঠা। তিনি যে সময় রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন (সে-সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বিশ্বভারতী ছাড়া আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নি) তখন সর্বস্তরে বাংলা পঠন-পাঠনের মান ছিল নিম্ন। ইংরেজি সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, চৌত্রিশ বছরের ইংরেজি সাহিত্য অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা, স্বাভাবিক নেতৃত্ব-ক্ষমতা ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ নিয়ে তিনি কর্মক্ষেত্রে দেখা দিলেন। খুব অল্পকালের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের সর্বস্তরে পঠন-পাঠনের মানকে উন্নত করে দিলেন। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও পরীক্ষাব্যাপারে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষায় তিনি যত্নবান হলেন। বাংলা অনার্স, এম. এ. ও উচ্চতর গবেষণার একটি উচ্চমান প্রতিষ্ঠা করলেন। বস্তুতঃ একথা অবশ্যস্বীকার্য, তাঁর শৈথিল্যবর্জিত বিচারবুদ্ধি, কঠোর শৃংখলাপরায়ণতা ও উচ্চমান প্রতিষ্ঠায় আগ্রহের ফলে আজ সর্বস্তরে বাংলা পঠন-পাঠন শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছে।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যসমালোচনার উচ্চতম মান তাঁর অধিগত ছিল। সেই মান বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তিনি বাংলা সাহিত্যসমালোচনাকে শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিলেন। এটি তাঁর দ্বিতীয় প্রধান কৃতিত্ব। তিন প্রকারের

ছাত্রকে তিনি যে সাহিত্যাদর্শে দীক্ষিত করেছিলেন আজ ভারতবর্ষের সর্বত্র তাঁর অনুরাগী অধ্যাপক-সমালোচকদের কীর্তিতে তা পুনঃপুনঃ জয়যুক্ত হয়েছে। এটি তাঁর তৃতীয় প্রধান কৃতিত্ব।

অথচ চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয় যে, বাংলা সাহিত্যে সমালোচনা-ক্ষেত্রে তাঁর আগমন আকস্মিক। সমালোচক শ্রীকুমারের প্রধান কীর্তি (Magnum Opus) 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (প্রথম প্রকাশ মাঘ, ১৩৪৫, জানুআরি, ১৯৩৯) অদ্যাবধি দ্বিতীয়রহিত গ্রন্থ। নিতান্ত তাগিদে পড়ে তিনি এটির লেখা শুরু করেন 'নব্যভারত' পত্রিকায় (১৩৩০ বঙ্গাব্দে)। তাগিদ দিচ্ছিলেন তাঁর প্রাক্তন ছাত্র শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ। তিনি বসে থেকে লেখা আদায় করে নিতেন। 'নব্যভারতে'র অবলুপ্তির পর কিছুদিন 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় (১৩৩৫ বঙ্গাব্দে) কিছু অংশ প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গবাণী'র অবলুপ্তির পর 'উদয়ন' পত্রিকায় কিছু অংশ মুদ্রিত হয়। তাও বিলুপ্ত হয়। লেখায় ছেদ পড়ে। তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা ও রাজশাহী কলেজ পত্রিকায় মাঝে মাঝে কিছু অংশ প্রকাশিত হয়। শেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তা প্রকাশের ভার গ্রহণ করায় গ্রন্থ শেষ করার তাগিদে তা সমাপ্ত হয়।

তিনি ভূমিকায় বলেছেন, 'রচনার এই ইতিহাস হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে, বাহিরের তাগিদ ভিতরের ক্ষীণ ইচ্ছাকে ঠেলা না দিলে কল্পনা কার্যে পরিণত হইত না।'

ভক্ত ছাত্রদের তাগিদে অনভ্যস্ত বাংলা কলমে যে গ্রন্থরচনার সূত্রপাত ও পদে পদে বাধাপ্রপ্তি, সেই গ্রন্থই সমালোচনাক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় কীর্তির অধিকারী। এই আশ্চর্য ঘটনার মূলে আছে আচার্য শ্রীকুমারের প্রবল মনীষা। বস্তুতঃ তাঁর মধ্যে এমন একটি সামগ্রিক দৃষ্টি ছিল, যা বাইরের কোনো বাধাতেই ব্যাহত হয় নি। ছাত্র ও অধ্যাপকদের সাক্ষ্যে জানা যায়, প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি এটি লিখতেন। তাঁর মনের মধ্যে যে সামগ্রিক রসদৃষ্টি ছিল তা এই মহৎ কীর্তি উদ্‌যাপনে তাঁকে নিয়ত সাহায্য করেছে। সর্বোপরি, বাংলা উপন্যাসের প্রধান শিল্পীদের সম্পর্কে তার মনের মধ্যে এমন একটি সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত তৈরি হয়েছিল যে, তাঁদের কীর্তির বিশ্লেষণে বাংলারচনার অনভ্যস্ততা ও সমালোচনার পরিভাষার অভাবকে তিনি আপন বলে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'র সর্বপ্রধান অংশ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের মূল্যায়ন। বস্তুত, এক্ষেত্রে শ্রীকুমার

বন্দ্যোপাধ্যায়ের রসবিচারশক্তি ও সমালোচনানৈপুণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শিল্পী বঙ্কিমের মহত্ত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দান অবশ্যস্বীকার্য। আমাদের হৃদয় মধ্যে শিল্পী বঙ্কিমকে তিনিই প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। সমালোচনা কত গভীর, দূরপ্রসারী, সূক্ষ্মদর্শী ও উজ্জ্বল হতে পারে তার নিদর্শন এই বঙ্কিম-সমালোচনা। বঙ্কিম-প্রতিভাকে অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যে যেসব প্রথম শ্রেণীর সমালোচনাকর্ম দেখা দিয়েছে, এই সমালোচনা তার অন্যতম। বঙ্কিম-উপন্যাসের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পাঠকের কাছে অনেক অনাস্বাদিত-পূর্ব সৌন্দর্যচিত্র সমালোচক উদ্ঘাটিত করেছেন। শ্রেষ্ঠ সমালোচনার লক্ষণ এই যে, তা পাঠকের দৃষ্টির সামনে নব নব সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত করে। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ সে বিচারে শ্রেষ্ঠ সমালোচনা।

মধুসূদন দত্তের উপমা যেমন ক্লাসিক পর্যায়ে উন্নীত, ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপমা তেমনি ক্লাসিকধর্মী হয়ে উঠেছে। শিল্পী ও সমালোচকের মৌলিক দৃষ্টি মৌলিক উপমায় ব্যক্ত হয়, এ সত্য স্বীকার করলে উপরি-ধৃত সত্য মেনে নিতে হয়। আচার্য শ্রীকুমারের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, রসবিশ্লেষণ সামর্থ্য, সুনির্বাচিত বিশেষণপরম্পরা ও অনিবার্য উপমাপরম্পরায় গ্রথিত স্টাইল এই সমালোচনা-কর্মে বিধৃত। সামান্য উদাহরণে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

"চারিদিকের সমস্ত শক্তি যেন দৈববলে সংহত হইয়া কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টরথকে অন্তহীন অতলের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে—তাহার সংসারানাসক্তি, স্বামিপ্রণয়বঞ্চিতা শ্যামার প্রতি সমবেদনা, কাপালিকের অতন্দ্র প্রতিহিংসা, নবকুমারের আশংকা-দুর্বল গভীর প্রেম, পদ্মাবতীর পাষাণ প্রাণে মন্দাকিনীর ধারার অতর্কিত আবির্ভাব, সর্বোপরি এক ক্রুদ্ধ দৈবশক্তির সুস্পষ্ট অঙ্গুলিসংকেত—এইসমস্ত শক্তি, মানুষ এবং দৈব, সৎ ও অসৎ—একসঙ্গে ভিড় করিয়া যেন রথরজ্জুর আকর্ষণে হাত দিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র জীবনের বিরুদ্ধে এতগুলি প্রচণ্ড শক্তির সমাবেশ—আমাদের মনকে এক গভীর, সমাধানহীন রহস্যের বেদনায় ব্যথিত করে। নিয়তির দুর্জ্ঞেয় লীলার একটা বিস্ময়কর বিকাশের ন্যায় আমাদের অভিভূত করিয়া ফেলে।"

"বিদ্যুৎশিখা যেমন মেঘের আশ্রয়ে থাকিয়া আত্মপ্রকাশ করে সেইরূপ শৈবলিনীর অন্তর্গূঢ় জ্বালাময়ী প্রবৃত্তি ফস্টরের রূপমোহ ও দুঃসাহসিকতাকে অবলম্বন করিয়া বাহিরে আসিয়াছে ও দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

"প্রসাদপুরের বিজন প্রাসাদে যে শেষ দিনের চিত্রটি আমরা পাই, তাহার উপর আগন্তুক বিপৎপাতের একটি পাণ্ডুর ছায়া পড়িয়াছে। প্রেমের প্রথম স্রোত মন্দীভূত হওয়ায় শীর্ণকায়া চিত্রার মতোই একটা আগতপ্রায় দুর্দৈবের ম্লান স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সে অনিশ্চয়ের উদ্দেশ্যহীন পথ ধরিয়া চলিয়াছে।… সমস্ত দৃশ্যটি যেন একটি অনাগত বিপদের প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হইয়া আছে ; এবং ভ্রমরের নামোচ্চারণমাত্রেই এই বাহ্যবিলাসভারাক্রান্ত, কিন্তু অন্তর্জীর্ণ জীবনযাত্রা যেন যাদুমন্ত্রবলে ইন্দ্রজালনির্মিত প্রাসাদের ন্যায়ই শতধা ভাঙিয়া পড়িয়া বায়ুস্তরমধ্যে নিশ্চিহ্নভাবে মিলাইয়া গিয়াছে।"

এই তিনটি উদাহরণ যথেষ্ট। সমালোচকের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, রসবিচার-নৈপুণ্য ও সামগ্রিক দৃষ্টির পরিচয়স্থল এইসব উদাহরণ। তাঁর স্টাইলের আপাতদুরূহতা অতিক্রম করতে পারলেই আমরা এক সৌন্দর্যজগতে উপনীত হতে পারি, যেখানে বঙ্কিম-উপন্যাসের জীবনরহস্যসন্ধানী অন্তঃসৌন্দর্য ব্যাখ্যাত।

এই সামগ্রিক সৌন্দর্যদৃষ্টি, সূচীমুখ বিশ্লেষণ ও ঐক্যবিধায়ক সংশ্লেষণী রসবোধের পরিচয় কেবল বঙ্কিম-সমালোচনায় নয়, অন্যত্রও প্রতিষ্ঠিত। মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের শোকাবেগের বিচারে তিনি তীক্ষ্ণ বিচার-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন, মহাকাব্যে করুণরস বীররসের বিরোধী নয়, পরিপূরক, এবং আধুনিক মহাকাব্যের শোকাবেগ আধুনিক যুগচিত্তেরই ফলশ্রুতি।

"হোমারের শোক ও মধুসূদনের শোকের মধ্যে খানিকটা পার্থক্য আছে। সমাজবিকাসের আদিম যুগে আকস্মিক মৃত্যু নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল— বহুলোকের মৃত্যুবরণই গোষ্ঠীজীবনের অক্ষুণ্ণ অস্তিত্বের অপরিহার্য সত্য ছিল। সুতরাং সে যুগের কাব্যে শোকপ্রকাশের মধ্যে একটা সহজ ক্ষণিক দুঃখানুভূতি, একটা সংযত বিষণ্ণ গাম্ভীর্যপ্রধান সুররূপে ধ্বনিত হইত। কোনো গভীরতর অনুরণন, বিশেষ শিল্পরীতি প্রয়োগে ইহাকে আরও তীব্র ও মর্মভেদী করার প্রয়াস, ইহার করুণরসকে ব্যঞ্জনা ও কল্পনা রোমন্থনের সাহায্যে, সূক্ষ্মতা ও অন্তর্মুখী, নীরন্ধ্র ব্যাপকতা দিবার চেষ্টা ইহাদের রচনায় দেখা যায় না। যে অশ্রুপ্রবাহ ক্ষীণ নির্ঝররূপে মানব অস্তিত্বের আদিম যুগ হইতে বহিতে শুরু করিয়াছে তাহাই যুগে যুগে নূতন নূতন ধারার সংযোজনে ক্রমশ স্ফীতকায় ও উদ্বেল হইয়া ক্রমবর্ধমান গতিবেগে ও তরঙ্গকল্লোলে আধুনিক যুগের দুঃখ-

সমুদ্রের মোহানার কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উদ্ভবমুহূর্তে ইহার যে যাত্রা-পথ প্রায় সমতলভূমির সঙ্গে একই স্তরের ছিল, তাহা ক্রমশ গভীরতর প্রণালী খনন করিয়া আজ প্রায় অতলস্পর্শ খাদে পরিণতি লাভ করিয়াছে। আজ মানবনেত্রক্ষরিত একটি অশ্রুবিন্দুতে সপ্তসিন্ধুর লবণস্বাদ ও পাতালস্পর্শী অপরিমেয়তা সঞ্চারিত হইয়াছে।"

('মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র', সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে)

আধুনিক যুগের রোমান্টিক বেদনা কিভাবে আধুনিক মহাকাব্যের অন্তঃ-প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে, তারই চমৎকার বিশ্লেষণ এই উক্তি। শেষ বাক্যটির অন্তঃসৌন্দর্য ও স্টাইলের অনিবার্যতা আমাদের মুগ্ধ করে।

কেবল বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনের বিশ্লেষণে নয়, বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তঃসৌন্দর্যবিশ্লেষণেও ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও বিচার-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সম্পর্কিত সমালোচনাগুলি রসানুভূতির দিক থেকে লেখা। বৈষ্ণব কবিতা সংশয়াতীত বিশ্বাসে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত—এই সিদ্ধান্ত থেকেই তিনি পদাবলীর সৌন্দর্যাস্বাদনে ব্রতী হয়েছেন। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' (১৯৪৭) এবং 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে' (১৯৬২) গ্রন্থধৃত নিবন্ধগুলি তার পরিচয়স্থল। 'বিদ্যাপতি' নিবন্ধটি ('বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থভুক্ত) সমালোচকের সামগ্রিক দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম রসানুভূতির পরিচায়ক। বিদ্যাপতির সকল রচনার আলোচনা করে তিনি শিল্পী বিদ্যাপতির সৌন্দর্যসৃষ্টিনৈপুণ্যের বিশ্লেষণ করেছেন। মৈথিল অবহট্ট ভাষায় রচিত 'কীর্তিলতা'র আলোচনা করে তিনি বিদ্যাপতির মৈথিলী পদাবলীর স্বরূপ সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁর পূর্বে বিদ্যাপতির আলোচনায় এই পথ আর কেউ অনুসরণ করেন নি।

"বিষয়ের বিভিন্নতার জন্য পদাবলীর উপর কীর্তিলতার প্রত্যক্ষ প্রভাব খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তথাপি রচনারীতি (স্টাইল), তীক্ষ্ণাগ্র সংক্ষেপোক্তির প্রাচুর্য, উপমার যুক্তিযুক্ততা ও ছন্দোবৈচিত্র্যের দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র, একই রচয়িতার বিশিষ্ট ছাপ সহজেই লক্ষ্য করা যায়।......

পরপুরুষাসক্ত কুলকামিনীদের সম্বন্ধে কবি নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত কিন্তু অর্থপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন।

সর্বত্ত—কেয়া বাজি নঅন তরুণী হেরি বঙ্ক।
চোরি প্রেম পিয়ারিও আপন দোষে সশঙ্ক॥

এই সমস্ত স্থানে কবির দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও বক্রোক্তিনিপুণতার পরিচয় মিলে। সময় সময় পদাবলীতে কীর্তিলতার মন্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। যথা,

বিঅখখনী পরিহাস পেসনী সুন্দরী সার্থ জবে দেখিঅ।

তবে মনে কর তেসরা লাগি তীনু উপেখ্খিঅ॥

অর্থাৎ—এই বিষফণী পরিহাসনিপুণা সুন্দরীবৃন্দকে (বারনারী) যখন দেখি তখন মনে হয় ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুবর্গের তৃতীয়টির (কামের) জন্য আর তিনটিকে উপেক্ষা করি।

বিদ্যাপতির ৭০-সংখ্যক পদে রাধিকার রূপ বর্ণনাপ্রসঙ্গে এই চতুবর্গ ফলপ্রাপ্তির সৌভাগ্যের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে।

জনিকর এহনি সোহাগিনি সজনি গে

পাওল পদারথ চারি॥

অবশ্য তুলনাতে রাধিকার প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইতেছে। বারনারীর রূপমোহে কামেরই একচ্ছত্র প্রাধান্য, রাধিকার প্রণয়ের মধ্যে চতুর্বিধ ফলের সামঞ্জস্যপূর্ণ চরিতার্থতা। তথাপি মনে হয় যে এই চিন্তাধারা লেখকের একই মনোভাব ইহতে উদ্ভূত। চতুবর্গ বুঝাইতে 'পদারথ চারি' এইরূপ ভাষার প্রয়োগ কোনো বাঙ্গালী কবির পক্ষে স্বাভাবিক মনে হয় না, সুতরাং ইহা যে অবাঙ্গালী কবির রচনা এইরূপ প্রতীতি জন্মে।"

বিদ্যাপতির পদাবলীর রসসৌন্দর্য-উপভোগে সমালোচকের সামগ্রিক দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য প্রতিষ্ঠিত, একথা অবশ্যস্বীকার্য। যুক্তিবর্জিত ভাবাতিরেক ও আবেগসর্বস্বতা বর্জন করে আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সমালোচনাকে এক দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কোন্ সমালোচনা-পদ্ধতির অনুসরণ করেছিলেন?

তাঁর নিজের কথায়, "আমি জ্ঞাতসারে কোনও বিশেষ সমালোচনারীতি অনুসরণ করি নাই। প্রাথমিক সূত্রের আলোচনা অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ কবি বা সাহিত্যিকের মধ্যে এই সূত্রসমূহের ব্যবহারিক প্রয়োগ, তাঁহাদের সৌন্দর্যসৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের নির্ধারণ ও রসোপভোগ-প্রয়াসই আমার নিকট অধিক প্রয়োজনীয় ও আদরণীয় বলিয়া মনে হয়। কাজেই যাঁহারা সাহিত্যালোচনায় সৌন্দর্যতত্ত্ব বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দেন, তাঁহারা হয়ত এই

রচনাগুলিতে পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন না।"

[ভূমিকা, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, দোলপূর্ণিমা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ]

সমালোচক শ্রীকুমারের সমালোচনা-পদ্ধতির পরিচয় এখানে পাই। মুখ্যতঃ যে সাহিত্যসৃষ্টি তাঁকে মুগ্ধ ও অভিষিক্ত করেছিল, তা ইংরেজি রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় কাব্যধারা। আর সে মুগ্ধতার পরিচয় তাঁর সমালোচনাকর্মে সংগুপ্ত নয়।

ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যে তাঁর আসক্তি তাঁর অধ্যাপনায় ও রবীন্দ্র-সমালোচনায় ধরা পড়ে। তাঁর ছাত্রেরা সাক্ষ্য দেবেন, ইংরেজি রোমান্টিক কাব্য-সৌন্দর্যাস্বাদনে অধ্যাপক শ্রীকুমারের নৈপুণ্য কতো গভীর ও সুদূরপ্রসারী ছিল। তাঁর ইংরেজি গবেষণার বিষয়—ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের কাব্যাদর্শের বিচার। তাঁর 'রবীন্দ্র-সৃষ্টি সমীক্ষা' (প্রথম খণ্ড, ১৯৬৫ ; দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭০) তার পরিচায়ক। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'সমালোচকের প্রধান কর্তব্য কবির সৌন্দর্যবিশ্লেষণ ও পাঠকের মনে সৌন্দর্যানুভূতির সঞ্চার।'

'রবীন্দ্রসৃষ্টিসমীক্ষা'য় তিনি এই কর্তব্য সার্থকতার সঙ্গে পালন করেছেন। তার অর্ধশতাব্দী সম্প্রসারিত সাহিত্যচর্চা ও রসাস্বাদনের পরিপক্ক রূপ এই গ্রন্থ। ইংরেজি রোমান্টিক কাব্য তাঁর চিত্তকে যেভাবে উদ্দীপ্ত করে এমন আর কিছুই করে না ; এই সত্য এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। সামান্য উদাহরণে এই বক্তব্য প্রমাণ করা যায়। আচার্য শ্রীকুমার সন্ধ্যাসংগীত থেকে চিত্রা—এই পর্বকে রবীন্দ্রসৃষ্টিকল্পনার পূর্ণ উৎসারের ও সমস্ত বন্ধনমুক্তির স্বর্ণযুগ বলে বিশ্বাস করতেন। তিনি সোনার তরী কাব্যের মধ্যমণিরূপে নির্দেশ করেছেন 'মানসসুন্দরী' কবিতাটিকে। সাতপৃষ্ঠাব্যাপী (পৃ: ৭০-৭৬, রবীন্দ্রসৃষ্টি-সমীক্ষা : ১ম খণ্ড) বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি এই কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছেন। এই সমালোচকের প্রথম ও উনশেষ বাক্যটি এখানে উদ্ধার করি।

"এই কাব্যের মধ্যমণি হইতেছে 'মানসসুন্দরী'। শুধু কাব্যোৎকর্ষের শ্রেষ্ঠতার দিক দিয়া নহে, কবির আ-কৈশোর অনুসৃত, প্রকৃতি ও মানবমনের শ্রেষ্ঠ-সৌন্দর্যকণিকা সমবায়িত মানসী কল্পনার অপূর্ব সুন্দর রূপপ্রতিমা গঠনের সার্থকতায়।

"বিমূর্তভাবের রসোজ্জ্বল প্রকাশ, ইন্দ্রিয়মুগ্ধতার সঙ্গে অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনার অপূর্ব সমন্বয়, প্রাকৃত আবেগের উন্মত্ততার মধ্যে নিগূঢ় সংযম, নব নব সঞ্চারিণী ভাবকল্পনার আশ্চর্য কেন্দ্রসংহতি, দেহলাবণ্যের মধ্যে আত্মার

স্থির-জ্যোতি-বিকিরণ, অনুভূতির প্রগাঢ়তার সঙ্গে শব্দযোজনা ও ছন্দ প্রবাহের অকল্পনীয় সহযোগিতা—এই সমস্ত গুণসমবায়ে 'মানসসুন্দরী'র অন্তর্লো'কে ও বহির্লোকে উভয় কক্ষবিহার ইহাকে প্রেম ও ভাবরূপকপর্যায়ের কবিতার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।"

রবীন্দ্র-কবিতার অন্তঃসৌন্দর্যসন্ধানে সমালোচকের এই অভিযাত্রা তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও রসানুভূতির উজ্জ্বল নিদর্শন।

রবীন্দ্রসাহিত্যসমালোচকরূপে আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতিত্ব বিচারেব সঙ্গে তাঁর রবীন্দ্রসমালোচনাচিন্তাও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্তমান বাংলা রবীন্দ্রসমালোচনার ত্রুটি ও পথনির্দেশে তিনি অভ্রান্ত বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মানসিক ঔদার্য, নূতন রসবিচারপদ্ধতির প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টি, নবীনের প্রতি সস্নেহ আমন্ত্রণ তাঁর সাহিত্যভাবনায় ও কর্মে প্রতিফলিত হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক রবীন্দ্রসমালোচনাকর্মের ভূমিকাচ্ছলে তিনি যা লিখেছেন, তা বোধ করি মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ মুদ্রিত অভিমত (শ্রীগৌরীপ্রসাদ ঘোষের 'রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপ' গ্রন্থের পরিচায়িকা ১লা অক্টোবর ১৯৬৯)। এই অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এখানে রসগ্রাহী সমকৃদর্শী সাহিত্যবিচারকের সাক্ষাৎ পাই।

তিনি লিখেছেন, "আজকাল রবীন্দ্রসাহিত্যগবেষণায় বাঙ্‌লা দেশে বহু কৃতী সুধী ব্যক্তি আত্মনিয়োগ করেছেন। কিন্তু এই উর্বরা ও একান্ত আকর্ষণীয় বিষয়ে যে প্রচুর গবেষণা হয়েছে ও হচ্ছে তার মধ্যে দুরকম সংকীর্ণতার চিহ্ন পরিস্ফুট। প্রথমত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তের কার্যক্রমের অভাবে এদের অধিকাংশই উচ্ছ্বাসবহুল নির্বিচার প্রশস্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত কিছু অংশ রবীন্দ্রভাবধারার সারসঙ্কলন প্রাচুর্যে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় নিছক ভক্তিপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করেছে। রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন তাই নির্ধারণ করতে আমরা এমন ব্যস্ত যে তিনি কেমন করে বলেছেন সে জিজ্ঞাসা আমাদের নিকট গৌণ হয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় ফেলে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে আমরা তাদৃশ মনোযোগী হই নি। তাঁকে সার্বভৌম বিচারের মানদণ্ড প্রয়োগ করে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক-বৃন্দের তুলনায় তাঁর স্থান নিরূপণ করার দায়িত্ব আমরা অস্বীকার করেছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আসল মূল্য জানা যাবে তাঁকে ভারতীয় কাব্য বা সংস্কৃতির নিরিখে যাচাই করে নয়, তাঁর ভাবধারার অবিমিশ্র বৈচিত্র্য বা উৎকর্ষে নয়,

তাঁর বাণীভঙ্গিমার শাশ্বত ও দূরসঞ্চারী ব্যঞ্জনাশক্তির উপলব্ধিতে। ইংরাজী সাহিত্যে শেক্‌স্‌পীয়র, মিলটন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীট্‌স্‌, টেনিসন, ব্রাউনিং প্রভৃতি কবির কোন কোন পংক্তি আমাদের চেতনায় যে মুগ্ধ বিস্ময়, যে গভীর অনুরণন, চিত্তের যে গূঢ়তম উদ্বোধন জাগায়, যাতে একসঙ্গে রুচি ও রসবোধ তৃপ্তিলাভ করে, সেইরূপ পংক্তি রবীন্দ্রকাব্যে কত প্রচুর ও স্বতঃস্ফূর্ত তাই বিচার করে তাঁর রচনা বর্তমানকে উত্তীর্ণ হয়ে মহাকালের কণ্ঠে উচ্চারিত হবে, মুহূর্তের তিলক তাঁর ললাটে শাশ্বত ভাস্বরতায় উদ্ভাসিত হবে কি না তারই পরীক্ষায়।"

রবীন্দ্রকাব্যশিল্পের বিচারকে তিনি এভাবেই অভ্যর্থনা করেছেন। রবীন্দ্র-সৃষ্টিসমীক্ষা'য় তাঁর অনুসৃত পথ রবীন্দ্রসাহিত্যবিচারের শেষ কথা নয়, অন্য পথও আছে—এই স্বীকৃতি এখানে পাই। নবীনবরণের মানসিক ঔদার্য ও খোলামনের পরিচয় এখানে বিধৃত।

সাহিত্যের মর্মসন্ধানী আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ে রসসৃষ্টির আলোকে বাংলাসাহিত্যের অনেক অন্ধকার ক্ষেত্র আলোকিত হয়েছে, আবার অনেক পরিচিত ক্ষেত্র নবসৌন্দর্যে অভিষিক্ত হয়েছে। তাঁর হাতে বাংলা সমালোচনা সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর তিরোধানে বাংলা সাহিত্য দরিদ্র হয়েছে। *

---

* সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আমার বক্তব্যের সমর্থনে দুটি অভিমত উদ্ধার করছি। এ দুই অভিমত যাঁরা দিয়েছেন তাঁরা আচার্যকে অর্ধশতাব্দী যাবৎ (১৯২০-৭০) ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছেন। দুজনেই প্রথিতযশা অধ্যাপক-সমালোচক।

১। In my opinion, he is the first pure critic in Bengali literature, and so far, the greatest. By a pure critic I mean who makes 'interpretation' the sole aim of his literary pursuits, and who is not deflected foom his work by any ethical, philosophical, sociological or political bias, and who, in Arnold's language, wants to see the object—here the literary work—as it is. (Prof. Subodh Chandra Sengupta, "The Mother", 'Dr. Srikumar Banerjee Commemoration Number', August, 1970).

২। Indeed, in Prof. Srikumar Banerjee there was the rare combination of a penetrating intellect with a romantic

sensibility, of imagination with a close grip over realities, of enthusiasm with perfect sanity. His powers of analysis, so far as literary qualities were concerned, were unrivalled. I rememeber him teaching Swinburne in our class. He tried to bring home to us the mood reflected in the poem, the exact realisation from which the poem derived its inspiration, the very human factors in it which were universalised by the magic of the poet's art. In this context he drew out the significance of every single word and its poetic appeal, pointing out how they fitted in a rich and complex whole. We were overpowered with a sense of wonder at his ability to seize the subtlest filaments of poetic suggestion and the most delicate nuances of thought and emotion. He carefully discriminated between the methods of Swinburne and of other poets like Shelly, and contrasted their poetic achievements. He did not say that Swinburne was always excellent as a poet ; he placed Swinburne in his right position in the company of English poets, but at the same time he made us realise that Swinburne was not a mere rhymer as he is sometimes supposed to be.......

It cannot be denied that as a critic he belonged to the romantic school and had little patience with the disintegrator of modern age. But to say this is less than doing him justice. There was litte in his exposition that he borrowed from others, he did not rely too much on literary theories and dicta. His criticism stamped with the qualities of his mind stands in a class by itself....

He was universally accepted as the greatest teacher and critic in Bengali in recent times, the fountain-head of inspiration and guidance to all who needed them.

(Prof. Amulyadhan Mukherjee, Ibid.)

'মানুষের ধর্ম' : রবীন্দ্রনাথের অন্বেষণ

॥ এক ॥

১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বরানগরে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ভবন 'আম্রপালি'তে।

"[কলিকাতা] বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬ই অগস্ট তারিখে তাঁর সম্বর্ধনা হয়েছে। কবির আর্থিক অবস্থা অস্বস্তিজনক। অবশেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের পদ তাঁকে নিতে হল; 'কমলা বক্তৃতা' দেবারও আহ্বান পেলেন।"

"১৯৩৩ সাল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নূতন সম্বন্ধ অধ্যাপনার—যদিচ সত্যকার ক্লাস তাঁকে নিতে হয় নি। কমলা বক্তৃতাগুলি দিলেন, বক্তৃতার বিষয় ছিল—'মানুষের ধর্ম'। দুই বৎসর পূর্বে অক্‌স্‌ফোর্ডে যে বক্তৃতা দেন এগুলি তারই বাংলা রূপান্তর, বাঙালি সাধারণ শ্রোতার উপযোগী করে বলা—যথাসাধ্য সহজ করার চেষ্টা করেছেন।" [শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের, রবীন্দ্র জীবনকথা, ১৩৬৫, পৃ ২১৫-২১৮]।

এই প্রসঙ্গে আরো দুটি তথ্য অবশ্যস্মর্তব্য। পঞ্চমবার পশ্চিম গোলার্ধ ভ্রমণের পর রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরলেন ১৯৩১ খ্রস্টাব্দে। এই পর্যায়ে তিনি ইংলাণ্ড, জার্মানি, সোভিয়েত দেশ, মার্কিন দেশ ভ্রমণ করে এসেছেন। কবির সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে জন্ম-উৎসব সমিতির পক্ষ থেকে নিবেদিত হয় 'দ্য গোলডেন বুক অভ্ টেগোর' (ডিসেম্বর, ১৯৩১)। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলে কবি যান পারস্য ভ্রমণে, ফিরে আসেন জুনে। এই সময়ে প্রকাশিত অন্যান্য রচনা—নবীন (গীতিনাট্য, ১৯৩১), রাশিয়ার চিঠি (ভ্রমণকথা, ১৯৩১), বনবাণী (কবিতা ও গান, ১৯৩১), শাপমোচন (কথিকা ও গান, ১৯৩১), পরিশেষ (কবিতা, ১৯৩২), কালের যাত্রা (নাট্যসংলাপ, ১৯৩২), পুনশ্চ (গদ্যকাব্য, ১৯৩২), গান্ধি প্রসঙ্গে রচিত একটি ইংরেজি ও তিনটি বাংলা ভাষণের সংকলন (১৯৩২), দুই বোন (উপন্যাস, ১৯৩৩), চণ্ডালিকা (নাটিকা, ১৯৩৩),

তাসের দেশ (নাটিকা, ১৯৩৩), বাঁশরী (নাটক, ১৯৩৩), ভারতপথিক রামমোহন রায় (প্রবন্ধ, ১৯৩৩)। বনবাণী, দুই বোন ও বাঁশরী ছাড়া বাকি সব রচনাই 'মানুষের ধর্ম' আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। এই তিন বৎসরের (১৯৩১-৩৩) সকল রচনায় রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মবোধ সংহতরূপ লাভ করেছে। তাই 'মানুষের ধর্ম' রচনার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার ক্রমবিকাশ এবং মানবধর্ম ও বিশ্বমৈত্রীবোধের প্রতিষ্ঠা বিশেষ লক্ষণীয়। অকসফোর্ডে প্রদত্ত হিবার্ট-বক্তৃতা 'রিলিজন্ অভ্ ম্যান'-এর সঙ্গে 'মানুষের ধর্ম'-এর আলোচনার সম্পূর্ণ ছবিটি পাওয়া যায় না, বাংলাদেশের নবজাগরণের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মবোধের বিকাশের স্তরগুলি অনুসরণ করে সামগ্রিক উপলব্ধিতে উপনীত হওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের মতে ঐক্যের উপলব্ধিই মনুষ্যত্ব। তাঁরাই মহাপুরুষ যাঁরা অনৈক্য ও বিভেদ, সংকীর্ণতা ও জড়তা থেকে আমাদের মুক্তি দেন। বুদ্ধদেব থেকে রামমোহন পর্যন্ত মহামানবের ধারা পর্যালোচনা করে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, "বুদ্ধদেব জাতি বর্ণ ও শাস্ত্রের সমস্ত ভাগবিভাগ অতিক্রম করে বিশ্বমৈত্রী প্রচার করেছিলেন। এই বিশ্বমৈত্রী যে মুক্তি বহন করে সে হচ্ছে অনৈক্যবোধ থেকে মুক্তি।" ('ভারতপথিক রামমোহন')

এই মৈত্রীসাধনায় যে-সব মহাপুরুষ আত্মনিয়োগ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মতে তাঁরা মুক্তিদাতা। চৈতন্যদেব, কবীর, দাদূ, নানক, তুকারাম প্রমুখ মধ্যযুগীয় ভারতীয় সন্তদের কথা রবীন্দ্রনাথ বার বার আলোচনা করেছেন, কবিতায় তাঁদের সাধনাকে এনেছেন, বলেছেন তাঁরা ভারতবর্ষের মনের মুক্তিদাতা।

শতাব্দীর সূচনায় রবীন্দ্রনাথ নিখিল মানবাত্মাকে ব্রহ্মোপলব্ধির পথে জ্ঞানে ও ভক্তিতে পেয়েছিলেন ('ঔপনিষদ ব্রহ্ম', ১৯০১), তার বত্রিশ। বৎসর পরে, পঞ্চমবার ইয়োরোপ-আমেরিকা ভ্রমণের পরে পুনশ্চ-পত্রপুট-রিলিজন অভ্ ম্যান-মানুষের ধর্ম-এর পর্বে সর্বজনীন মানবকে লাভ করেছেন মনন ও বুদ্ধির মাধ্যমে।

ইয়োরোপ থেকে মানবমুক্তিবাণী ও বিশ্বমৈত্রীমন্ত্র ঊনবিংশ শতকের নবজাগ্রত শিক্ষিত বাঙালি গ্রহণ করেছিল। সেদিনের বাংলাদেশ মধ্যযুগকে অতিক্রম করে দ্রুত পদবিক্ষেপে আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ হল। রবীন্দ্রনাথের জন্ম এই যুগান্তরের আবর্তে। রামমোহনের পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,

মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা এই মুক্তিসাধনার ইতিহাসে অবশ্যস্মর্তব্য। নোতুন মূল্যবোধকে সাগ্রহ অভ্যর্থনা ও পুরনো মূল্যবোধের বিসর্জনে এঁরা এগিয়ে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই সাধনাকে সংহত রূপ দিতে চেয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দের অধিকাংশ বাঙালি চিন্তানায়ক ইয়োরোপের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে চেয়েছেন। বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল, স্বামী বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র—সকলেই নবীন পশ্চিম জগতের সঙ্গে শ্রান্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের মিলনসাধনে আগ্রহী হয়েছিলেন। সাহিত্যে, মননে, কর্মে, ধর্মোপলব্ধিতে, সমাজসংস্কারে, রাজনৈতিক চেতনায় যতই বাঙালি সমাজ অগ্রসর হয়েছে, ততই পশ্চিমের সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই সংযোগ-সম্পর্ককে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে না রেখে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে গ্রহণ করলেন আর বললেন,

"তাই ভেবে দেখলে দেখা যাবে, এই যুগ ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর সহযোগিতারই যুগ। বস্তুত, যেখানে তার সঙ্গে আমাদের চিত্তের, আমাদের শিক্ষার অসহযোগ, সেইখানেই আমাদের পরাভব। এই সহযোগ সহজ হয়, যদি আমাদের শ্রদ্ধায় আঘাত না লাগে। পূর্বেই বলেছি, ইয়োরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল ; দেখেছিলুম জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইয়োরোপ মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে।" (কালান্তর, ১৯৩৭)

ভারতবর্ষের উপর পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের শুভঙ্কর প্রভাবের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"বর্তমান যুগের প্রধান লক্ষণ এই যে, সংকীর্ণ প্রাদেশিকতায় বদ্ধ বা ব্যক্তিগত মূঢ় কল্পনায় জড়িত নয়। কি বিজ্ঞানে কি সাহিত্যে, সমস্ত দেশে সমস্ত কালে তার ভূমিকা। ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতা সর্বমানবচিত্তের সঙ্গে মানসিক দেনা-পাওনার ব্যবহার প্রশস্ত করে চলেছে।......পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতিকে আমরা ক্রমে ক্রমে স্বতঃই স্বীকার করে নিচ্ছি। এই ইচ্ছাকৃত অঙ্গীকারের স্বাভাবিক কারণ এই সংস্কৃতির বন্ধনহীনতা, চিত্তলোকে এর সর্বত্রগামিতা—নানা ধারায় এর অবাধ প্রবাহ। এর মধ্যে নিত্য উদ্যমশীল বিকাশধর্ম নিয়ত উন্মুখ, কোনো

দুর্নম্য কঠিন নিশ্চল·সংস্কারের জালে এ পৃথিবীর কোণে কোণে স্থবিরভাবে বদ্ধ নয়, রাষ্ট্রিক ও মানসিক স্বাধীনতার গৌরবকে এ ঘোষণা করেছে—সকল প্রকার যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসের অবমাননা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করবার জন্যে এর প্রয়াস।······এই সংস্কৃতির সোনার কাঠি প্রথম যেই তাকে স্পর্শ করল অমনি বাংলাদেশ সচেতন হয়ে উঠল। এ নিয়ে বাঙালি যথার্থই গৌরব করতে পারে।······চিত্তসম্পদকে সংগ্রহ করার অক্ষমতাই বর্বরতা, সেই অক্ষমতাকেই মানসিক আভিজাত্য বলে যে মানুষ কল্পনা করে সে কৃপাপাত্র।" ('বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ', ডিসেম্বর, ১৯৩৫, সাহিত্যের পথে)

বর্তমান যুগের বেগবান বন্ধনহীন চিত্তের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের এই দৃঢ়তা রবীন্দ্রনাথের রচনায় একদিনে আসে নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মবোধ ও বিশ্ববোধকে পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই পেয়েছেন। 'মানুষের ধর্ম' রচনায় যে উদার মানবধর্মের উপলব্ধি, তা রবীন্দ্রনাথকে অর্জন করতে হয়েছিল। এই সত্য আমরা কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারি না।

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় রবীন্দ্রনাথ সর্বভূতান্তরাত্মা ব্রহ্মকে মানুষের মধ্যে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। সেদিন তাঁর মনে হয়েছিল,

"আমরা জ্ঞানে প্রেমে কর্মে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কেবল মানুষকেই পাইতে পারি। এইজন্য মানুষের মধ্যেই পূর্ণতরভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। নিখিল মানবাত্মার মধ্যে আমরা সেই পরমাত্মাকে নিকটতম অন্তরতম রূপে জানিয়া তাঁহাকে বারবার নমস্কার করি। সর্বভূতান্তরাত্মা ব্রহ্ম এই মনুষ্যত্বের ক্রোড়েই আমাদিগকে মাতার ন্যায় ধারণ করিয়াছেন, এই বিশ্বমানবের স্তন্যরসপ্রবাহে ব্রহ্ম আমাদিগকে চিরকালসঞ্চিত প্রাণ বুদ্ধি প্রীতি ও উদ্যমে নিরন্তর পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেছেন, এই বিশ্বমানবের কণ্ঠ হইতে ব্রহ্ম আমাদের মুখে পরমাশ্চর্য ভাষার সঞ্চার করিয়া দিতেছেন, এই বিশ্বমানবের অন্তঃপুরে আমরা চিরকালরচিত কাব্যকাহিনী শুনিতেছি, এই বিশ্বমানবের রাজভাণ্ডারে আমাদের জন্য জ্ঞান ও ধর্ম প্রতিদিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। এই মানবাত্মার মধ্যে সেই বিশ্বাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিলে আমাদের পরিতৃপ্তি ঘনিষ্ঠ হয়—কারণ মানবসমাজের উত্তরোত্তর বিকাশমান অপরূপ রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে ব্রহ্মের আবির্ভাবকে কেবল জানা মাত্র আমাদের পক্ষে যথেষ্ট আনন্দ নহে, মানবের বিচিত্র প্রীতিসম্বন্ধের মধ্যে

ব্রহ্মের প্রীতির নিশ্চয়ভাবে অনুভব করতে পারা আমাদের অনুভূতির চরম সার্থকতা এবং প্রীতিবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণাম যে কর্ম সেই কর্মদ্বারা মানবের সেবারূপে ব্রহ্মের সেবা করিয়া আমাদের কর্মপরতার পরম সাফল্য।" ('ধর্মপ্রকার', ফাল্গুন, ১৩১০ বঙ্গাব্দ, ধর্ম, ১৯০৩)

ব্রহ্ম জননীর মতো আমাদেরকে ধারণ করে আছেন,—শতাব্দী-সূচনায় রবীন্দ্রনাথ এই ধারণাকে আশ্রয় করেছিলেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদিক ব্রহ্মকে জীবনে পেতে চেয়েছিলেন। 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা (সতেরো খণ্ড, ১৯০৯-১৯১৬) তার পরিচয়স্থল। সেদিন উপনিষদ ছিল রবীন্দ্রনাথের পরম আশ্রয়। "উপনিষদ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। এ যে কেবল সুন্দর ছায়াময় তা নয়, এ বৃহৎ এবং কঠিন। এর মধ্যে যে কেবল সিদ্ধির প্রাচুর্য পল্লবিত তা নয়, এতে তপস্যার কঠোরতা উর্ধ্বগামী হয়ে রয়েছে।" (শান্তিনিকেতন ১ ; 'প্রার্থনা', পৃ ৪০)। সেদিন উপনিষদের আনন্দরূপের মাঝেই কবি মুক্তির সন্ধান করেছেন। রূপের অন্তরালে যে আনন্দ, তা'ই মুক্তি। এই চিন্তাটি ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

"প্রতিদিনের এই যে অভ্যস্ত পৃথিবী আমার কাছে জীর্ণ, অভ্যস্ত প্রভাব আমার কাছে ম্লান, কবে এরাই আমার কাছে নবীন ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে? যেদিন প্রেমের দ্বারা আমার চেতনা নবশক্তিতে জাগ্রত হয়। যাকে ভালবাসি আজ তার সঙ্গে দেখা হবে, এই কথা স্মরণ হলে কাল যা কিছু শ্রীহীন ছিল আজ সেই সমস্তই সুন্দর হয়ে ওঠে। প্রেমের দ্বারা চেতনা যে পূর্ণশক্তি লাভ করে সেই পূর্ণতার দ্বারাই সেই সীমার মধ্যে অসীমকে, রূপের মধ্যে অরূপকে দেখতে পায়, তাকে নূতন কোথাও যেতে হয় না। ওই অভাবটুকুর দ্বারাই অসীম সত্য তার কাছে সীমায় বদ্ধ হয়েছিল।" (শান্তিনিকেতন ১,পৃ ৩৮৭)

সেদিন ঔপনিষদিক ব্রহ্মের সাধনা তাঁর কাছে আনন্দের, প্রেমের, অরূপের, অসীমের সাধনা।

শতাব্দী-সূচনাতে প্রাচীন ভারত রবীন্দ্রনাথকে মোহমুগ্ধ করেছিল। নৈবেদ্য কাব্যে (১৯০১) তিনি প্রার্থনা করেছিলেন,

দাও আমাদের অভয়-মন্ত্র অশোক-মন্ত্র তব,
দাও আমাদের অমৃত-মন্ত্র দাও সে জীবন নব।

যে জীবন ছিল তব তপোবনে
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব,
মৃত্যু-তরণ শংকা-হরণ দাও সে জীবন নব।

তখন তিনি মনে করেছিলেন, চিরপুরাতন ভারতবর্ষের উপাসনায় আমাদের মুক্তি। তাই 'স্বদেশ' গ্রন্থে (১৯০৮) লিখেছিলেন,

"অদ্যকার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চিরপুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব।" ('নববর্ষ' ১৩০৯)

অথচ পরবর্তী তিন দশকে তাঁর জীবনবোধ এতো গুরুতর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেল যে, ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ জীবনসাধনা তথা ধর্মসাধনার অন্যতর উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছিলেন। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে সর্বমানবচিত্তের সঙ্গে মানসিক দেনা-পাওনার ব্যবহার প্রশস্ত করে চলেছে,—এই সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছলেন জীবনের শেষ দশকে। 'মানুষের ধর্ম' এসময়েই রচিত।

॥ দুই ॥

বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম যেদিন স্থাপনা করেন, সেদিন রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল ছাত্রদের প্রাচীন ভারতবর্ষের আশ্রমের ধাঁচে জীবনযাত্রায় ও শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। বৈদিক ও ঔপনিষদিক সংস্কৃতির পুনর্মূল্যায়নে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আশ্রমিকেরা নিযুক্ত হবে, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিলাষ। পরবর্তী কয়েক বৎসরে রবীন্দ্রনাথের মন কোন্ পথে চালিত হয়েছিল, তা জানা যায় 'শান্তিনিকেতন' ভাষণমালা (১৯০৯-১৯১৬) পাঠে। তপোবনের আদর্শচিত্র বাস্তবের নয়, রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় তার স্থিতি। কিন্তু ১৯০১ থেকে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ : এই বিশ বৎসরে রবীন্দ্রনাথের এই সব ধারণায় গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের স্থানে স্থাপিত হল বিশ্বভারতী (১৯২০)—তা বাঙালির নয়, হিন্দুর নয়, তপোবনকেন্দ্রিক প্রাচীন ভারতের নয়, তা বিশ্বের, আধুনিক কালের। বিশ্বভারতীতে বিশ্ব এসে নীড় বাঁধলো ('যত্র বিশ্ব ভবত্যেকং নীড়ং)—রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধে গুরুতর পরিবর্তন ঘটলো।

রবীন্দ্রনাথের তৃতীয়বারে ইয়োরোপ-আমেরিকা পরিভ্রমণ এই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। প্রথম (১৮৭৮-৮০) ও দ্বিতীয় বার (১৮৯০) ইয়োরোপ ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ ও ত্রিশ বৎসরের যুবক। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) ও 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' (১ম খণ্ড, ১৮৯১, ২য় খণ্ড ১৮৯৩) এই দুই ভ্রমণের ফসল। দ্বিতীয়বার ইয়োরোপ ভ্রমণের পরই রবীন্দ্র-প্রতিভা স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত হল, মানসী-র কবি ও গল্পগুচ্ছের লেখককে আমরা পেলাম। তারপরেই 'সাধনা' পত্রিকায় কবি গদ্য-পদ্যের জুড়িগাড়ি হাঁকাতে শুরু করলেন, অজস্র সহস্রবিদ চরিত্রতার্থতায় রবীন্দ্র-প্রতিভার আত্ম-প্রকাশ ঘটলো।

রবীন্দ্রনাথ তৃতীয়বার ইয়োরোপ ভ্রমণে (ও এই প্রথম মার্কিন দেশ ভ্রমণে) গেলেন ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে, ফিরলেন ১৯১৩-র অক্টোবরে। এই যাত্রায় জাহাজে গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জমা করেন, পশ্চিমের মনীষীদের সঙ্গে পরিচিত হন, নোতুন পৃথিবী আমেরিকার সঙ্গে পরিচয় সাধিত হয়। ফিরে আসার পরই সংবাদ এলো (১৫ নভেম্বর, ১৯১৩) রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি কাব্য 'সং-অফারিংস্'-এর জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। ১৯১২-১৩ খ্রীস্টাব্দে ইয়োরোপ-আমেরিকা থেকে লিখিত পত্রাবলী তখন তত্ত্ব-বোধিনীপত্রিকায় প্রকাশিত হয়, অনেক পরে 'পথের সঞ্চয়' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৯৩৯)। ফিরে আসার পরই রবীন্দ্র-সাহিত্যে পালা বদল হয়, বলাকা, ঘরেবাইরে, চতুরঙ্গ, ফাল্গুনী, গল্পসপ্তক প্রকাশিত হয় (১৯১৬)।

নানাকারণে 'পথের সঞ্চয়' পত্রাবলী মূল্যবান। এই তৃতীয়বার পশ্চিম-জগৎ ভ্রমণের ফলে রবীন্দ্রনাথ মানস-দিগন্তরেখা বিস্তৃত হল, অনেক পুরনো মূল্যবোধ ও ধারণা বর্জিত হল, নোতুন মূল্যবোধ দেখা দিল। 'য়ুরোপের অন্তরতর মানবাত্মার একটি সত্য মূর্তি' এই যাত্রায় কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। 'স্বদেশ' প্রবন্ধগ্রন্থে চল্লিশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপকে জড়বাদী বলেছিলেন, আজ বাহান্ন বৎসর বয়সে ইয়োরোপের আধ্যাত্মিকতা প্রত্যক্ষ করেছেন তার যৌবনচাঞ্চল্যে, আত্মত্যাগেচ্ছায়, জীবনের প্রাচুর্যে ও বিপদ বরণের আগ্রহে। ইয়োরোপের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ তীব্র কণ্ঠে বিরুদ্ধপক্ষের উদ্দেশে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেছেন—

"আত্মত্যাগের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার কি কোনো যোগ নাই। এটা কি ধর্মবলেরই একটি লক্ষণ নহে। আধ্যাত্মিকতা কি কেবল জনসঙ্গ বর্জন করিয়া

শুচি হইয়া থাকে এবং নাম জপ করে। আধ্যাত্মিক শক্তিই কি মানুষকে বীর্য দান করে না।" (যাত্রার পূর্বপত্র, আষাঢ়, ১৩১৯, পথের সঞ্চয়)

ইয়োরোপীয়দের জীবনচাঞ্চল্য প্রত্যক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ইহাদের প্রাণের শক্তি কেবলমাত্র খেলা করে না। কর্মক্ষেত্রে এই শক্তির নিরলস উদ্যম, ইহার অপ্রতিহত প্রভাব।......যে-শক্তি কর্মের উদ্যোগে আপনাকে সর্বদা প্রবাহিত করিতেছে সেই শক্তিই খেলার চাঞ্চল্যে আপনাকে তরঙ্গিত করিতেছে। শক্তির এই প্রাচুর্যকে বিজ্ঞের মতো অবজ্ঞা করিতে পারি না। ইহাই মানুষের ঐশ্বর্যকে নব নব সৃষ্টির মধ্যে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। ইহা নিজেকে দিকে দিকে অনায়াসে অজস্র ত্যাগ করিতেছে, সেইজন্যই নিজেকে বহুগুণে ফিরিয়া পাইতেছে। ইহাই সাম্রাজ্যে বাণিজ্যে বিজ্ঞানে সাহিত্যে কোথাও কোনো সীমা মানিতেছে না—দুর্লভের রুদ্ধ দ্বারে অহোরাত্র প্রবল বেগে আঘাত করিতেছে। এই-যে উদ্যত শক্তি, যাহার একদিকে ক্রীড়া ও অন্যদিকে কর্ম, ইহাই যথার্থ সুন্দর।" (খেলা ও কাজ, তদেব)

বিশ্বমানবতাবোধের পথে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পদক্ষেপ ঘটেছে এই পর্বেই। ব্রহ্মোপলব্ধি বা কল্পনাসর্বস্বতায় নয়, নিতান্ত বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ মিলনের আবশ্যকতা তিনি এই সময়েই উপলব্ধি করেছেন। কেম্‌ব্রিজের অধ্যাপক লোয়েস ডিকিন্‌সন ও অধ্যাপক রাসেল, চিন্তানায়ক এইচ. জি. ওয়েলস ও রেভারেণ্ড এন্‌ড্রুস, সঙ্গীতবিদ্ ডাক্তার ইয়র্কট্রিটার ও চিত্রবিদ্ রোদেনস্টাইন, কবি ইয়েটস্‌ ও দার্শনিক অয়কেন্‌-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তিনি এই উপলব্ধিতে উপনীত হন। কেম্‌ব্রিজের প্রাচীন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্যানে নিশীথে অধ্যাপক ডিকিনসন ও রাসেলের সাহচর্যে ও আলাপে মানবতার বিচিত্র ধারাটিকে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করে লিখেছিলেন,

"মানুষের চিত্তের চঞ্চল ধারাটিও তেমনি বিশাল বিশ্বের এক প্রান্ত দিয়া নানাপথে আঁকিয়া-বাঁকিয়া নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া কেবলই বিশ্বকে প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়াছে। যেখানে সেই প্রকাশ পরিপূর্ণ ও প্রশস্ত সেইখানেই বিশ্বের চরিতার্থতা আনন্দে ও ঐশ্বর্যের সমারোহে উৎসবময় হইয়া উঠিয়াছে। নিস্তব্ধ রাত্রে দুই বন্ধুর মৃদু কণ্ঠে কথাবার্তায় আমি মানুষের মনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের সেই আনন্দ, সেই ঐশ্বর্য অনুভব করিতেছিলাম।"

(ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ, তদেব)

রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপ-আমেরিকা ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে এলেন ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে। বস্তুতঃ এ তাঁর কেবল ঘরে ফেরা নয়, মানুষের দিকে ফেরা। এখানেই 'মানুষের ধর্ম'-এর যথার্থ সূচনা। রবীন্দ্রনাথ এখন থেকে অধিকতর বাস্তব-সচেতন হলেন, আধুনিক যুগের মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে সাহিত্যে রূপ দিলেন, জীবনকে আরো গভীরভাবে গ্রহণ করলেন, জীবনের রুক্ষ কঠোর দৈন্যপীড়িত ছবির সম্মুখীন হলেন; সর্বকালীন মানবের সন্ধানে বার হলেন, বিশ্বমানবতাবোধের পথে যাত্রা করলেন।

রবীন্দ্রনাথ আবার বিদেশে যান ১৯২৪-২৫ খ্রীস্টাব্দে। এবারে গন্তব্য ছিল দক্ষিণ আমেরিকার পেরু। কিন্তু পেরু পৌঁছতেই পারলেন না, শরীর বিগড়ে যাওয়ায় আর্জেন্টিনার বুয়োনোস এইরেস্ নগরের নিকটবর্তী সান্ ইসিদ্রোতে কয়েকমাস অসুস্থ শরীরে কাটান। যাওয়ার পথে ফ্রান্স ও ফেরার পথে ইতালি ছুঁয়ে কবি ফিরে আসেন। কবির এই খণ্ডিত দক্ষিণ-আমেরিকা ভ্রমণের ফলে বাংলাভাষা পেল দুখানি বই, 'যাত্রী' ও 'পূরবী', আর কবি পেলেন এক বান্ধবী শ্রীমতী বিজয়া ওরফে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো সানইসিদ্রোতে। এঁরই বাগানবাড়িতে কবি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতাবলয় বিস্তীর্ণ হল এই ভ্রমণের ফলে।

রবীন্দ্রনাথ চতুর্থবার ইয়োরোপ ভ্রমণে গেলেন ১৯২৬-এর জুনে। ইতালি, সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোস্লাবিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস ঘুরে কাইরো হয়ে সাতমাস পরে দেশে ফেরেন (ডিসেম্বর, ১৯২৬)। এই ভ্রমণকালে লিখিত পত্রধারা 'পথে ও পথের প্রান্তে' (১৯৩৮) গ্রন্থে সংকলিত হয়।

মালয় ও পূর্বদ্বীপাবলীতে ভ্রমণ (১৯২৭) ও কানাডা ও জাপান ভ্রমণ (১৯২৯) —এ দুয়ের আগে পরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'শেষের কবিতা', 'মহুয়া', 'কণিকা', 'তপতী' আর আঁকেন ছবির পর ছবি।

রবীন্দ্রনাথ পঞ্চম ও শেষবার ইয়োরোপ ভ্রমণে যান ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে—অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট বক্তৃতা দিতে ও ইয়োরোপে তাঁর ছবি প্রদর্শনী করতে। প্যারীতে বের্লিনে ছবির প্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত হয়। অক্‌সফোর্ডে বক্তৃতা দেন, তা রিলিজন অভ্ ম্যান নামে মুদ্রিত হয়। জার্মেনি ডেনমার্ক সুইজারল্যাণ্ড হয়ে রবীন্দ্রনাথ গেলেন সোবিয়েৎ দেশ ভ্রমণে—অনেক-দিনের সংকল্প কাজে পরিণত হল। সেখান থেকে ফিরে বের্লিন হয়ে উত্তর

আমেরিকায় মার্কিন দেশে চললেন। সেখান থেকে ফিরে লণ্ডন হয়ে সোজা দেশে ফিরলেন। এই সফরের ফল 'রাশিয়ার চিঠি" ও 'রিলিজন অভ্ ম্যান'। দেশে ফিরেই লিখলেন 'মানুষের ধর্ম' ও 'পুনশ্চ'।

লক্ষণীয়, প্রতিবারের বিদেশ ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছে নোতুন প্রেরণা। তাঁর অভিজ্ঞতার বৃত্ত ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়েছে, অনেক আঁধার অপসৃত হয়েছে, পশ্চিমী জগতের জীবন-অভিজ্ঞতা তাঁকে অনেক দিয়েছে।

বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ ১৯২৫ থেকে ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত এইসব গ্রন্থ—পূরবী, রক্তকরবী, লেখন, যাত্রী, পথে ও পথের প্রান্তে, রাশিয়ার চিঠি, কালের যাত্রা, পুনশ্চ, মানুষের ধর্ম, চণ্ডালিকা, তাসের দেশ, রিলিজন অভ্ ম্যান, গান্ধী-প্রসঙ্গে লিখিত একটি ইংরেজি ও তিনটি বাংলা ভাষণ (মহাত্মাজি অ্যাণ্ড দ্য ডিপ্রেস্‌ড্ হিউম্যানিটি), ভারত-পথিক রামমোহন রায়। এবং পরবর্তী রচনা—পত্রপুট, শ্যামলী, সাহিত্যের পথে, কালান্তর।

॥ তিন ॥

জাগরণ ও আত্মোপলব্ধির অর্থ যদি এই হয় যে, ক্ষুদ্রের ও সংকীর্ণের বন্ধন থেকে মুক্তি, তাহলে স্বীকার করতে হয় রবীন্দ্রনাথ চল্লিশ থেকে সত্তর—জীবনের এই তিরিশ বৎসর কেবলই ভেঙেছেন, নিজেকে বারবার অতিক্রম করেছেন, বৃহৎ থেকে বৃহত্তরে যাত্রা করেছেন। প্রথম যৌবনের জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেম, তারপর ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ, তারপর তপোবন ও আনন্দবাদ, ব্রাহ্মসমাজ-নির্দিষ্ট ব্রহ্মোপাসনা, জীবনে ও কর্মে ব্রহ্মোপলব্ধির সাধনা—সবই রবীন্দ্রনাথ অতিক্রম করেছেন, শেষ পর্যন্ত মানব-ঐক্যবোধে উপনীত হয়েছেন। সত্যের রূপ ও প্রেরণা বারবার পরিবর্তিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত বিশ্বমানবতায় পৌঁচেছে রবীন্দ্রনাথের এই শেষ ও সর্বোত্তম সত্যোপলব্ধি। 'মানুষের ধর্ম' এই সত্যোপলব্ধির পরিচয়স্থল। শেষদিকে গল্প-উপন্যাস-কবিতা ও ছবিতে রবীন্দ্রনাথ যেরকম দেশকালের গণ্ডী পেরিয়ে মননপন্থী ও অমূর্তবাদী হয়ে উঠেছিলেন, সমাজচিন্তা তথা মানবচিন্তার ক্ষেত্রেও সেরকম অগ্রসর হয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দে বাংলাদেশে নবজাগরণের ফলে বাঙালি বিশ্বপথে আত্মসন্ধানে বেরিয়েছিল। সে-সন্ধান সার্থকতা লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথে। তিনি বাঙালিকে বিশ্বপথিক-ধর্মে তথা মানবধর্মে পূর্ণদীক্ষা দিয়েছিলেন। ১৯৩০-৩৩ খ্রীস্টাব্দে রচিত সকল লেখায় রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম পূর্ণতা পেয়েছে।

তৃতীয়বার ইয়োরোপ ভ্রমণকালে লিখিত পত্রাবলী 'পথের সঞ্চয়'। 'বড়ো পৃথিবীর নিমন্ত্রণ' রক্ষার জন্যই কবি বারবার পৃথিবী পরিভ্রমণে বার হন, একথাটি 'যাত্রার পূর্বপত্রে' বলেছেন। ইয়োরোপ-যাত্রাকে তিনি বলেছেন তীর্থযাত্রা, সত্যের সন্ধানে যাত্রা।

"পরের দেশে না গেলে সত্যের মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করিবার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহা অভ্যস্ত তাহাকেই বড়ো সত্য বলিয়া মানা ও যাহা অনভ্যস্ত তাহাকেই তুচ্ছ বা মিথ্যা বলিয়া বর্জন করা, ইহাই দীনাত্মার লক্ষণ।...

য়ুরোপে গিয়া সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব, এই শ্রদ্ধাটি লইয়া যদি আমরা সেখানে যাত্রা করি তবে ভারতবাসীর পক্ষে এমন তীর্থ পৃথিবীতে কোথায় মিলিবে ?.........

একথা গোড়াতেই মনে রাখা দরকার, মানবসমাজে যেখানেই আমরা যে-কোনো মঙ্গল দেখি না কেন তাহার গোড়াতেই আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। অর্থাৎ, মানুষ কখনোই সত্যকে কল দিয়া পাইতে পারে না, তাহাকে আত্মা দিয়াই লাভ করিতে হয়। য়ুরোপে যদি আমরা মানুষের কোনো উন্নতি দেখি তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, সে উন্নতির মূলে মানুষের আত্মা আছে— কখনোই তাহা জড়ের সৃষ্টি নহে। বাহিরের বিকাশে আত্মারই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।............

য়ুরোপে দেখিতেছি, মানুষ নব নব পরীক্ষা ও নব নব পরিবর্তনের পথে চলিতেছে—আজ যাহাকে গ্রহণ করিতেছে কাল তাহাকে সে ত্যাগ করিতেছে। সে কোথাও চুপ করিয়া থাকিতেছে না ; অনেকে বলিয়া থাকেন ইহাতেই তাহার আধ্যাত্মিকতার অভাব প্রমাণ করে।

বিশ্বজগতেও আমরা কেবলই পরিবর্তন ও মৃত্যু দেখিতেছি। তবু কি এই বিশ্ব সম্বন্ধেই ঋষিরা বলেন নাই যে, আনন্দ হইতেই এই সমস্ত কিছু উৎপন্ন হইতেছে ? অমৃতই কি আপনাকে মৃত্যু উৎসের ভিতর দিয়া নিরন্তর উৎসারিত করিতেছে না ?

বাহিরকেই চরম করিয়া দেখিলে ভিতরকে দেখা হয় না এবং বাহিরকেও সত্যরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়। য়ুরোপেরও একটা ভিতর আছে তাহার একটা আত্মা, এবং সে আত্মা দুর্বল নহে।

য়ুরোপের সেই আধ্যাত্মিকতাকে যখন দেখিব তখনই তাহার সত্যকে দেখিতে পাইব—তখনই এমন একটি পদার্থকে জানিতে পারিব যাহাকে আত্মার মধ্যে গ্রহণ করা যায়, যাহা কেবল বস্তু নহে, যাহা কেবল বিদ্যা নহে, যাহা আনন্দ।" (যাত্রার পূর্বপত্র, আষাঢ়, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, পথের সঞ্চয়)

য়ুরোপের আত্মত্যাগের সংকল্প ও প্রবৃত্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ধর্মবল ও আধ্যাত্মিকতা লক্ষ্য করেছেন, আমাদের সমাজজীবনে তার শোচনীয় অনুপস্থিতি দেখে দুঃখ পেয়েছেন।

আত্মত্যাগের ব্যাকুলতা ও সংকল্প আমাদের দেশে কম, স্বার্থপরতা ও আচারগত সংকীর্ণতা বড় বেশি,—এটি লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ পীড়িত হয়েছেন। তাই বলে কি আমাদের দেশে আধ্যাত্মিকতা নেই ?

"এখানেও অধ্যাত্মিকতার একটা দিক প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের দেশের যাঁহারা সাধক তাঁহারা কেহ বা জ্ঞানে, কেহ বা ভক্তিতে অখণ্ডস্বরূপকে সমস্ত খণ্ডপদার্থের মধ্যে সহজেই স্বীকার করতে পারেন। এইখানে জ্ঞানের দিকে এবং ভাবের দিকে, অনেক কালের চিন্তায় এবং সাধনায়, তাঁহাদের বাধা অনেক পরিমাণে ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে। এইজন্য আমাদের দেশের যাঁহারা সাধুপুরুষ তাঁহারা চিৎলোকে বা হৃদয়ধামে অনন্তের সঙ্গে সহজে যোগ উপলব্ধি করিতে পারেন।" (তদেব)

রবীন্দ্রনাথের বারবার ভ্রমণের তাৎপর্যটি এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতবাসীর ইয়োরোপযাত্রা তীর্থযাত্রা বলেই তিনি বিশ্বাস করেন। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চম ও শেষবার ইয়োরোপ ভ্রমণের পরে লিখিত 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে তাঁর বিশ্ববোধ ও মানবমৈত্রী পূর্ণতা লাভ করেছে কেন, তা এখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে আমার ধারণা।

তার সূচনা তৃতীয়বার ইয়োরোপভ্রমণে। তার স্পষ্ট ইঙ্গিত 'পথের সঞ্চয়ে'—'যাত্রার পূর্বপত্রে' সেকথা রবীন্দ্রনাথ খোলাখুলি বলেছেন।

"আজ পৃথিবীকে ইয়োরোপ শাসন করিতেছে বস্তুর জোরে, ইহা অবিশ্বাসী নাস্তিকের কথা। তাহার শাসনের মূল শক্তি নিঃসন্দেহই ধর্মের জোর, তাহা ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না।......

য়ুরোপের যে শক্তি, তাহার বাহ্যরূপ যাহাই হউক না কেন, তাহার আন্তররূপ যে ধর্মবল সে সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহমাত্র নাই।" (তদেব)

য়ুরোপের এই ধর্মবল প্রকাশ পেয়েছে তার আত্মত্যাগের সংকল্পে ও প্রবৃত্তিতে, দুর্জয়কে জয়ের নেশায়, দুঃখ ও বিপদবরণের সাহসিকতায়, জ্ঞানের অন্বেষণে, দুর্গতি মোচনের সাধনায়, ব্যক্তির মুক্তিতে—একথা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বাসের ন্যায়সঙ্গত পরিণতি লক্ষ্য করি 'মানুষের ধর্মে'—সেখানে বিচিত্রের বন্দনা, সর্বজনীন সর্বকালীন মানবের বন্দনা। 'পুনশ্চ' কাব্যে তারই জয়গান শুনি—'জয় হোক মানুষের'। শিশুতীর্থ কবিতায় এই সত্যোপলব্ধি কাব্যরূপ পেয়েছে।

"তীর্থযাত্রার মানস করিয়াই যদি য়ুরোপ যাইতে হয় তবে তাহা নিষ্ফল হইবে না। সেখানেও আমাদের গুরু আছেন; সে গুরু সেখানকার মানবসমাজের অন্তরতম দিব্যশক্তি।......যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্—এ কথাটি য়ুরোপেরও অন্তরের কথা। য়ুরোপও নিশ্চয়ই জানে, রেলে টেলিগ্রাফে কলে-কারখানায় সে বড়ো নহে। এইজন্যই য়ুরোপও বীরের ন্যায় সত্যব্রত গ্রহণ করিয়াছে; বীরের ন্যায় সত্যের জন্য ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিতেছে, এবং যতই ভুল করিতেছে, যতই ব্যর্থ হইতেছে, ততই দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত নূতন করিয়া উদ্যোগ আরম্ভ করিতেছে—কিছুতেই হাল ছাড়িয়া দিতেছে না।...সত্যের দায়িত্বকে বীরের ন্যায় সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিবার দীক্ষা, সেই সত্যের প্রতি অবিচলিত প্রাণান্তিক নিষ্ঠা, জীবনের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদকে প্রাণপণ দুঃখের মূল্য দিয়া অর্জন করিবার সাধনা, এবং বুদ্ধি হৃদয় ও কর্মে সকল দিক দিয়া মানুষের কল্যাণসাধন ও মানুষের প্রতি শ্রাদ্ধাদ্বারা ভগবানের দুঃসাধ্য সেবাব্রত গ্রহণ করিবার জন্য তীর্থযাত্রীর পক্ষে য়ুরোপ যাত্রা কখনোই নিষ্ফল হইতে পারে না। অবশ্য, যদি তাহার মনে শ্রদ্ধা থাকে এবং সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতাকেই যদি সে আধ্যাত্মিক সাফল্যের সত্য পরিচয় বলিয়া বিশ্বাস করে।" (যাত্রার পূর্বপত্র, পথের সঞ্চয়)

রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের যথার্থ ভূমিকা।

॥ চার

অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হিবার্ট-বক্তৃতায় ('রিলিজন অভ্ ম্যান') মধ্যযুগের ভারতীয় সন্ত ও বাংলার বাউলদের মানবসাধনা তথা আত্মান্বেষণ-কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ মানবিক ঐক্যানুভূতির তত্ত্বকে আপন জীবনের প্রেক্ষিতে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। 'সুপ্রীম্ পার্সন' বা মহামানবকে তিনি মানব-সংসারেই পেতে চেয়েছিলেন। যুক্তি ও বিজ্ঞানসত্যের আলোকে তিনি মানবধর্মের বিশুদ্ধ রূপটিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 'মানুষের ধর্ম' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত কমলা-বক্তৃতা) ও 'পুনশ্চ' কাব্যে এই বক্তব্যেরই প্রতিষ্ঠা, রজ্জব, কবীর, দাদূ, রামানন্দ, নাভা, রবিদাস, নানক ও বাংলার বাউলদের জীবনসাধনাকে তিনি 'পুনশ্চে' কাব্যরূপ দিয়েছেন, সেই সঙ্গে অন্ত্যজদের মধ্যে মানবধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ধিক্কার দিয়েছেন ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বাভিমান ও অন্ধতাকে, সমালোচনা করেছেন সংকীর্ণতা ও আচারানুগত্যকে। 'কালের যাত্রা'র অন্তর্গত 'রথের রশি' নাটিকায় শূদ্রদের কবি যে সম্মান দিয়েছেন, তা থেকে মনে হয় তিনি মানবদেবতাকে শূদ্রের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হার মানার পর শূদ্র হাত লাগাতেই রথ চলতে লাগল। এই সংকেত-কাহিনীতে মানবধর্মের জয় ঘোষণা করা হয়েছে। আর 'মানবপুত্র', ও 'শিশুতীর্থ' কবিতা দুটিতে বৃহৎ মানবমহিমাকে কাব্যরূপ দেওয়া হয়েছে।

মানবসত্যের সঙ্গে সংসারের সত্যের বিরোধ বাধে, এই বিরোধে মানবসত্যের পক্ষাবলম্বন যে করে, তারই জীবন সার্থক, একথা 'মানুষের ধর্মে' রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছেন। তাঁর কথায়—

"রজ্জব বলেছেন—

সব সাঁচ মিলৈ সো   চ হৈ, না মিলৈ সো ঝুঁঠ।

জন রজ্জব সাঁচী কহী ভাবই রিঝি ভাবই রূঠ॥

সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তা'ই সত্য, যা মিলল না তা মিথ্যে; রজ্জব বলেছেন, এই কথাই খাঁটি—এতে তুমি খুশিই হও আর রাগই কর।

ভাষা থেকে বোঝা যাচ্ছে, রজ্জব বুঝেছেন, একথায় রাগ করবার লোকই সমাজে বিস্তর। তাদের মত ও প্রথার সঙ্গে বিশ্বসত্যের মিল হচ্ছে না, তবু তারা তাকে সত্য নাম দিয়ে জটিলতায় জড়িয়ে থাকে—মিল নেই বলেই

এই নিয়ে তাদের উত্তেজনা উগ্রতা এত বেশি। রাগারাগির দ্বারা সত্যের প্রতিবাদ, অগ্নিশিখাকে ছুরি দিয়ে বেঁধবার চেষ্টার মতো। সেই ছুরি সত্যকে মারতে পারে না, মারে মানুষকে। সেই বিভীষিকার সামনে দাঁড়িয়েই বলতে হবে—

সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ, না মিলৈ সো ঝুঁঠ।"

সর্বজনীন মানবতাবোধের পরমতীর্থে উপনীত হওয়াই আজকের মানুষের সাধনা : রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনের এ-ই পরম সত্যোপলব্ধি। এই সত্যকে তিনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন 'মানুষের ধর্ম' ভাষণমালার ভূমিকায়—

"আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট', তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবনসীমা অতিক্রম ক'রে মানব-সীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানুষের উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় ও অনেক স্থলে বিকৃত বলেই সব মানুষ আজও মানুষ হয়নি। কিন্তু তাঁর আকর্ষণ নিয়ত মানুষের অন্তর থেকে কাজ করছে বলেই আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না। সেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাকেই বলেছে, 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা'।" (১৮ মাঘ, ১৩৩৯)

এই সর্বকালীন মানবকে রবীন্দ্রনাথ ধর্মগ্রন্থে বা আচারানুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ করেন নি, অন্ত্যজ মানুষের হৃদয়ের অমেয় ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। মানবমহিমার বন্দনা করেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হননি, মানবাত্মার সর্বশেষ মন্ত্রটিও উচ্চারণ করেছেন :

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হ'ল;
দেবলোক থেকে
মানবলোকে
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষ
আর মনের মানুষ আমার অন্তরতম আনন্দে। (পত্রপুট)

'মানুষের ধর্ম' তিনটি ভাষণের সংকলন। এই ভাষণমালার প্রধান গুণ, চিন্তার মুক্তি—তার স্বচ্ছতা, নিরাবিলতা, প্রাখর্য। বেদ উপনিষদ থেকে প্রাপ্ত সত্যকে রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের মর্মসত্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন। মানুষের জীবনের সার্থকতা কোথায়? এই অন্বেষণের শেষে রবীন্দ্রনাথ মানুষের অন্তরে প্রত্যাবর্তনকে পরমাপ্রাপ্তি বলে উপলব্ধি করেছেন :

"আপনারই পরমকে না দেখে মানুষ বাইরের দিকে সার্থকতা খুঁজে বেড়ায়। শেষকালে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত হয়ে সে বলে : কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ; জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই—অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাই নে। মানুষের যতকিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে। আপনাকে তখন টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না। সেই বাহিরে বিক্ষিপ্ত আপনা-হারা মানুষের বিলাপগান একদিন শুনেছিলেম পথিক ভিখারির মুখে—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

সেই নিরক্ষর গাঁয়ের লোকের মুখেই শুনেছিলেম—

তোরই ভিতর অতল সাগর।

সেই পাগলই গেয়েছিল—

মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।

সেই অন্বেষণেরই প্রার্থনা বেদে আছে : আবিরাবীর্ম এধি। পরম মানবের বিরাটরূপে যাঁর স্বতঃপ্রকাশ আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক।" (মানুষের ধর্ম)

॥ পাঁচ ॥

রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম জীবনবিচ্ছিন্ন সত্য নয়, কাব্যবিচ্ছিন্ন উপলব্ধি নয়। তিনি যে বিশ্বদেবতাকে জেনেছেন, তার কথা 'মানবসত্য' ('মানুষের ধর্ম'এর সংযোজন) রচনায় বলেছেন :

"বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্রতারায়। জীবন-দেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসান, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মানুষ। এই মনের মানুষ, এই সর্বমানুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি Religion of Man বক্তৃতাগুলিতে। সেগুলিকে দর্শনের কোঠায় ফেললে ভুল হবে। তাকে মতবাদের একটা আকার দিতে হয়েছে, কিন্তু বস্তুত সে কবিচিত্তের একটা অভিজ্ঞতা। এই আন্তরিক অভিজ্ঞতা অনেক কাল থেকে ভিতরে ভিতরে আমার মধ্যে প্রবাহিত ; তাকে আমার ব্যক্তিগত চিত্তপ্রকৃতির একটা বিশেষত্ব বললে তাই আমাকে মেনে নিতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথের এই 'মনের মানুষ', 'পরম মানব' ; 'সর্বজনীন সর্বকালীন মানব', 'সুপ্রীম পার্সন', 'সর্বমানুষের জীবনদেবতা'—এঁকে তিনি কোথায় পেয়েছেন ? অমানবে ? অতিমানবে ? জীবনবর্জিত সংসারবর্জিত ক্ষেত্রে ?

এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 'মানবসত্য' রচনার উনশেষ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করেই বলেছেন :

"আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে—তিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেননা, আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, তা মানবচিত্ত কখনোই ছাড়াতে পারে না। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে, এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা কিন্তু মানবিক ভূমা। তাঁর বাইরে অন্যকিছু থাকা না-থাকা মানুষের পক্ষে সমান। বিলুপ্ত করে যদি মানুষের

মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন।"

রবীন্দ্রনাথের এই মানবপ্রীতি তাঁর জীবনের শেষ উপলব্ধি। এই মানবানুগত উপলব্ধির পটভূমে 'মানুষের ধর্ম' ভাষণমালা বিচার্য। আধুনিক পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজিজ্ঞাসার শেষ পর্বে মানুষকে অস্বীকার করেন নি, মানুষকেই জীবনের সকল সাধনার লক্ষ্যস্থল বলে স্বীকার করেছেন। এখানেই আধুনিক কাল ও বিশ্বমানবের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

কামরূপী উপভাষা, বাংলা গদ্যভাষা

ভাষাবিজ্ঞানীরা বাংলাদেশের উত্তর-উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপভাষাকে (ডায়ালেকট) 'কামরূপী' নামে চিহ্নিত করেছেন। আর সেখানেই তাঁদের জিজ্ঞাসার ক্ষান্তি। 'কামরূপী' উপভাষাও যে বাংলা ভাষা, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে তার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, আধুনিক বাংলা গদ্যভাষা নির্মাণে তার যে অবশ্যস্বীকার্য ভূমিকা আছে, সে বিষয়ে আমরা বিশেষ অবহিত নই। হয়তো 'কামরূপী' উপভাষা সাহিত্যিক কৌলীন্য পায়নি বলেই আমাদের এই অবহেলা। (প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, ঔপন্যাসিক শ্রীঅমিয়ভূষণ মজুমদারের একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস 'দুখিয়ার কুঠি' আগাগোড়া এই ভাষায় লিখিত।)

কামরূপী উপভাষাকে আমারা অবজ্ঞা করে বলি বাহে ভাষা। কোচবিহার, রংপুর, জলপাইগুড়ি অঞ্চলকে বলা হয় বাহে দেশ এবং সেখানকার ডায়ালেকট বাহে ভাষা। 'বাহে' কি অবজ্ঞাসূচক সম্বোধন, না, মর্যাদাসূচক সম্বোধন, তা আমরা ভেবে দেখি না। রংপুর থেকে শুরু করে নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে সম্মানিতকে 'বাহে' বা 'বা-জে' বলা হয়। 'বাহে' অর্থাৎ 'বাবা-হে', তা থেকেই 'বা-জে'। যারা বাহেভাষা বলে তারা বাঙালি কিনা আর সে ভাষা বাংলার কথ্যরূপ কিনা, বাংলা গদ্যভাষার কাঠামোয় তার ভূমিকা এসব প্রশ্নের নিরাসক্ত বিচার বিশেষ হয় নি।

'বাংলাদেশ' বলতে কি বোঝায়? কারা-ই বা বাঙালি? যে দেশে বাঙালি বাস করে তা'ই বাংলাদেশ? অথবা যারা বাংলাদেশে বাস করে তারা বাঙালি? বীরভূম (সেকালের ও একালের), সেকালের গৌড় (বর্তমান মালদহ যার অন্তর্ভুক্ত), চট্টগ্রাম (সেকালের ও একালের) বাংলাদেশ কি? কামরূপ বা কামতা কি বাংলাদেশ? ধুবড়ি-সমেত গোয়ালপাড়া জেলা কি বাংলাদেশ (গত শতকেও তা রংপুর জেলার অঙ্গহিসাবে বাংলাদেশেরই অঙ্গ ছিল)?

বাহেভাষা বা কামরূপী উপভাষা কোথায় প্রচলিত ছিল? কখন?

কামতা রাজ্য
ষোড়শ শতাব্দী
০ ৪০ মাইল
রাজ্যের সীমানা
অনিরূপিত সীমানা
নেপাল
তিব্বত দেশ
ব্রহ্মদেশ
কাঞ্চনজঙ্ঘা
ফারিজং
গ্যাংটক
দার্জিলিং
বৈকুণ্ঠপুর
জলপাইগুড়ি
পুর্ণিয়া
মনিহারি
গঙ্গা নং
রাজমহল
গৌড়
পাণ্ডুয়া
মালদহ
বরেন্দ্র
বগুড়া
রাজসাহী
নাটোর
পদ্মা নং
কলিকাতা
রঙ্গপুর
কামতাপুর
কোচবিহার
বাসাট
বিশ্বসিংহ কিল্লা
বিক্রমনারায়ণগড়
বিজনি
সিদনি
খুটাঘাট
হাজো
ধুবড়ি
তুরা
কড়াইবাড়ী
মধুপুর
শ্রীপুর
ঢাকা
সুবর্ণগ্রাম
আগরতলা
কোমিল্লা
চান্দপুর
চট্টগ্রাম
ত্রিপুরা
তোয়াঙ্গ
ভেজপুর
নওগাঁও
ব্রহ্মপুত্র নদ
শিলং
দিমাপুর
কোহিমা
মাইবং
খাসপুর
কাছাড়
ইম্ফোল
মণিপুর
জিলামবাজার
রামকৃষ্ণনগর
ধর্মনগর
জোড়হাট
শিবসাগর
গড়গাঁও
ডিব্রুগড়
নামরূপ
দিহিং নং
মাজুলী দ্বীপ
লোহিত নং
ব্রহ্মকুণ্ড
সদিয়া
মিশমী
আবোর
দফলা
মিরি
নাগা
অর্ধেন্দু দত্ত

কামরূপ কোথায়? কামৃতা-ই বা কোথায়? বেহার বা কোচবিহার আর কামৃতা কি এক? মহারাজ নরনারায়ণের দিগ্‌বিজয়ের ফলে প্রসারিত কামৃতা রাজ্যের (মানচিত্র দেখুন) সীমা কি?

'কামরূপ' কোথায়? পুরাণাদি মতে তার এক ভৌগোলিক সীমা আছে। একটি বিরাট ত্রিভুজ কল্পনা করা যেতে পারে যার এক বাহু সাদিয়া থেকে ত্রিহুত পর্যন্ত হিমালয়ের পাদদেশ, দ্বিতীয় বাহু করতোয়া নদী, তৃতীয় বাহু চলনবিলের কাছ থেকে উঠে ময়মনসিং, শ্রীহট্ট, কাছাড় ঘিরে মণিপুরকে বাইরে ফেলে সাদিয়ায় গিয়ে ঠেকেছে। এই কামরূপ পুরাণের কামরূপ।

পাল ও সেন বংশের আমলের কামরূপ পুরাণের কামরূপের মতো বিশাল নয়। তখনকার উত্তরবঙ্গকে করতোয়া নদী লম্বালম্বি প্রায় দুভাগে ভাগ করতো, সুতরাং এই কামরূপে উত্তরবাংলার পূর্বের আধখানা ছিল, অন্যদিকে যাকে নিয়ে কামরূপ-কামৃতা নাম সেই কামরূপী কামদা। কামাখ্যার পীঠ এই কামরূপে থাকাই স্বাভাবিক। এই ছোট কামরূপের বিস্তার (মানচিত্র দেখুন)—ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার নীচু সমতল ভূমি এবং গোয়ালপাড়া, রংপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা।

পাল রাজাদের রাজধানী কোথায় ছিল? করতোয়ার পশ্চিম পারে? তাঁদের রাজ্যের বিস্তার কি করতোয়ার উভয় পারেই ছিল না? করতোয়ার পশ্চিম পারে কি ভাষা ছিল? মাগধী প্রাকৃত বা অবহট্‌ঠ? তা-ই যদি হয় তবে করতোয়ার পূর্ব পারে কি সেই ভাষাই ছিল না? উত্তরবঙ্গে, গোয়াল-পাড়া, গুয়াহাটি, দরং, বিজনিতে একই ভাষার ব্যবহার ছিল না কি? করতোয়া-ঘেঁষা কামরূপী ভাষা করতোয়ার পশ্চিম পারে ভাষা থেকে অভিন্ন থাকা স্বাভাবিক।

বৌদ্ধ চর্যা গান ও দোহার পর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে 'অন্ধকার যুগ'-এর কথা ভাষাবিজ্ঞানী ও সাহিত্য-ইতিহাস-রচয়িতারা বলে আসছেন। কিন্তু 'মিসিং লিঙ্ক' কি তাঁরা খুঁজেছেন? বৌদ্ধ গান ও দোহা পাল রাজত্বকালে রচিত, এ সিদ্ধান্ত সর্বস্বীকৃত। প্রশ্ন এই, কোথায় রচিত হয়েছিল চর্যাগান? সমতট বা পূর্ববঙ্গে রচিত পুঁথি বগলদাবা করে মুসলিম আক্রমণে সন্ত্রস্ত বৌদ্ধ পণ্ডিতরা নেপালে দৌড়েছিলেন, আর সেখানে পৌঁছবার পরই গান গাইতে শুরু করলেন, এ অনুমান কতদূর সঙ্গত? বৌদ্ধ চর্যা গান ও দোহার প্রাপ্তিস্থান নেপাল। যদি অনুমান করি, এগুলির রচনাস্থল প্রাপ্তিস্থানের

কাছাকাছি, তা হলে কি অন্যায় হবে? নেপালের যত্ত কাছে উত্তরবঙ্গ, কামরূপ, প্রাঙ্‌মগধ, তত কাছে নয় রাঢ় (পশ্চিমবঙ্গ) ও সুমতট (পূর্ববঙ্গ)। কামরূপী উপভাষা-ই বাংলা ভাষার সেই 'মিসিং লিঙ্ক', যা আমরা আজো খুঁজে পাই নি : এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কিনা দেখা যাক।

কোচবিহার রাজবংশ কামরূপী উপভাষা বা বাহেভাষার পৃষ্ঠপোষক। এই রাজবংশের ইতিহাস ও বংশের রত্ন মহারাজ নরনারায়ণের (সিংহাসনারোহণ ১৫৫৫ খ্রীঃ মৃত্যু ১৫৮৭ খ্রীঃ) গৌরবময় রাজত্বকালের কথা আমরা অল্পই জানি, কিন্তু বাংলা গদ্যভাষার 'মিসিং লিঙ্ক' খুঁজতে হলে এই বংশের কথা জানতেই হয়। *

মহারাজ নরনারায়ণ সম্পর্কে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছেন :

"বিশ্বসিংহের পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নরনারায়ণ রাজা হইলেন। মল্লবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন বলিয়া তিনি মল্লনারায়ণ নামেও পরিচিত। তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজ অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। তাঁহার পরাক্রমে উত্তরবঙ্গ হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত কুচবিহারের প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল। [মানচিত্র দেখুন] আহোম রাজ সুখাম্পা তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। কাছাড়, মণিপুর, ত্রিপুরা ও জৈন্তিয়ার রাজগণ কুচবিহারের রাজাকে কর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই শুক্লধ্বজই দরঙ্গের রাজা বিষ্ণুনারায়ণের পত্রে উল্লিখিত 'ছিলা রায়'। চিলের মত ক্ষিপ্র গতিতে ও অতর্কিতে শত্রুসেনার উপর আপতিত হইতেন বলিয়া তিনি 'চিলা রায়' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। দরঙ্গ, বিজনি ও বেলতলার রাজগণ শুক্লধ্বজের সন্তান।

ভ্রাতার বাহুবলে যেমন নানারায়ণের রাজ্য লাভ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তেমনই তাঁহার আশ্রিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ ও রাম সরস্বতীর পাণ্ডিত্যে সেই রাজ্যের খ্যাতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আর এই রাজ্যের সমৃদ্ধির প্রমাণ স্বরূপ নরনারায়ণের প্রবর্তিত নারায়ণী টাকা বহুদিন পর্যন্ত দেশ-বিদেশে প্রচলিত ছিল। উত্তরবঙ্গ, আসাম, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যের ত কথাই নাই, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিব্বত ও ভুটানের বাজারেও কুচবিহারের নারায়ণী টাকার আদান-প্রদান হইত। খৃষ্টীয় ১৮০০ সালে সার্বভৌম ব্রিটিশ শক্তির নির্দেশে পরাধীন কুচবিহারের টাকশাল বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু তাহার

---

* বর্তমান লেখকের 'সাহিত্য-বাতায়ন' গ্রন্থের (১৯৭০) 'প্রাচীন কোচবিহার : ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

পরও প্রায় চল্লিশ বৎসর কুচবিহারে এই টাকার প্রচলন ছিল।" [প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন, ১৯৪২, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভূমিকা, পৃষ্ঠাঙ্ক ২-৩]

স্বাধীন কোচবিহার রাজ্যের ঐতিহাসিক কাল শুরু হয়েছে মোটামুটি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের গোড়া থেকে। এই সময় কোচরাজা বিশ্ব সিংহ (১৫২২-১৫৫৪) সুবা বাংলার গৌড়ের কাছাকাছি অঞ্চলগুলি জয় করেছেন এবং উত্তরের ভূটানরাজ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছেন। আকবারনামা, বাহার-ই-স্তান ঘায়েবী ও তারিখ-ই আসামের উপর নির্ভর করে বলা যায়, বিশ্বসিংহের দুই পুত্র মহারাজ নরনারায়ণ (১৫৫৫-১৫৮৭) ও রাজকুমার-সেনাপতি শুক্লধ্বজ রায় জয়ের ঐতিহ্য বহন করেছিলেন। কোচবিহারের সমৃদ্ধি এই কালেই ঘটে। মহারাজ প্রাণনারায়ণের আমলে (১৬২৫-১৬৬৫) মীরজুমলা কোচবিহার আক্রমণ করেন (১৬৬১)। পথিমধ্যে মীরজুমলার অপ্রত্যাশিত মৃত্যু কোচবিহারকে পরাজয়ের কলঙ্ক থেকে সাময়িক অব্যাহতি দিলেও পরবর্তী এক শ বছর আত্মক্ষয়ী লড়াইয়ের ইতিহাস। রাজ-অমাত্য রায়কত ও সৈন্যাধ্যক্ষ নাজিরদেও প্রভুত্বলোলুপ। রাজ্য ভেঙে পড়ার মুখে। নাজির-দেও-এর সহায়তায় ভুটানের দেবরাজা মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণকে বন্দী করে নিয়ে গেলেন ভুটানে (১৭৭০)। রাজপরিবার দেওয়ান-দেওয়ের পরামর্শে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থনা করল। কোম্পানী এই সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কোম্পানীর চুক্তি হল (১৭৭৩)। চুক্তির ফলে স্বাধীন কোচবিহার হল করদ-মিত্র রাজ্য। রাজ্যরক্ষার নামে কোম্পানীর এজেণ্ট কমিশনার কোচবিহারের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ শুরু করল। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন পরবর্তী অর্ধ-শতাব্দীকে (১৭৭২-১৮২০) বলেছেন বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তের মাৎস্যন্যায়-পর্ব, বিশৃঙ্খলার পর্ব।

ডক্টর সেন এই পর্বের গদ্যচর্চা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"সেই বিশৃঙ্খল যুগের কথা আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। সেই যুগেই বাঙ্গালা গদ্যের শৈশবকাল আরম্ভ হইয়াছিল। বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের তখন সৃষ্টি হয় নাই বলিলেও অন্যায় হয় না। কিন্তু তথাপি ভূটান, কুচবিহার, আসাম, মণিপুর ও কাছাড়ের নরপতিগণ এই ভাষায়ই পরস্পরের সহিত এবং ইংরাজ সরকারের সহিত পত্রালাপ করিতেন। বাঙ্গালাই যে তখন পূর্বোত্তর ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল আমাদের সঙ্কলিত পত্রগুলি পাঠ করিলে

তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। বাঙ্গালার সেই শৈশবরূপের সঙ্গে বর্তমান রূপের হয়ত অনেক পার্থক্য দেখা যাইবে। তখনও এই প্রাকৃত ভাষা পারশীর প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই।......বাঙ্গালা ভাষা তাঁহার অসহায় শৈশবেই সমগ্র পূর্ব-ভারতে আপনার প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিল। তখনও কোন গদ্যসাহিত্যরথীর আবির্ভাব হয় নাই, বাঙ্গালার কাব্য তখনও বিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই, বিজিত বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্য বিদেশী রাজার আনুকূল্য লাভ করে নাই, তথাপি কুচবিহার ও মণিপুর, আসাম ও কাছাড়, উড়িষ্যা ও ভুটানে এই ভাষা কেবল স্বমহিমায় পরিচালিত হইত। ভুটানের দেবরাজা বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞ মুন্সী রাখিতেন (এই কর্মচারীকে কায়েতী বলা হইত)। ইংরেজ কর্মচারীরাও সাধারণতঃ দেশের লোকের সহিত বঙ্গভাষায় পত্রালাপ করিতেন।" (তদেব পৃ, ৮৪-৮৫)

সুখের বিষয়, খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতকে কোচবিহার রাজদরবারে ব্যবহৃত গদ্যভাষার নিদর্শন আমাদের হাতে এসেছে। কোচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণ ও আহোমরাজ চুকুম্‌ফার দুখানি পত্র বাংলা গদ্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শনরূপে শতাব্দীর সিঁড়ি বেয়ে একালে পৌঁচেছে। পত্র দুখানি কোচবিহার রাজদরবার-প্রকাশিত ও খান চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ-রচিত "কোচবিহারের ইতিহাস" (১ম খণ্ড। রাজ শক ৪২৬। খ্রীস্টাব্দ ১৯৩৬) গ্রন্থে সংকলিত (পৃষ্ঠা ১০৪, ১০৫)। পত্রদুটি থেকে দেখা যায় করতোয়া-ঘেরা কামতা ভাষা, যা প্রাচীন বাংলা গদ্যভাষাও বটে, অহোম রাজদরবারের ব্যবহারিক ভাষা ছিল। পত্র দুটির রচনাকাল ১৫৫৫-৫৬ খ্রীস্টাব্দ। তখন কামরূপী উপভাষা কোথায় ছিল? আজকের কামরূপী উপভাষার সঙ্গে তার যোগ কোথায়? পাল রাজাদের আমলে করতোয়ার পশ্চিম পারের ভাষা যদি বাংলা থেকে থাকে, করতোয়ার পূর্বপারের ভাষা, যা ১৫৫৫-৫৬ খ্রীস্টাব্দেও প্রাচীন বাংলা গদ্যভাষা, তা পালরাজাদের পর থেকে ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কোন ভাষা ছিল? এই 'মিসিং লিঙ্ক'টাই কামতায়, অহোম-রাজ্যে খুঁজতে হবে এবং একালের বাহেভাষার (কামরূপী উপভাষা) সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ণয় করতে হবে। এই ভাষাকে করতোয়ার পশ্চিমে বাংলা এবং পূর্বে কামরূপী উপভাষা বললেও বলা যায়, তাতে ভাষাটা বদলায় না: এ সত্য এখানে অবশ্যস্বীকার্য।

মহারাজ নরনারায়ণের পত্র, এই পত্রপাঠে কুদ্ধ বড় গোহাঞির (বড়

গোসাঁই) প্রতিক্রিয়া, আহোমরাজ চুকুম্‌ফা স্বর্গনারায়ণের উত্তর : এই তিনটি পত্রের মূল ও একালের বাংলাগদ্যে তার রূপান্তর প্রথমে উপস্থিত করি। তারপর দেখা যাবে আধুনিক কামরূপী উপভাষার সঙ্গে পত্র-নিবন্ধ গদ্যভাষার যোগ কতদূর।

বিহার অর্থাৎ কোচবিহার (খুব সম্ভবত রাজধানী গোসানীমারী) থেকে প্রেরিত মহারাজ নরনারায়ণের পত্রের তারিখ আষাঢ়, ১৪৭৭ শক (১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দ)। পত্রের অবিকল প্রতিরূপ [কোচবিহারের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাংক ১০৪] :

"স্বস্তি সকল দিগ্‌দন্তিকর্ণতালাস্ফালসমীরণ প্রচলিত হিমকরহরহারস্থা-সকাশ-কৈলাসপাণ্ডুরযশোরাশি বিরাজিতত্রিপিষ্ট পত্রিদশতরঙ্গিণীসলিলনির্ম্মল-পবিত্রকলেবরধীষণ ধীর ধৈর্য্য মর্য্যাদাপারাবার সকল দিক্কাসিণীগীয় মানগুণ-সন্তান-শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণ মহারাজ প্রচণ্ডপ্রতাপেষু।

লেখনং কার্য্যঞ্চ (।) এথা[১] আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে[২] বাঞ্ছা[৩] করি (।) অখন[৪] তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক[৫] পত্রাপত্রি[৬] গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে[৭] (।) তোমার আমার কর্ত্তব্যে[৮] সে[৯] বর্দ্ধিতাক[১০] পাই[১১] পুষ্পিত ফলিত হইবেক (।) আমরা সেই উদ্যোগতে[১২] আছি (।) তোমারো[১৩] এ গোট[১৪] কর্তব্য[১৫] উচিত হয় (।) না কর[১৬] তাক[১৭] আপনে[১৮] জান। অধিক কি লেখিম্[১৯] (।) সতানন্দ কর্ম্মী (,) রামেশ্বর শর্ম্মা (,) কালকেতু ও ধুমাসদ্দার (,) উত্তণ্ড চাউনিয়া (,) শ্যামরাই ইম্‌রাক[২০] পাঠাইতেছি (।) তামরার[২১] মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ[২২] বিদায় দিবা (।) অপর[২৩] (,) উকীল সঙ্গে ঘুড়ি[২৪]২ ধনু ১ চেঙ্গা মৎস্য[২৫] ১ জোর[২৬] (,) বালিচ[২৭] ১ জকাই[২৮]১ সারি[২৯]৫ খান এই সকল দিয়া[৩০] গইছে[৩১]। আরু[৩২] সমাচার বুজি[৩৩] কহি[৩৪] পাঠাইবেক[৩৫]। তোমার অর্থে[৩৬] সন্দেশ গোমচেং ১ ছিট ৫ ঘাগরি ১০ কৃষ্ণচামর ২০ শুক্লচামর ১০। ইতি শঁক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়।"

পত্রপাঠে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুর অনুধাবন করা যায়। পরাজিত আহোমরাজ স্বর্গনারায়ণ ওরফে চুকুম্‌ফা-সমীপে প্রেরিত এই পত্রে বিজয়ী মহারাজ নরনারায়ণ সন্ধিশর্তাদির উল্লেখ করেছেন ও রাজকীয় নির্দেশ জারী করেছেন। সেই সঙ্গে ইচ্ছাপূর্বক তুচ্ছ ভেট পাঠিয়েছেন।

১ এথায়=অত্র

২ নিরন্তর

৩ বাঞ্ছা

৪ এখন

৫ সম্পাদনকারী, বিধানকারী

৬ চিঠিপত্র

৭ থাকে

৮ কাজে, ৭মী বিভক্তি

৯ ইহা

১০ বৃদ্ধি (কে) ২য়া বিভক্তি

১১ পাইয়া

১২ উদ্যোগে, ৭মী বিভক্তি

১৩ তোমারও

১৪ ই গোট=এইটি, গোটেক, গুটেক

১৫ কাজ

১৬ না কর=করবে কি না

১৭ তাহা, তা'

১৮ আপনি (কর্তায় ৭মী)

১৯ লিখিব। তুং—লেখিবোঁ (কৃষ্ণকীর্তন)

২০ ইহাদিগকে, ইহাদেরকে। ইম্‌রা =ইহারা, এরা। ২য়া বিভক্তিতে ইম্‌রাক (বহুবচন)

২১ তাম্‌রা=তারা, তাহারা। তামরার (৬ষ্ঠী বিভক্তি, বহুবচন)

২২ চিত্ততাপ

২৩ Further, আরও

২৪ ঘোড়া, স্ত্রীলিঙ্গ (mare)

২৫ চ্যাংমাছ, শাটিমাছ

২৬ জোড়া

২৭ বালিশ

২৮ মাছধরা বাঁশের খাঁচা=জকাই, জাকাই

২৯ শাড়ি

৩০ দেয়া, দেওয়া

৩১ যাচ্ছে

৩২ আর

৩৩ বুঝিয়া, বিচার করিয়া

৩৪ বলে', কহিয়া

৩৫ পাঠাবে

৩৬ জন্মে

মহারাজ নরনারায়ণ-প্রেরিত তুচ্ছ অপমানজনক ভেট দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে আহোমরাজের বড়গোহাঞির প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয় [খান চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ-রচিত কোচবিহারের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঙ্ক ১০৫]।

"আমি শুনিছিলোঁ[১] কোচর[২] দেশত[৩] মানুহে[৪] মানুহর[৫] ভুরুর গারুত[৬] শোবে সেই দেখি আমার দেশলৈকো[৭] এইটো[৮] মানুহর ভুরুর গারু দিছে হবলা। আমার দেশত কিন্তু কাউরি[৯] শগুনেহে[১০] মরা শ[১১] ব্যবহার করে এই মাছ যে আনিছে তাক[১২] আমার মানুহে ব্যবহার ন করে কোচর নিচিনা হারামখোরেহে তার সোবাদ[১৩] জানে। আরু এই সাঁরী কেইখন যে পঠাইছে তাক আমার দেশর খারচাইই তেহে পিন্ধে।

জকাই দিছে জকাইরো তিনটা চুক পৃথিবীরো তিনটা কোন কিন্তু ঠাই[১৪] পানিতহে[১৫] জকাইবার পারি অঠাই[১৬] পানিত[১৭] জকাই বারলৈ গলে[১৮] বুরি[১৯] মরিব লাগে[২০]।"

সন্দেহ নেই বড় গোহাঞি খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে এইসব কথা বলেছেন। এখানে কটুকাটব্যের অভাব নেই। এই অংশের আধুনিক বাংলায় রূপান্তরণ :

'আমি শুনেছিলাম কোচ দেশে মানুষে মানুষের চুলের বালিশে শোয় তাই দেখছি আমার দেশের জন্যে এই একটা মানুষের চুলের বালিশ দিয়েছে (হবলা = কটু কথা)। আমার দেশে কিন্তু কাক শকুনেই মড়া শব ব্যবহার করে (=খায়)। এই মাছ যে এনেছে তা আমাদের দেশের মানুষ ব্যবহার করে না (=খায় না)। অজ্ঞাতকুলশীল কোচ হারামজাদারা তার স্বাদ জানে। আর এই শাড়ি কয়খান যে পাঠিয়েছে তা আমার দেশের বেশ্যারাই পরে। জকাই (বাঁশের তৈরী মাছধরা খাঁচা) দিয়েছে—জকাইয়ের তিনটে কোণ—পৃথিবীরও তিনটে কোণ—কিন্তু যে জলে থই পাওয়া যায় সেখানে জকাই ব্যবহার করা যায়। অথই জলে জকাই ব্যবহার করতে গেলে ডুবে মরতে হয়। [শেষ বাক্যটিতে রাজনৈতিক তাৎপর্যমণ্ডিত শাসানি counter-threat আছে।]

১ শুনেছিলাম (তু 'লেখিবোঁ', কৃষ্ণকীর্তন)
২ ৬ষ্ঠী বিভক্তিতে 'র'
৩ ৭মী বিভক্তিতে 'ত' (এ, তে, এতে, ত প্রয়োগে ৭মী বিভক্তি)
৪ মানুষে = মানুহে ('ষ' মহাপ্রাণ-লুপ্তি)
৫ মানুহের = মানুষের
৬ ৭মী বিভক্তিতে 'ত'
৭ লৈকো = জন্যে
৮ এইটো = এই একটা
৯ কাউরি = কাক
১০ শগুনেহে = শকুন (ক স্থানে গ)
১১ শ = শব
১২ তাক = তাহা, তা'
১৩ সোবাদ = স্বাদ (স্বরবিভক্তি)
১৪ ঠাই = থই (তু° চর্যাপদ)
১৫ পানিতেহে = জলে
১৬ অঠাই = অথই
১৭ পানিত = জলে
১৮ গলে = জলে
১৯ বুরি = ডুবিয়া, ডুবে (তু° চর্যাপদ
২০ মারী লাগে = মরা লাগে

মহারাজ নরনারায়ণের পত্রের উত্তরে ১৪৭৮ শকের (১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দের) ১০ই আষাঢ় প্রেরিত আহোমরাজ চুকুম্‌ফা স্বর্গনারায়ণের উত্তরপত্রের

(কোচবিহারের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাংক ১০৫) অবিকল প্রতিরূপ :

"স্বস্তি ত্রিপুরহরচরণ স্বর্গশ্রীপর্ণসুধাপান ভৃঙ্গায়মান ,সম্মানদান সন্তান শৌর্য্যধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্যোদার্য্য পারাবার তুহিনকরনিকরতরঙ্গিণী তরঙ্গ পাণ্ডব-যশোরাশি বিরাজিত কুলকমল প্রকাশৈকভাস্কর শ্রীমন্মল্লনারায়ণ রাজ-মহোদারচরিতেষু।

লিখনং কার্য্যঞ্চ (।) অত্র কুশল (।) তোমার কুশলবার্ত্তা শুনিয়া পরমাপ্যাতা[১] হৈলোঁ[২]। আরু[৩] যে লিখিছা[৪] প্রীতিবৃক্ষ অঙ্কুরিত সেয়ে[৫] তোমার আমার সাহ্লাদেত[৬] বৃদ্ধিক[৭] পায়া[৮] ফলিত হৈবার[৯] খান[১০] যি[১১] কহিছ ই গোট [১২] বিশষ[১৩]। কিন্তু তোমার আমার প্রীতি গোট যি হত হতে ঘটিছে[১৪] সমস্তে[১৫] জান। সেইরূপ মর্য্যাদা ব্যবহারত্[১৬] যদি রহিব ফলিত পুষ্পিত কিসক[১৭] ন হৈব[১৮]। আমরা পূর্ব অভিপ্রায়তে[১৯] আছি। আরু উকিলর[২০] সঙ্গে যি সকল দ্রব্যাদি পাঠাইয়াছিলা ই সকল সভাত্[২১] দেখাই-বার উচিত না হয়[২২] (।) কিন্তু যি-সকলে যি হক[২৩] আচরি থাকে[২৪] অনীতি[২৫] হৈলেও আচরণীয়ক[২৬] লৈ তাকে নীতি স্বরূপে দেখে[২৭] (।) এতেকে দিবার[২৮] পোরা[২৯] আরু সমুচয় সেই সেই দ্রব্যত[৩০] প্রবর্ত্তনীয়[৩১] লোকর[৩২] দ্বারায়ে[৩৩] যি বুজুবা[৩৪] গেছে[৩৫] সেইরূপে বুজিবা (।) তোমার উকিলর সঙ্গে আমার উকিল শ্রীচণ্ডীবর ও শ্রীদামোদর শর্ম্মাক[৩৬] পাঠাবো[৩৭] গৈছে[৩৮] (।) এমরার[৩৯] মুখে সকল সমাচার বুঝিবা। তোমার অর্থে[৪০] সন্দেস নড়া কাপোর[৪১] ২ থান গজদন্ত ৪ গাণ্ডিয়ন ২ মোনা[৪২] পঁহুছব[৪৩]। শক ১৪৭৮ মাস আহার[৪৪] দিন ১০।"

১ পরম আপ্যায়িত
২ হৈলোঁ = হইলাম (তু° কৃ কী)
৩ আর
৪ লিখেছ
৫ সেই
৬ আহ্লাদেতে (to our pleasure)
৭ স্বার্থে 'ক' প্রয়োগ, তু°—বর্দ্ধিতাক
৮ পেয়ে
৯ হইবার
১০ খান = বিষয়টি
১১ যে
১২ গোটেক, গুটেক = এইটি
১৩ বিশেষ = গুরুত্বপূর্ণ
১৪ যি হত হন্তে ঘটিছে = যে ভাবে বিনষ্ট হচ্ছে
১৫ সবকিছুই, in full
১৬ ব্যবহারে
১৭ কেন

১৮ না হৈব = না হবে

১৯ অভিপ্রায়ে, We stick to our previous attitude

২০ উকিলের, 'র' ষষ্ঠী বিভক্তি, ভকিল (ফার্সী)

২১ সভাতে

২২ না হয় = নয় (তুং ন হইলে = নইলে)

২৩ হক = সব

২৪ আচরি থাকে = ব্যবহার করে থাকে

২৫ অব্যবহার্য

২৬ আচরণীয়ের জন্য

২৭ নীতিস্বরূপে দেখে = ব্যবহার্য মনে হয়

২৮ দেবার

২৯ পর

৩০ দ্রব্যে

৩১ ফিরৃতি

৩২ লোকের

৩৩ দ্বারা

৩৪ বুঝানো

৩৫ যাচ্ছে

৩৬ শর্মাকে (২য়া বিভক্তিতে 'ক')

৩৭ পাঠানো

৩৮ যাচ্ছে

৩৯ এমরার = ইমরার = ইহাদের

৪০ জন্য

৪১ কাপড়

৪২ মণ

৪৩ পৌঁছাচ্ছি

৪৪ আষাঢ়

'কামরূপী' উপভাষা বা বাহে ভাষায় ধ্বনিগত ও রূপগত যে-সব বৈশিষ্ট্য অধুনা লক্ষ্য করা যায়, তা এই তিন পত্রধৃত প্রয়োগ থেকে অভিন্ন।

ক ॥ সর্বনাম : প্রাচীন প্রয়োগ :

ইমৃরাক (২য়া বহুবচন)। ইমরা = ইহারা; এরা (তুং—আমরা, তোমরা)
তামরার (৬ষ্ঠী বহুবচন)। তামৃরা = তারা, তাহারা, তাঁরা, তাঁহারা।

'কামরূপী' উপভাষায় সর্বনাম প্রয়োগের আধুনিক উদাহরণ :

১. তোমরা গুলা কোটে যাবার ধচ্চেন বাহের ঘর ? (= তোমরা কোথায় যাচ্ছেন বাবুরা ?)
২. ইমৃরা ক্যামন মানৃষি বাহে ? (= এরা কেমন মানুষ, মশায় ?)
৩. তামৃরা কয়া গেইছে ইমৃরা আসিল্ কালে দীনহাটাত্ পাঠান যায়। (= তারা বলে গেছে এরা এলে এদের দিনহাটায় পাঠাতে হবে)

খ ॥ ক্রিয়াপদের আধুনিক প্রয়োগ :

১। আশ দেখির্ যাবেন বাহে ?—না যাঙ্।

(= রাস দেখতে যাবেন মশায় ?—যাব না।)

২। কত করি মাছ দিছেন ? (= কত করে মাছ দিচ্ছ ?)

—এক সুকি হালা (= চারটে এক সিকি)

—দু আনাত্ দিবেন্ ? (= দু আনায় দেবে ?)

—না দিম্। (= দেব না)

মহারাজ নরনারায়ণের পত্রে বাহে ভাষার অঙ্গীভূত ক্রিয়াপদ পাই :

বর্দ্ধিতাক পাই, লেখিম্, বিদায় দিবা, গইছে, বুরি মরিরব লাগে।

গ॥ বিভক্তি : কথ্যভাষার অঙ্গীভূত বিভক্তি :

৭মী বিভক্তিতে এ, তে, এতে—

উদ্যোগন্তে (= উদ্যোগে)

আপনে (কর্তায় ৭মী)

গারুত (= বালিশে)

দেশত (= দেশেতে)

তাক (= তায়, তাহায়)

সভাত (= সভাতে)

প্রচলিত প্রবাদে বিভক্তির ব্যবহার :

মনত্ খোয়া (মনে লাগা)।

বুকত্ চড়ি জল্পেশ দেখা (= বুকে চড়ে জল্পেশ দেখা)

[জল্পেশ জলপাইগুড়ির প্রাচীন শৈব মন্দির, এখানে ভাবার্থে উচিত শিক্ষা দেওয়া]

অকম্মা ভাতার সেজার দোসর। সেজাত্ করে খোসর খোসর॥ (= অকর্মা স্বামী শয্যার সঙ্গী বা শয়নপ্রিয়, শয্যায় করে এ পাশ ও পাশ)।

মনত্, বুকত্, সেজাত্ শব্দে ৭মী বিভক্তি প্রযুক্ত হয়েছে।

তেমনি ২য়া বিভক্তিতে 'ক' এর প্রয়োগ : বর্দ্ধিতাক পাই, তাক।

ঘ॥ ধ্বনিরূপ :

বরেন্দ্রী (উত্তর-পূর্ববঙ্গ) ও বঙ্গালী (পূর্ববঙ্গ) উপভাষার সঙ্গে কামরূপী উপভাষার (বাহে ভাষার) ধ্বনিসাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই তিন উপভাষাতেই তালব্য স্পর্শ ব্যঞ্জনে চ, ছ, জ দন্ত্য ঘৃষ্টভাবে (dental affricate) উচ্চারিত হয়, কোথাও কোথাও উষ্মধ্বনির সংস্রবও দেখা যায়। অথচ রাঢ়ী (পশ্চিম-

বঙ্গ) উপভাষায় এই ধ্বনিগুলি ঘৃষ্ট হলেও মূলের তালব্য ধর্ম ক্ষুণ্ণ হয় নি। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে আদিভারতীয় আর্যভাষার মূলধ্বনির এই পরিবর্তনের কারণ কি ? একথা স্বীকার্য যে এই ভাষাগোষ্ঠীর একটা বড়ো অংশ মোঙ্গোল নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভোটচীনা ভাষার ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই তিন উপভাষার ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

কামরূপী উপভাষা আখ্যা দিয়েই কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর জেলার আদি অধিবাসীদের ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত করা যায় না। আর্যভাষার আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্বের আকর্ষণে এই অঞ্চলের মানুষ আর্যভাষাকে স্বীকার করলেও তাদের উচ্চারণভঙ্গীর আদিম বৈশিষ্ট্যগুলি, ভাবপ্রকাশের অব্যর্থ উপকরণ হিসাবে পুরাতন ভাষাগোষ্ঠীর শব্দভাণ্ডারের একটি অংশ, পদপ্রয়োগের সিদ্ধরীতি—এগুলি একেবারে ত্যাগ করতে পারে নি। অস্ট্রিক-প্রভাবিত ভোটচীন উপাদান বাহে ভাষায় এখনো আছে এবং সে সূত্রেই তা বাংলা ভাষার সম্পদ। বিভিন্ন বৃত্তিধারী অনুন্নত শ্রেণীর কর্ম-জীবীদের ভাষায়, গ্রাম ও নদীর নামে, গ্রাম্য নারীর ভাষায় এই আর্যেতর উপাদান প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত আছে। * কামরূপী উপভাষার রূপগত ও ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য একারণেই ভাষাবিজ্ঞানীর কাছে মূল্যবান। বস্তুত এই উপভাষা একদিকে আধুনিক বাংলা ভাষাকে অপর দিকে প্রাচীন ভোটচীন ভাষাগোষ্ঠীকে ধরে রেখেছে।

ষোড়শ শতকে কোচবিহার ও আহোম রাজদরবারে ব্যবহৃত গদ্যভাষার নিদর্শন তিনটি পত্র বিচার করে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আধুনিক বাংলা গদ্যভাষা অমূল তরু নয়, তার শিকড় গত পাঁচ শতাব্দী প্রসারিত। প্রাচীন বাংলা ভাষা (চর্যাগান) ও আদি মধ্যযুগের বাংলাভাষার (কৃষ্ণকীর্তন) সঙ্গে ষোড়শ শতকে প্রচলিত উত্তরবঙ্গের কথ্য ও লেখ্য ভাষার সম্পর্ক কতো ঘনিষ্ঠ, তা আমরা লক্ষ্য করেছি। যে 'মিসিং লিঙ্ক' খুঁজে না পাওয়ার বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগের ইতিহাস আজো সম্পূর্ণ ভাবে সংগঠিত হয় নি, তাকে খুঁজতে হবে উত্তরবঙ্গের ভাষায়, এই সত্য বোধ

---

* ডক্টর নির্মল দাশ-রচিত "উত্তরবঙ্গের নারীর ভাষা" প্রবন্ধটি (বিশ্বভারতী পত্রিকা, বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৪, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৭), দ্রষ্টব্য। এটি মূল্যবান আলোচনা।

করি এখানে প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন বাংলাভাষা কী রকম ছিল তা জানতে হলে এই বাহে ভাষা বা 'কামরূপী' উপভাষা বা কোচবিহার-রংপুর-জলপাইগুড়ি-দিনাজপুরের লোকভাষাকে জানতে হবে।

এখনকার বাহে কথ্য ভাষা, প্রবচন, ধাঁধাঁ ও লোকগীতের মধ্যে প্রাচীন কোচবিহারী ভাষা প্রবাহিত। মহারাজ নরনারায়ণের আমলের কথ্য ও লেখ্য ভাষার সঙ্গে এদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। আর সে-কারণেই প্রাচীন কামরূপী ভাষা আধুনিক বাংলা গদ্যভাষার সঙ্গে যুক্ত : এ কথাই মেনে নিতে হয়।

উত্তরবঙ্গের বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকগীতি প্রধানত তিন শ্রেণীর—ভাওয়াইয়া, দরিয়া ও চট্‌কা। এইসব গানে 'কামরূপী' উপভাষার সকল বৈশিষ্ট্য রক্ষিত। মহারাজ নরনারায়ণের আমলের রাজদরবারে ব্যবহৃত ভাষা থেকে তা খুব একটা ভিন্নতর নয়। এরই একটি নিদর্শন (চট্‌কাগান) এখানে উপস্থিত করে প্রসঙ্গের ছেদ টানি।

দজ্জাল স্ত্রীর হাতে পড়ে লাঞ্ছিত স্বামী গানের মাধ্যমে তার হেনস্থা বর্ণনা করছে :

ওকি বাপ্‌রে বাপ্‌ মাও রে মাও।
না পাং মুই কামাই করিবার ॥
হাল বয়া আয়নু বাড়ি ঝাপি মাথাত্‌ দিয়া।
অত্তি থো তোর নাঙ্গল কোদাল বারা বানেক আসিয়া ॥
বারা বানিলু ভাল করিলু খুদ চারিটা খা।
কলসি দুইটা ভার সাজেয়া জল তুলিয়া যা।
জল আনিলু ভাল করিলু ঘরের কোনাত্‌ থো।
তিন দিনিয়া বাসিয়া ডোগা ভাল করিয়া ধো ॥
ডোগা ধুলু ভাল করিলু তুই সে প্রাণের নাথ।
চট্‌ করিয়া চড়েয়া দে তুই দুইটা মানুষির ভাত ॥
ভাত আন্দিলু ভাল করিলু তুই সে প্রাণের পতি।
বিছানা খান পাতেক এলা ছাওয়া ধরিয়া শুতি ॥

[স্বামীর উক্তি : বাবা রে বাবা, মা রে মা, কামাই করতে পারি না। হাল-চাষ করে ঝাপি মাথায় দিয়ে বাড়ি এসেই ধান ভানতে হয়। তারপর পত্নীর

অনুগ্রহের দান চারটি খুদ সিদ্ধ খেতে হয়, তারপর জল আনা, ডোগা (ভাত রাঁধার পাত্র) মাজা, ভাত রাঁধা—সবই করতে হয়। অবশেষে হুকুম—স্ত্রী ছেলে নিয়ে শোবে, তার জন্য বিছানা পেতে দাও।)

আশা করি ভাষাবিজ্ঞানী ও সাহিত্যের ইতিহাসলেখকরা কামরূপী উপভাষা তথা ষোড়শ শতকের কোচবিহার ও সন্নিহিত অঞ্চলে ব্যবহৃত বাংলা গদ্যভাষা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবেন এবং আধুনিক বাংলা গদ্যভাষার সঙ্গে তার সম্পর্ক পুনর্বিচার করবেন।

এই প্রবন্ধ রচনায় বিশেষ সাহায্য করেছেন কোচবিহারনিবাসী সাহিত্যিক শ্রীঅমিয়ভূষণ মজুমদার। বস্তুত তাঁর সাহায্য ভিন্ন এই প্রবন্ধ লেখা সম্ভব হত না।

জীবনানন্দ দাশ

॥ এক ॥

বিংশ শতাব্দের চতুর্থ দশকে নোতুন বাংলা কবিতা দেখা দেয়। আধুনিক কবিতার মৌলিক চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বহু-শ্রুত মন্তব্যটি সেদিন রচিত : 'কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিংশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা'। সেদিনই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মন্তব্য করেছিলেন, 'বিংশ শতাব্দীর মূল মন্ত্র অবৈকল্য আর অকপটতা।'

আধুনিক বাংলা কবিতার যে নেতৃত্বস্থানীয় কবিরা ১৯৩০-এর আগে পরে কাব্যসংসারে দেখা দিয়েছিলেন তাঁদের কবিতার চরিত্রে এই দুটি মন্তব্যের প্রয়োগ কতোদূর সার্থক তা বিচার্য।

এ দুই মন্তব্যের অন্তরালে যে সাহিত্যসত্য প্রকট তা হল, চতুর্থ দশকের নোতুন বাংলা কবিতা রোমান্টিকতার প্রতিক্রিয়ায় রচিত নব্য ক্লাসিক চর্যার ফসল। সুধীন্দ্রনাথের প্রথম ইঙ্গিত 'অবৈকল্য'র তাৎপর্য অবৈকল্য নৈরাত্ম-সিদ্ধি ; তাকে সরল করে বলা যেতে পারে রবীন্দ্র-কথিত 'বিষয়ের আত্মতা'। সুধীন্দ্রনাথের অপর ইঙ্গিত 'অকপটতা' অর্থাৎ চাই সততা ও সারল্য ; দৃশ্যমান অভিজ্ঞতার জগৎকে রূপায়িত করতে হবে সততার সঙ্গে ; সত্যের প্রতি এই আনুগত্য কবিকে রক্ষা করবে কপটতা থেকে।

সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে বিশদ করে বলা যেতে পারে, বাংলা কবিতায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বরূপের প্রভেদ তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পর তিনিই প্রথম স্বতন্ত্র কবি। রবীন্দ্রনাথ ও প্রাক্-রবীন্দ্র বাংলা কবিতার উপাদান ও লক্ষণাদি বর্জন করে তিনি কাব্যসাধনায় অগ্রসর হন নি, বরং সেই-সব উপাদান ও লক্ষণকে গ্রহণ করেই বর্জনের উপায় তিনি ভেবেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ আরো প্রমাণ করেছিলেন যে, স্থির লক্ষ্য ও পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়া রবীন্দ্রোত্তর যুগে কাব্যসিদ্ধি সম্ভব নয়।

আধুনিক বাংলা কবিতার মুক্তি-আন্দোলনের প্রধান নায়ক সুধীন্দ্রনাথ,

কিন্তু তার প্রথম পুরুষ জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)। ১৯২৮-এ তাঁর কবিতার বই 'ঝরাপালক' বেরুল, ১৯৫৪-র মে মাসে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', তার পাঁচ মাস পরেই তাঁর শোচনীয় মৃত্যু।*

যে-কাব্যান্দোলন ও কাব্যাদর্শের প্রতিষ্ঠা সুধীন্দ্রনাথে, তার সূচনা জীবনানন্দে। বুদ্ধি আর বোধির সমন্বয়সাধনে নিরন্তর প্রয়াসী কবি জীবনানন্দের প্রভাব আধুনিক বাংলা কবিতায় যে কতো দূরবিস্তৃত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইংরেজি ফরাসী কাব্যের বিবেকবান পাঠকমাত্রেই জানেন, রোমান্টিকদের আবেগপ্রধান কবিতার সূচনা হয়েছিল ক্লাসিকবাদীদের ব্যাকরণ-অনুগত যুক্তিনিষ্ঠ কবিতার বিরুদ্ধতায়, আবার ক্লাসিক রীতির প্রত্যাবর্তনও ঘটে রোমান্টিকদের বিরোধিতায়। জীবনানন্দ দাশের সমগ্র কাব্যরীতি এই দুই রীতির মধ্যবর্তী ঘটনা, এ সত্য স্মরণে রাখলে কবি জীবনানন্দের কাব্যোপভোগে আর বিভ্রান্তি ঘটবে না। রোমান্টিক প্রকৃতিপ্রেম, ঋতুপর্যায়ের বর্ণনায় বিশেষণনির্ভর বাক্‌প্রতিমার ব্যবহার, নির্বাচিত শব্দের পৌনঃপুনিক প্রয়োগের দ্বারা সৌন্দর্যলোক নির্মাণ, প্রকরণবিমুখতা, ছন্দ ব্যবহারে শৈথিল্য—এইসব লক্ষণ প্রমাণ করে জীবনানন্দ কতোটা রোমান্টিক। অন্যদিকে, কথ্যছন্দের ধ্বনিমাধুর্য আবিষ্কার, লিরিকের মন্ময়তা ছেড়ে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিষয়াশ্রয়ের প্রতি মনোযোগ ('আট বছর আগের একদিন', 'রাত্রি') জীবনানন্দের আধুনিকতার দাবীকে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত করে, যদিচ প্রসঙ্গান্বেষণে বিশ্বভ্রমণ ('হায় চিল', 'আট বছরে আগের একদিন') প্রমাণ করে তিনি আধুনিকতার স্বরূপ নির্ধারণে সফল হন নি। প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে জীবনানন্দের কাব্যে। তানপ্রধান বা অক্ষরবৃত্তের প্রবহমানতাকে তিনি চূড়ান্ত শিল্পসাফল্যে উন্নীত করতে পারেন নি। পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিষয়াশ্রয়, অনুভূতিপুঞ্জের ঐক্যবোধ ও কথ্যছন্দের শ্রুতিসিদ্ধি জীবনানন্দের অনায়ত্ত ছিল। তা আয়ত্ত করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, একারণেই,

* কাব্য: ঝরাপালক (১৯২৮), ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), বনলতা সেন (১৯৪২), মহাপৃথিবী (১৯৪৪), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৪); মৃত্যুর পর প্রকাশিত—রূপসী বাংলা (১৯৫৭), বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)। প্রবন্ধ গ্রন্থ—কবিতার কথা (১৯৫৬)।

রবীন্দ্রনাথের পর জীবনানন্দ নন, সুধীন্দ্রনাথই প্রথম স্বতন্ত্র কবি। তবু বাংলা কবিতার মুক্তি আন্দোলনের প্রথম পুরুষ জীবনানন্দ, একথা অবশ্যস্বীকার্য।

ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ও অধ্যাপক জীবনানন্দ ইংরেজি রোমান্টিক প্রকৃতি-কবিতার সৌন্দর্যাস্বাদনে বিমুখ ছিলেন না এবং সত্যেন্দ্রনাথের পদাংকানুসরণই তিনি প্রকৃতিবর্ণনায় উৎসাহী ছিলেন। রোমান্টিক প্রকৃতি কবিতার মুগ্ধতা ও প্রকরণবিমুখতা তাঁর কবিতায় দুর্লক্ষ নয়। আকর্ষণীয় শব্দকৌশল, চিত্তাকর্ষক ধ্বনিস্পন্দন ব্যবহারে জীবনানন্দের যে আগ্রহ, অক্ষরবৃত্ত (পয়ার বা তানপ্রধান) ছন্দের বিচিত্র ধ্বনিস্পন্দন আবিষ্কারে বা শব্দনির্মাণে সজ্ঞান শিল্পীস্বভাবের প্রয়োগে তাঁর অনুৎসাহ প্রমাণ করে কাব্যগত কোনো পরীক্ষাই তাঁর সজ্ঞান-চৈতন্য-প্রভব নয়। আমাদের দুঃখ এই যে, কাব্যপাঠকের মনে জীবনানন্দের ব্যক্তিত্ব স্বভাবতই প্রচ্ছন্ন। তাঁর কাব্যের পর্ব থেকে পর্বান্তরে ভঙ্গির পরিবর্তন অন্তঃপ্রেরণায় নয়, আত্মরক্ষার তাগিদে,—এই শোচনীয় সত্যোপলব্ধি আমাদের বিমূঢ় করে, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর জীবিতকালে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রকাশিত হয়েছে, সুতরাং এই সংকলনের কবিতা নির্বাচনে তাঁর সম্মতি ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এবং সেখানেই আমাদের বেদনা। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' সংকলন-বিধৃত অনেক কবিতাই আমাদের দুঃখ দেয় প্রাকরণিক বৈফল্যের জন্য। পরিবর্তনের জন্যই পরিবর্তনে কোনো বিবেকী সৎ কাব্যপাঠকের চিত্ত সায় দেয় না। প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে কবির ঘন ঘন মত পরিবর্তন বিবেকী কাব্যপাঠকের অভিপ্রেত হতে পারে না। সারাজীবন পয়ারে লিখে হঠাৎ 'তোমাকে ভালবেসে' কবিতায় জীবনানন্দ শ্বাসঘাতপ্রধান ছন্দের আশ্রয় কেন নিলেন ?*

সুতরাং এই কবিতাটি মুহূর্তের তাড়না-জাত, সে বিষয়ে আমরা স্থিরনিশ্চয় হই। জীবনানন্দের শেষ পর্যায়ের কবিতার ব্যর্থতা আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে অনুভূত রসবস্তুকে পাঠকের মনে সঞ্চার করে দেওয়াই কবির প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্ব, ঐতিহ্য ও অনুকরণ একই শব্দের প্রকারভেদ নয়, ছন্দোসিদ্ধি, মানেই কাব্যসিদ্ধি, এবং ভঙ্গির পরিবর্তন যদি অনিবার্য ও অন্তর প্রেরণাজাত না হয় তবে তা ব্যর্থ। ইংরেজি রোমান্টিক কবিতা ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা

* দ্রষ্টব্য—রঞ্জিত সিংহের 'শ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি' গ্রন্থের 'জীবনানন্দ দাশ' অধ্যায়।

জীবনানন্দের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে উৎসাহ সঞ্চার করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। তবু জীবনানন্দের কবিতায় প্রকৃতির বাক্‌প্রতিমা ও প্রতীক ব্যবহারে কিছুটা বিশিষ্টতা দেখা দিয়েছে। সেটাই জীবনানন্দের নিজস্বতা। সেখানেই তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পুরুষ।

অথবা বেহুলা একা যখন চলেছে ভেঙে গাঙুড়ের জল
সন্ধ্যার অন্ধকারে, ধানক্ষেতে, আমবনে, অস্পষ্ট শাখায়
কোকিলের ডাক শুনে চোখে তার ফুটেছিল কুয়াশা কেবল

[এখানে আকাশ নীল]

বেহুলার ছায়ায় আমরা অনায়াসেই কীটসের 'ওড টু নাইটিংগেল'-এর রুথের চিত্র ও বেদনাকে অনুভব করি। প্রকৃতিদর্শনে এমন এক সততা ও ঋজুতার পরিচয় এখানে পাই প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সৌন্দর্যঅনুভবে যা আমাদের বেঁধে দেয়।

অশ্বত্থের ডালে ডালে ডাকিয়াছে বক ;
আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এইসব নিভৃত কুহক
আমরা দেখেছি যারা বুনোহাঁস। শিকারীর গুলির আঘাত
এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্রনীল জ্যোৎস্নার ভিতরে
আমরা বুঝেছি যারা পথঘাট মাঠের ভিতর

আরো এক আলো আছে : দেহে তার বিকালবেলার ধূসরতা ;
চোখের দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে আছে স্থির
পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর।

জীবনানন্দের বৈশিষ্ট্য এই প্রকৃতিচিত্রে পরিস্ফুট। 'জীবনের নিভৃত কুহক', 'দিগন্তের নম্রনীল জ্যোৎস্না', 'বিকালবেলার ধূসরতা', 'ম্লান ধূপের শরীর' : এইসব বাক্‌প্রতিমায় কবির নিজস্ব রূপ রস স্পর্শ ঘ্রাণ শব্দের জগৎ উপস্থিত। 'আরো এক আলো আছে' : এই আলো অস্পষ্টতার আলো। স্পষ্ট প্রখর আলো থেকে তা ভিন্ন। কিন্তু এই অস্পষ্ট আলো প্রচলিত স্পষ্টতা থেকে বহুগুণ স্পষ্টতর, উজ্জ্বলতর। জীবনানন্দের কবিতায় 'এই আলো'র উপস্থিতি তাঁকে দিয়েছে এক অভিনব স্বাতন্ত্র্য। তাঁর কবিতাপাঠের সময় আমাদের মনে রাখতে হয় এই আলোর পটভূমি।

জীবনানন্দ প্রতীক ব্যবহারে আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছেন। তাঁর বহুখ্যাত 'বনলতা সেনে'র একটি সুপরিচিত শ্লোক—

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

এখানে বুঝতে অসুবিধা হয় না, প্রতীক রোমান্টিকতারই অনুষঙ্গ। এখানে শব্দ তার ব্যবহারিক প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে উঠেছে। বহু ব্যবহারে মলিন শব্দ, কথা, ছবি কিভাবে নোতুন অবয়ব ও তাৎপর্য পায় তা এখানে দেখা যায়। নাটোরের বনলতা সেন এখানে ব্যক্তি নয়, ব্যক্তি ছাড়িয়ে প্রতীকে পরিণত। 'বনলতা সেন' সমস্ত অতীত ও ঐতিহ্য, সৌন্দর্য ও প্রেমের সংহত শিল্পপ্রতিমা।

জীবনানন্দের ইতিহাসচেতনা আমাদের সপ্রশংস মনোযোগ আকর্ষণ করে। পুরাণ (myth) প্রয়োগে তাঁর শিল্পসিদ্ধি বিস্ময়কর। তিনি একাকিত্ব ও ঐতিহ্যকে, ব্যক্তি ও স্বদেশকে, বিদেশ ও বিশ্বকে মিলিয়েছিলেন। সেমেটিক ও ইয়েট্সীয় বিশ্বসংস্কার থেকে শুরু করে আত্মজীবন-পুরাণে মানবী নায়িকার প্রতিমানির্মাণে (বনলতা-সুরঞ্জনা-সুচেতনা-সুদর্শনা-শঙ্খমালা) তাঁর নৈপুণ্য লক্ষণীয়। তিনি এই লোক থেকে লোকান্তরে, চেতনা থেকে অবচেতনায় স্বচ্ছন্দে চলে যান, বাস্তব থেকে স্মৃতিলোকে তাঁর অনায়াস-পরিক্রমা। জীবনানন্দ তাঁর ইতিহাস-স্মৃতি-পুরাণলোকে বারবার স্বপ্নপ্রয়াণ করেছেন। এই বিপন্ন পৃথিবীতে আমাদের রক্তের মধ্যে এক বিপন্ন বিস্ময় খেলা করে, সে সংবাদ বারবার তিনি আমাদের জানিয়েছেন। চারপাশের অসুস্থ উত্তেজনা-রক্তপাত-মন্বন্তর-যুদ্ধের শেষে আমাদের প্রত্যেকের মনে যে সুস্থভাবে বাঁচার সাধ ও সংকল্প রয়েছে, তাকে স্বাগত জানিয়েছেন :

ইতিহাস অর্ধসত্যে কামাচ্ছন্ন এখনো কালের কিনারায় ;
তবুও মানুষ এই জীবনকে ভালোবাসে ; মানুষের মন
জানে জীবনের মানে : সকলের ভালো করে জীবন যাপন।
কিন্তু সেই শুভ্র রাষ্ট্র ঢের দূরে আজ।
চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভীড়—অলীক প্রয়াণ।
মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর ;
যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল ;

মানুষের লালসার শেষ নেই ;
উত্তেজনা ছাড়া কোনোদিন ঋতু ক্ষণ
অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ
অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ
নেই।

তাঁর কাছে আজকের সমাজসংকট অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বিপর্যয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বলে মনে হয় নি, আধুনিক মানুষের যান্ত্রিক হৃদয়হীনতাই তাঁর কাছে সবচেয়ে ভয়াবহ ও শোচনীয় বলে মনে হয়েছে। এর থেকে তিনি মুক্তি চেয়েছেন। হৃদয়কে জাগাতে চেয়েছেন কারণ মানুষের অন্তর্লোকের 'মানব'কে ভোর পাখি অথবা বসন্তকালের সৌন্দর্য সম্বন্ধে নোতুন করে অবহিত করতে চেয়েছেন। জীবনানন্দের ধারণায়, আমাদের মুক্তি সৌন্দর্যলোকে—সে সৌন্দর্য শুধু চোখেরই নয়, মনেরও। তা'ছাড়া আর কিছুতেই মুক্তি নেই।

জীবনানন্দের আস্থা 'জীবনের যতিহীন প্রগতিশীলতা'য়, দুর্যোগের দিনে তিনি আমাদের জীবনপ্রেমিক হতে বলেছেন :

আমাদের আশা ভালোবাসা ব্যথা রণঘড়ি সূর্যের ঘড়ি
চিন্তা বুদ্ধি চাকার ঘুরুনি গ্লানি দাঁতালো ইস্পাত
খানিকটা আলো উজ্জ্বলতা শান্তি চায় ;
জলের মরণশীল ছলছল শুনে
কম্পাসের চেতনাকে সর্বদাই উত্তরের দিকে রেখে
সমুদ্রকে সর্বদাই শান্ত হতে বলে
আমরা অন্তিম মূল্য পেতে চাই—প্রেমে,
পৃথিবীর ভরাট বাজার ভরা লোকসান
লোভ পচা উদ্ভিদ কুষ্ঠ মৃত গলিত আমিষ গন্ধ ঠেলে
সময়ের সমুদ্রকে বার-বার মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে যেতে বলে।

॥ তিন ॥

আজ থেকে বত্রিশ বৎসর পূর্বে 'কবিতার কথা'য় ('কবিতা' বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪৫-এ প্রথম প্রকাশিত, গ্রন্থকারে প্রকাশ

১৯৫৬) জীবনানন্দ দাশ যা লিখেছেন, তা কবিমানসের পরিচয় গ্রহণে পাঠককে সাহায্য করে। কবির বক্তব্য :

"সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি ; কবি—কেননা তাঁদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকিরণ তাদের সাহায্য করছে। সাহায্য করছে ; কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না ; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্য প্রাপ্ত হয় ; নানারকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়।

.........যাঁরা বলেন সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে—পৃথিবীর কিম্বা স্বকীয় দেশের বিগত ও বর্তমান কাব্যবেষ্টনীর ভিতর চমৎকাররূপে দীক্ষিত হয়ে নিয়ে কবিতা রচনা করতে হবে, তাঁদের এ দাবীর সম্পূর্ণ মর্ম আমি অন্তত উপলব্ধি করতে পারলাম না। কারণ আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে, খণ্ডবিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময় যেন থেমে যায়,—একটি-পৃথিবীর অন্ধকার-ও-স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন যেন জ্বলে ওঠে হৃদয় এবং ধীরে ধীরে কবিতা জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়। এই চমৎকার অভিজ্ঞতা যে সময় আমাদের হৃদয়কে ছেড়ে যায়, সে সব মুহূর্তে কবিতার জন্ম হয় না, পদ্য রচিত হয়, যার ভিতরে সমাজশিক্ষা, লোকশিক্ষা, নানারকম চিন্তার ব্যায়াম ও মতবাদের প্রাচুর্যই পাঠকের চিত্তকে খোঁচা দেয় সবচেয়ে আগে এবং সবচেয়ে বেশী ক'রে, কিন্তু তবুও যাদের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী, পাঠকের মন কোনো আনন্দ পায় না, কিংবা নিম্নস্তরের তৃপ্তিবোধ করে শুধু, এবং বৃথাই কাব্যশরীরের আভা খুঁজে বেড়ায়।

.........আমি বলতে চাই না যে কাব্যের সঙ্গে জীবনের কেনো সম্বন্ধ নেই ; সম্বন্ধ রয়েছে—কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রকটভাবে নেই। কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুইরকম উৎসারণ, জীবন বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি তার ভিতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে, কিন্তু এইঅসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা-প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় না ; কিন্তু কবিতা সৃষ্টি করে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়, তার কল্পনা মনীষা শান্তি বোধ করে, পাঠকের ইমাজিনেশন

তৃপ্তি পায়।.........সৃষ্টির ভিতর মাঝে মাঝে এমন শব্দ শোনা যায়, এমন বর্ণ দেখা যায়, এমন আঘ্রাণ পাওয়া যায়, এমন মানুষের বা এমন অমানবীয় সংঘাত লাভ করা যায়— কিংবা প্রভূত বেদনার সঙ্গে পরিচয় হয়, যে মনে হয় এই সমস্ত জিনিসই অনেকদিন থেকে প্রতিফলিত হয়ে কোথাও যেন ছিল; এবং ভঙ্গুর হয়ে নয়, সংহত হয়ে আরো অনেকদিন পর্যন্ত, হয়তো মানুষের সভ্যতার শেষ জাফরান রৌদ্রালোক পর্যন্ত কোথাও যেন রয়ে যাবে ;—এই সবের অপরূপ উদ্‌গীরণের ভিতরে এসে হৃদয়ে অনুভূতির জন্ম হয়,—নীহারিকা যেমন নক্ষত্রের আকার ধারণ করতে থাকে তেমনি বস্তুসঙ্গতির প্রসব হতে থাকে যেন হৃদয়ের ভিতর ;—এবং সেই প্রতিফলিত অনুচ্চারিত দেশ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে ওঠে যেন, সুরের জন্ম হয় ;—এই বস্তু ও সুরের পরিণয় শুধু নয়, কোনো কোনো মানুষের কল্পনা মনীষার ভিতর তাদের একাত্মতা ঘটে—কাব্য জন্মলাভ করে।.........

তার প্রতিভার নিকট কবিকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে ;—হয়তো কোনো একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে তার কবিতাবৃত্তের প্রয়োজন হবে সমস্ত চরাচরের সমস্ত জীবের হৃদয়ে মৃত্যুহীন স্বর্ণগর্ভ ফসলের ক্ষেতে বুননের জন্য।"

জীবনানন্দের কাব্য-বক্তব্য এখানেই স্পষ্ট প্রকাশিত। তাঁর কবিতা এই বক্তব্যের শিল্পস্বাক্ষর। এই বক্তব্য, এক হিসেবে, কবি জীবনানন্দের আত্মোদ্‌ঘাটন। এই প্রবন্ধ তিনি যখন লেখেন (১৯৩৮) তখন প্রকাশিত হয়ে গেছে 'ঝরাপালক' ও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। তারপর প্রকাশিত হয়েছে 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির'। সুতরাং স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত, ধূসর পাণ্ডুলিপির কবির নিজস্ব বক্তব্য এখানে পাই। কল্পনা ও মনীষার কাছে কবির ঋণস্বীকার, প্রকৃতির সান্ত্বনায় বারবার আশ্রয় গ্রহণ, খণ্ড-বিখণ্ডিত পৃথিবীতে এক নোতুন সৌন্দর্যের অনুভূতি লাভ, বাইরের বিক্ষুব্ধ জগৎকে উত্তীর্ণ হয়ে 'পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়ে এক নতুন জলের কল্পনায়' বা 'পৃথিবীর সমস্ত দীপ ছেড়ে দিয়ে এক নতুন প্রদীপের কল্পনায়' কবিচিত্তের বিস্তার : এই সবকিছুই এখানে স্বীকৃত। নোতুন সৃষ্ট সৌন্দর্যানুভূতির উদ্‌গীরণের ভিতরে এসে হৃদয়ে কাব্যানুভূতির জন্ম হয়, এবং বস্তু ও সুরের পরিণয়ের মধ্য দিয়ে সৎ বিবেকী কবির কল্পনা ও মনীষায় তাদের একাত্মতা ঘটে, আর তখনই কবিতা জন্মলাভ করে : জীবনানন্দের এই কাব্যবিশ্বাস তাঁর কবিতায় রূপায়িত। লৌকিক অভিজ্ঞতা আর কবির অভিজ্ঞতা যে ভিন্ন,

মনীষা ও কল্পনার যোগে অভিজ্ঞতার যে জাত্‌বদল হয়, কবির অভিজ্ঞতা যে অ-লৌকিক, তার পরিচয় জীবনানন্দের কবিতার বারবার পাই। "সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি" এই স্মরণীয় বাক্যে জীবনানন্দ ইঙ্গিত করেছেন কেবল সেই উৎকৃষ্ট চিত্তেই কবিতার জন্ম হয়, যে চিত্ত আলোকের চেতনা বহন করে, কল্পনার রঙীন আলোয় সুদূর সৌন্দর্যের ইশারা পায়, এক বিশাল ইতিহাসবোধে উজ্জীবিত হয়, কল্পনার স্পর্শে সবকিছুকে নব মূল্য দেয় আর তিমির হনন করে এক নোতুন অভিজ্ঞতালোকে উত্তীর্ণ হয়, ইতিহাস-চেতনা এক 'মহাজিজ্ঞাসা'য় প্রাজ্ঞ পরিণতি লাভ করে।

যে 'মহাজিজ্ঞাসা' জীবনানন্দের হৃদয় কন্দরে ধ্বনিত, তা একাল সেকাল দূর অতীত ও ভবিষ্যৎকে স্পর্শ করেছে, দূরবিস্তারী হয়েও তা আধুনিক কাল-চিন্তোত্থিত :

বৃষ্টিবাতাস হলুদ পাতা ছাতকুড়ো ঘুণ মাকড়সাজাল এসে
বলছে : 'আরো কঠিন আঁধার নেমে পড়ার আগে
আমরা এলাম, কোথাও কিছু নেই ;
একটি শুধু মূর্খ আছে মানব ইতিহাসে
টঙে চড়ে চেয়েছে নীল আকাশ ধরবেই—……
তবুও মহাজিজ্ঞাসা ও অপার আশার কালো
অকূল সীমা আলোর মতো ;—হয়তো সত্য আলো।

('অবিনশ্বর')

এই প্রাজ্ঞোক্তি যিনি উচ্চারণ করেছেন, তিনি ইতিহাসসচেতন, মানবসভ্যতার অন্তহীন পথের পথী, প্রাচীনতার ঐতিহ্যবাহী, মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী কবি জীবনানন্দ।

॥ চার ॥

জীবন, পৃথিবী, প্রকৃতি, মোহিনী নারী সম্পর্কে জীবনানন্দের চিত্তে যে বোধবিষাদ অনুভূতি তা আমাদের পরিচিত পৃথিবীর নয়। একারণেই তাঁকে এখানে অপরিচিত মনে হয়েছে, নিঃসঙ্গ মনে হয়েছে। তাঁর নিসর্গবোধ ও বিষাদবোধ অনন্ত। তাই তিনি নির্জন, নিঃসঙ্গ।

"সৃষ্টির ভিতর মাঝে মাঝে এমন শব্দ শোনা যায়, এমন বর্ণ দেখা যায়, এমন আঘ্রাণ পাওয়া যায়, এমন মানুষের বা এমন অমানবীয় সংঘাত লাভ

করা যায়—কিংবা প্রভূত বেদনার সঙ্গে পরিচয় হয়, যে মনে হয় এই সমস্ত জিনিসই অনেকদিন থেকে প্রতিফলিত হয়ে কোথাও যেন ছিল ;—এবং ভঙ্গুর হয়ে নয়, সংহত হয়ে আরো অনেকদিন পর্যন্ত, হয়তো মানুষের সভ্যতার শেষ জাফরান রৌদ্রালোক পর্যন্ত কোথাও যেন রয়ে যাবে।" (কবিতার কথা)

এইসবের অপরূপ উদ্‌গীরণে যে অনুভূতির জন্ম হয়, তা থেকেই কবিতার জন্ম হয় : জীবনানন্দের এই বিশ্বাস তাঁর কবিতাকে অনন্য, তাঁকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। তাঁর সৃষ্ট জগৎ আমাদের কাছে অর্ধ-পরিচিত জগৎ। তাঁর ভাব-কল্পনা আমাদের নিয়ে যায় চেতনার ধূসর প্রান্তে যেখানে জড়জগৎ ও চৈতন্যলোকের ভেদরেখাটি বিলুপ্ত। তাঁর কবিতা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা এক নোতুন অনুভূতিলোকে উত্তীর্ণ হই :

পথ ঘাট মাঠের ভিতর
আরো এক আলো আছে ; দেহে তার বিকেলবেলার ধূসরতা।
চোখে দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে আছে স্থির
পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর।

কবিতা রচনাকালে জীবনানন্দ এই আলোতেই জগতের সবকিছুকে দেখেন, তখন সব ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক জীবনের 'মৃদুতম সচেতন অনুনয়' তখন 'থেমে যায়' আর তখন 'সেই একটি-পৃথিবীর-অন্ধকার ও স্তব্ধতায়' তাঁর হৃদয় 'একটি মোমের মতো যেন জ্বলে ওঠে'। ধ্যানলীন নৈঃশব্দ্যের পটভূমিতে যে বোধচৈতন্যের আলো জ্বলে ওঠে, তার সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন—

আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে ;
স্বপ্ন নয়, শান্তি নয়, ভালোবাসা নয়
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়।

সেই 'নরম মোমের আলো' কবির এই 'বোধচৈতন্যের আলো', তারই মৃদু কোমল আভায় নোতুন অভিজ্ঞতার ব্যঞ্জনায় পরিচিত পৃথিবী অপরিচিতা রহস্যময়ী সুন্দরী পৃথিবী হয়ে ওঠে, তখন—

আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—শুয়ে আছে নদীর এপারে
বিয়োবার দেরি নাই,—রূপ ঝরে পড়ে তার,—
শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে।

কবি জীবনানন্দের জগৎ পরিচিত নিসর্গ ও বস্তুলোক নয়, সে এক নোতুন সৌন্দর্যজগৎ। তাকে কি বলব ফ্যান্টাসি? কবি বলেছেন, কল্পনা ও মনীষার যোগে উৎকৃষ্ট চিত্তক্ষেত্রে স্বতন্ত্র অনুভূতির সৃষ্টি হয়, তা থেকেই কবিতাব জন্ম হয়। তীক্ষ্ণ কোমল মৃদু ইন্দ্রিয়ানুগত নিসর্গচিত্র থেকে জীবনানন্দ চলে গেছেন ইতিহাসের অন্তহীন পথ ধরে এক বিশাল ধূসর পৃথিবীতে, যাত্রার শেষে এক মহাজিজ্ঞাসায়। 'পৃথিবীর পথে কাজ নেই'—এই কথা উচ্চারণ করে জীবনানন্দ সমস্ত সাংসারিক ও উদ্যমকে উপেক্ষা করে এক শান্ত প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিয়েছেন, আমাদেরকে ডাক দিয়েছেন—

হেমন্তেব ধান ওঠে ফলে—

দুই পা ছড়ায়ে বোসো এইখানে পৃথিবীর কোলে।

যে-বোধচৈতন্যেব আলো কবিমনে নরম মোমের কোমল আলো ছড়ায়, তা কবির সামনে এক নোতুন রহস্যময় সৌন্দর্যলোকের দ্বার উদ্‌ঘাটন করে দেয়। তখন কবি এক অপরূপ জগৎকে দেখেন—

'হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রঙের সূর্যের নরম শরীরে' এক আশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। কবি দেখেন, ধীরে ধীরে রাত নেমে আসে—

তখন হলুদ নদী

নরম নরম হয় শরকাশ হোগ্‌লায়—মাঠের ভিতরে,

দূরদিগন্তে কবি দেখেন—

শিরীষবনের সবুজ রোমশ নীড়ে

সোনার ডিমের মতো

ফাল্গুনের চাঁদ,

গ্রামপথে দেখেন—

গোরুর গাড়িটি ধীরে চলে যায় অন্ধকারে সোনালি খড়ের বোঝা বুকে

পিছে তার সাপের খোলস, নালা, খলখল্ অন্ধকার—

শান্তি তার রয়েছে সম্মুখে ;

কবি এক রূপসীকে দেখেন—

মায়াবীর আরসীতে হয় শুধু দেখা

রূপসীর সাথে এক ; সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মতো রেখা

প্রাণে তার,—ম্লান চুল,—চোখে তার হিজলবনের মতো কালো।

রূপের আড়ালে নোতুন রূপকে দেখেন—

হয়তো এসেছে চাঁদ মাঝরাতে একরাশ পাতার পিছনে
সরু সরু কালো কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার,

লক্ষ্য করেন—

দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার।

ইন্দ্রিয়চেতনার এক নোতুন জগৎ উদ্‌ঘাটিত হয়—

চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জন মাছের চোখে,

নামে এক আশ্চর্য সন্ধ্যা—

শিশির শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল।

॥ পাঁচ ॥

জীবনানন্দ কি নির্জনতা, নিঃসঙ্গতার কবি? না, তিনি নিঃসংযোগের কবি? অথবা নিস্তব্ধতা, নৈঃশব্দ্যের কবি?

তাঁর সম্পর্কে এই প্রশ্ন বারবার উত্থাপিত হয়েছে। কাব্যজীবনে উপেক্ষার দ্বারা তিনি সম্বর্ধিত, মৃত্যুর পর সরব অভ্যর্থনায় তিনি গৃহীত। 'বনলতা সেন' তাঁর কাব্যের চাবিকাঠি এবং এর চেয়ে 'উৎকৃষ্টতর' কাব্য তিনি লেখেন নি, এই ধরনের অভিমত সম্প্রতি ব্যক্ত।

জীবনানন্দ 'নিঃসঙ্গতার কবি, নির্জনতার কবি' কোন্ অর্থে? আমরা এতক্ষণ লক্ষ্য করেছি, তাঁর জগৎ অ-লৌকিক জগৎ, তাঁর নিসর্গ পরিচিত নিসর্গ নয়, তাঁর মৌল জীবনোপলব্ধি বা লৌকিক উপলব্ধি বিচার থেকে আলাদা। জীবনানন্দের নিসর্গ-অনুভূতি তাঁর বিশিষ্ট 'বোধ'-এর প্রকাশ, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি জনতা, সংসার, বস্তুপ্রবাহ থেকে দূরবর্তী,—এই অর্থে তিনি নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতার কবি,—এ ধারণা ভ্রান্ত।

'বনলতা সেন' কাব্যে জীবন-মৃত্যুর ব্যবধানলোপী মনোভাব যুক্তিনির্ভর নয়। এ মনোভাবে জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান অগ্রাহ্য করা হয়েছে। বরং জীবনে মৃত্যু, মৃত্যুতেই জীবন, গোধূলিতে দিন ও রাত্রির একাকার মিলন, —এর উপরই কবির ঝোঁক।

দু দণ্ডের শান্তিদাত্রী নারীর 'ঘুচে গেছে সব লেনদেন', 'থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'। তখন 'ফুরায় এজীবনের সব লেনদেন'। কবি অনুভব করেছেন—

যেদিন শীতের রাতে সোনালি জরির কাজ ফেলে
প্রদীপ নিভায়ে রব বিছানায় শুয়ে ;
অন্ধকারে ঠেস দিয়ে জেগে রব
বাদুড়ের আঁকাবাঁকা আকাশের মতো।
স্থবিরতা, কবে তুমি আসিবে বল তো।

এই মৃত্যুভাবনা জীবনানন্দের কবিতায় বারবার এসেছে। 'হলদে পাতার মত আমাদের পথে ওড়াউড়ি' 'তখন ঝরিয়া যাব হেমন্তের ঝড়ে,' 'কবর খুলেছে মুখ বারবার যার ইসারায়,' 'নিমীল আগুনে ঐ আমার হৃদয়'। মৃত এক সারসের মত,' 'এই তো জীবন। সমুদ্রের অন্ধকারে প্রবেশাধিকারে'। এই মৃত্যুভাবনা কবির কাছে জীবনের অস্বীকৃতি নয়, বরং জীবন-সংলগ্ন। জীবনানন্দের অ-লৌকিক সৌন্দর্যানুভূতিতে, মায়াবী দৃষ্টিতে জীবন ও মৃত্যু ভিন্ন নয়, দুইকে নিয়ে তিনি একাত্মদৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন, আর এই একাত্মদৃষ্টি তাঁর একান্ত নিজস্ব কল্পনা মনীষাযোগে বোধচৈতন্যে উদ্ভূত, বাংলাদেশের আশ্চর্য গ্রামপ্রকৃতির পরিবেশের (বরিশালের নিসর্গ) রসে পুষ্ট। জীবনানন্দ যে রূপসী বাংলাকে কবিতায় সৃষ্টি করেছেন তা প্রত্যক্ষ লৌকিক ও আনন্দময় অ-লৌকিক অভিজ্ঞতায় জারিত। ধ্যানলীন নৈঃশব্দ্যের পটভূমিতে যে বোধচৈতন্যের আলো কবির হৃদয় জ্বলে উঠেছে, তাকে তিনি বলেছেন 'বোধ' ঃ 'হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়'। এই বোধদৃষ্টিতে জীবন ও মৃত্যু একীকৃত, আর এই একীকরণে জীবন-মৃত্যু দুয়েরই ঐশ্বর্য ও সম্ভাবনা সহস্রগুণ বর্ধিত হয়েছে। জীবনানন্দের দৃষ্টিতে লৌকিক মৃত্যুভাবনার স্থান নেই। তাঁর চেতনায় মৃত্যু জীবনের অন্য রূপ, অন্য নাম। তারই ফলে হেমন্ত ঋতুর শ্রান্ত নিসর্গ-প্রতিমাকে কবি যখন বন্দনা করেছেন তখন জীবনের শ্রান্তি ক্লান্তি পরাভবকে মেনে নেননি, জীবনের আনন্দকে পেতে চেয়েছেন। এই বিরল মানসের অধিকারী বলেই তিনি নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতার কবি।

জীবনানন্দের অনেক কবিতায় সৃষ্ট সৌন্দর্যে ম্লান বিষণ্ণতার সুর শোনা যায়, ক্লান্তি ও শ্রান্তির ছায়া পড়ে। মনে হয় তিনি যেন বিষণ্ণতার কবি।

'ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন', 'তার রঙ কুঙ্কুমের মতো নেই আর।

হয়ে গেছে রোগা শালিখের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো', 'দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা', 'শিশিরের শব্দের মতন/সন্ধ্যা আসে, ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল', 'ম্লান চুল,—চোখে তার হিজলবনের কালো', 'হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ার ঘর থেকে : এইসব বর্ণনা ও ইমেজ দেখে অনেকের মনে হয়েছে, জীবনানন্দ বুঝি-বা মৃত্যুর বিষণ্ণতাকেই কাব্যরূপ দিয়েছেন।

আসলে এইসব প্রতীক ও বাক্‌প্রতিমার মূলে রয়েছে কবিপ্রকৃতি। বোধচৈতন্যের যে আলোকবিন্দুকে কেন্দ্র করে তাঁর মধ্যে কবিতার জন্ম হয়, যার কথা গদ্যে ও কবিতায় তিনি বলেছেন, তারি ম্লান করুণ কোমল আভা—নরম মোমের আলোর মতো—তার সমস্ত কবিতায় ছড়িয়ে আছে। এটি জীবনের অস্বীকৃতি নয়, মৃত্যুবন্দনা নয়, বরং এক নব আশায় কবি উদ্দীপ্ত হয়েছেন। হৃদয়ে রহস্যময় 'বোধ' জন্ম নেবার কথা যে কবিতায় বলেছেন, সেখানেই তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে এই সত্য :

> কে থাকিতে পারে এই আলোয় আঁধারে
> সহজ লোকের মতো ;……কোনো নিশ্চয়তা
> কে জানিতে পারে আর ?

অতএব কোনো নিশ্চলতা, স্থবিরতা তাঁর কবিতার শেষ কথা নয়। তাঁর ইতিহাসবোধ, তাঁর প্রখর নিসর্গচেতনা, তাঁর অ-লৌকিক সামগ্রিক সৌন্দর্য-বোধ তাঁকে আশাবাদী করে তুলেছে, মানুষের অগ্রগতিতে তাঁর গভীর আস্থা ব্যক্ত হয়েছে :

> মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
> থেকে যায় ; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
> আরো ভালো—আরো স্থির দিকনির্ণয়ের মতো চেতনার
> পরিমাপে নিয়ন্ত্রিত কাজ
> কতদূর অগ্রসর হয়ে গেল জেনে নিতে আসে।

অখণ্ড কালচেতনায় ভাসমান কবিচিত্তের দীর্ঘ যাত্রাপথ পরিক্রমা করলে আমরা অনুধাবন করতে পারি, কবি মৃত্যুবিলাসী নন, জীবনানুরাগী। আজকের প্রাণচঞ্চল জগতে কবি নিজেকে মনে করেন, 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন'। অতীত থেকে তিনি যেমন বিচ্ছিন্ন নন, তেমনি বর্তমানেই আবদ্ধ নন। সেকারণেই আজ যার প্রিয়সঙ্গ

কবিকে 'দ্বদণ্ড শান্তি দিয়েছিল', সে নারী মনে করিয়ে দেয় অতীত সুখস্মৃতিকে, কারণ সে-ও অর্ধেক অতীত : 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য', তবু এখানেই কবি থামেন নি, কারণ 'অন্য সব আলো আর অন্ধকার এখানে ফুরালো'। কবি যে বোধচৈতন্যের আলোকে প্রজ্বলিত যে আলোক তাঁকে খণ্ড বর্তমান থেকে অখণ্ড বোধে, দূর ভবিষ্যতে নিয়ে যায়, তখন 'আলো অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে/স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে'। আর সেই বোধচৈতন্যের জাগ্রত মুহূর্তে কবি জীবনকে স্পর্শ করে, জীবনকে নিবিড় ভাবে ভালোবেসে বলেন :

> শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ
> আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস ;

জীবনমমতায় কবিকণ্ঠ কোমল হয় :

> আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের পরে হাত,
> সন্ধ্যার কাকের মতো আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে।

তখন জীবনানন্দকে জীবনানুরাগী কবি বলেই মেনে নিতে ইচ্ছে হয়।

‘কালান্তর’ : রবীন্দ্র-দর্পণে সমকাল

॥ এক ॥

গত শতাব্দীর শেষ চল্লিশ বছর ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম চল্লিশ বছর রবীন্দ্রনাথ বেঁচে ছিলেন এবং বৃটিশ-শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষের সার্বিক নব-জাগরণকে প্রত্যক্ষ করেছেন। শুধু তাই নয়, এই নব-জাগরণে তাঁরও একটি প্রধান ভূমিকা ছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন (১৮৬১) তখন দেশপ্রেমের কথা এদেশে উচ্চারিত হয় নি। তাঁর বাল্য ও কৈশোরে হিন্দু-মেলা ও কংগ্রেস ও যৌবনে স্বদেশী আন্দোলন ও স্বদেশী মেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিজ্ঞা, সাধনা ও কর্মযোগ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এ-সবের মধ্যেও তাঁর নিশ্চিত ভূমিকা ছিল। সত্তর-উপান্তে পৌঁছে তিনি ঘোষণা করেছেন,

> ‘যাঁরা আমাকে জানবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেছেন এতদিনে অন্তত তাঁরা একথা জেনেছেন যে, আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করি নি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল না, বিস্ময়ের অন্ত পাই নি।’ [আত্মপরিচয়, ৫]

জীবনকে প্রবলরূপে গ্রহণ করার সদা-ঔৎসুক্য ও আগ্রহ এই ঘোষণায় স্পষ্ট উচ্চারিত। জীর্ণ ও পুরাতনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আনুগত্য ছিল না। তাঁর আনুগত্য নবীন তারুণ্যের প্রতি। এ-কথাই একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন,

> ‘তুমি জান আমার স্বভাবটা একেবারেই সনাতনী নয়—অর্থাৎ খুঁটিগাড়া মত ও পদ্ধতি অতীতকালে আড়ষ্টভাবে বদ্ধ হয়ে থাকলেই যে শ্রেয়কে চিরন্তন করতে পারবে, একথা আমি মানি নে। [কন্‌গ্রেস, কালান্তর]

প্রথম উক্তি ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে, দ্বিতীয় উক্তি ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে—অর্থাৎ জীবনের শেষ দশ বছরের পর্বে রবীন্দ্রনাথ জীর্ণ পুরাতনকে বর্জন করতে ও নবীন তরুণকে অভ্যর্থনা করতে উৎসুক ছিলেন। এ থেকে অনুধাবন করা যায় প্রবীণ মনীষীর মন কতটা সজাগ ও আধুনিক ছিল।

'কালান্তর' গ্রন্থ (প্রথম প্রকাশ ১৩৪৪ বৈশাখ, ১৯৩৮) রবীন্দ্রনাথের এই সজাগ আধুনিক সমকালসচেতন মনের পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে বেঁচেছিলেন, সে-কারণেই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা সমাজচিন্তা সমকালচিন্তা অচল অনড় নয়। এবিষয়ে তিনি নিজেই আমাদের সতর্ক করে দিয়ে লিখেছেন,

'যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত।......রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই-সমস্ত পরিবর্তন পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহ একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য কোন্ গৌণ, কোন্‌টা তৎসাময়িক, কোন্‌টা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই। বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে তাকে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।' ['রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', কালান্তর]

'কালান্তর গ্রন্থ-ধৃত বিষয় ও অভিমতসমূহ বিচারের সময় এই বিস্তীর্ণ প্রেক্ষাপট, ও কালের ভূমিকা অবশ্যস্মর্তব্য। তৎসাময়িক অভিমতকে সামগ্রিক জীবনের পটে ফেলে দেখা চাই। অন্যথায় তার স্বরূপ জানা যাবে না।

রবীন্দ্রনাথের সমকাল বলতে আমরা কোন কালকে বুঝাব? ১৮৬০ থেকে ১৯৪০: এর মধ্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপট বার বার বদলেছে। সেহেতু কোনো কালই স্বয়ম্ভূ নয়, স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, ঐতিহ্যবাহী ও অতীতের সঙ্গে যুক্ত, সেহেতু ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ বা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রেক্ষাপট পূর্ববর্তী এক শতাব্দী। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের জন্মকালের যোগ্য প্রেক্ষাপট পূর্ববর্তী (অষ্টাদশ) শতাব্দীর পৃথিবীব্যাপী ক্রান্তিকারী ঘটনাস্রোত। 'আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করি নি': রবীন্দ্রনাথের এই ঘোষণায় আধুনিক কালের ও মনের চাঞ্চল্য, ঔৎসুক্য, প্রসারমান দিগন্ত, ভাবদ্বন্দ্বের তরঙ্গবিক্ষোভ—সব কিছুকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই আধুনিক কাল ও নবীন যৌবনের রঙ্গভূমি নব্য ইউরোপ—অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপ —শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution)-পরবর্তী ইয়োরোপ—বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে বলীয়ান ইয়োরোপ। নব্য ইয়োরোপের চিহ্নপ্রতীকরূপে

ইংরেজ এসে প্রাচীন নিদ্রিত ভারতবর্ষের ঘুম ভাঙালো অষ্টাদশ শতাব্দে, এই সুপ্রাচীন দেশে আধুনিক কাল আবির্ভূত হল।

'কালান্তর' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিপুণভাবে ভারতবর্ষে আধুনিক কালের সূচনা ও প্রকৃতি নির্দেশ ও বিশ্লেষণ করেছেন।

> 'বর্তমান যুগে, অর্থাৎ যাকে য়ুরোপীয় যুগ বলতেই হবে, সেই যুগে যখন প্রথম প্রবেশ করলুম সময়টা তখন আঠারো শো খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি। ...প্রাচীন ইতিহাসে যাই ঘটে থাকুক, আধুনিক ইতিহাসে যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার কর্ণধার তাদের সৌভাগ্য যে কোনোদিন পিছু হঠতে পারে, বাতাস বইতে পারে উল্টো দিকে, তার কোনো আশংকা ও লক্ষণ কোথাও ছিল না।'

ইউরোপের চিত্তদূত রূপে ইংরেজি সাহিত্য সেদিন আমাদের ঘুম ভাঙিয়েছিল।

> 'যখন প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তখন শুধু যে তার থেকে আমরা অভিনব রস আহরণ করেছিলেম তা নয়, আমরা পেয়েছিলেম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ; শুনতে পেয়েছিলেম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খল-মোচনের ঘোষণা; দেখেছিলেম বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস। স্বীকার করতেই হবে, আমাদের কাছে এই মনোভাবটা নূতন। তৎপূর্বে আমরা মেনে নিয়েছিলুম যে, জন্মগত নিত্যবিধানে বা পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে বিশেষ জাতের মানুষ আপন অধিকারের খর্বতা, আপন অসম্মান শিরোধার্য করে নিতে বাধ্য; তার হীনতার লাঞ্ছনা কেবলমাত্র দৈবক্রমে ঘুচতে পারে জন্মপরিবর্তনে।' (কালান্তর, শ্রাবণ ১৩৪০)

আধুনিক কালের স্বরূপটি রবীন্দ্রনাথ এখানে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। 'A man is a man for a' that' : কবিবাক্যে মানুষের প্রবল আত্মবিশ্বাস ঘোষিত। জন্ম নয়, ভাগ্যের আনুকূল্য নয়, দৈবের কৃপা নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের দয়া নয়, আপনার জোরেই মানুষ তার আপন ক্ষেত্রেই স্বরাট্। প্রবল আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মানের গৌরববোধ, বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামে জয়লাভের সুতীব্র অভিলাষ ও স্পর্ধা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত শ্রেয়োবুদ্ধিকে শ্রদ্ধা, ব্যক্তিত্বের সম্মান, যুক্তি ও মুক্তবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা : এই সব-কিছু নিয়েই আধুনিক কাল। তারই সূচনা হয়েছিল ইংরেজী শাসন-মারফৎ ইউরোপের সিংহে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্য দিয়ে। এই ঐতিহাসিক

ঘটনার নিপুণ বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি। সেই সঙ্গে মোহ-ভঙ্গের ইতিহাসও বিশ্লেষণ করেছেন, দেখিয়েছেন কীভাবে ইউরোপ তার হিংস্র নখদন্ত নিয়ে শোষকরূপে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এশিয়ায়, আফ্রিকায়।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ইংরেজ সম্পর্কে ভারতবাসীর মোহভঙ্গের সূত্রপাত। গতশতাব্দের প্রথমার্ধের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দ্বিতীয়ার্ধে অবিশ্বাস ও ঘৃণা-মিশ্রিত ভালোবাসায় পরিণত হল। এই আপাত বিরোধী ভাবদ্বন্দ্বের জটিল আবর্ত রবীন্দ্রনাথের শৈশব ও বাল্যের যুগলক্ষণ। এই শ্রদ্ধা ও বিরাগ মিশ্রিত মনোভাবের নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ—

> 'আমরা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যাশা মনে স্পষ্টভাবে লালন করেছি। সেই প্রত্যাশার মধ্যে একদিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধতা, আর একদিকে ইংরেজ চরিত্রের প্রতি অসাধারণ আস্থা।'

উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ভারতীয় মানসের স্বতোবিরোধিতার এই নিপুণ বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসদৃষ্টির পরিচায়ক।

উনবিংশ-বিংশ শতাব্দে ইংরেজ, ফরাসি, ডাচ, বেলজীয় প্রভৃতি সাম্রাজ্য-বাদী শক্তি কীভাবে এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষের উপর বর্বর অত্যাচার করেছে, ইতিহাসদৃষ্টির আলোকে রবীন্দ্রনাথ তা দেখেছেন।

> 'ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্য নয়, আগুন লাগাবার জন্য।... মহাযুদ্ধ এসে অকস্মাৎ পাশ্চাত্য ইতিহাসের একটি পর্দা তুলে দিলে।... এত মিথ্যা এত বীভৎস হিংস্রতা নিবিড় হয়ে বহুপূর্বেকার অন্ধ যুগে ক্ষণকালের জন্য হয়তো মাঝে মাঝে উৎপাত করেছে, কিন্তু এমন ভীষণ উদগ্র মূর্তিতে আত্ম-প্রকাশ করে নি।......একদা ইংরেজের সংস্রবে আমরা যে য়ুরোপকে জানতুম, কুৎসিতের সম্বন্ধে তার একটা সংকোচ ছিল; আজ সে লজ্জা দিচ্ছে সেই সংকোচকেই।......যুদ্ধপরবর্তীকালীন য়ুরোপের বর্বর নির্দয়তা যখন আজ এমন নির্লজ্জভাবে চারদিকে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকল তখন এই কথাই বারবার মনে আসে, কোথায় রইল মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপিল পৌঁছাব আজ। মনুষ্যত্বের 'পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে?' (কালান্তর, শ্রাবণ, ১৩৪০)

> 'ইংরেজকে একদা মানবহিতৈষীরূপে দেখেছি এবং কী বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তি করেছি।......এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো,

আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি ; সে তার পরিবর্তে দণ্ডহাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি।...জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।' [অন্তিম ভাষণ 'সভ্যতার সংকট,' ১ বৈশাখ, ১৩৪৮]।

ইংরেজের প্রতি গত শতাব্দীর শিক্ষিত ভারতীয়ের শ্রদ্ধা ও বিরূপতা, আস্থা ও ঘৃণার দ্বৈত রূপের ছবিটি যেমন নিপুণভাবে অংকন করেছেন তেমনি নিপুণভাবে রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করেছেন প্রাক-সমর ও প্রথম বিশ্ব-সমরোত্তর যুগের ইউরোপীয় রাজনৈতিক চারিত্র্য। কালান্তর গ্রন্থের প্রথম ও শেষ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসদৃষ্টির উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

॥ দুই

কালান্তর গ্রন্থে রবীন্দ্র-দর্পণে সমকালের যে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য।

প্রতিবিম্বের প্রথম রূপ, ইংরেজের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও আস্থা, এবং ধীরে ধীরে মোহভঙ্গ। এই রূপটি আমরা সদ্য লক্ষ্য করেছি।

প্রতিবিম্বের দ্বিতীয় রূপ, আমাদের স্বরাজ সাধনার ত্রুটি-বিচ্যুতি।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তামূলক রচনা ধীরভাবে অনুসরণ করলে দেখা যাবে, তাঁর কাছে 'স্বরাজ' বিশিষ্ট অর্থে প্রতিভাত হয়েছিল। বিদেশী রাজশক্তির সঙ্গে অসহযোগ করাটাই তাঁর কাছে দেশপ্রেমের চরম প্রকাশ বলে কখনো মনে হয় নি এবং সমকালের রাজনৈতিক হাওয়ার বিরুদ্ধেই তিনি সে-কথা নির্ভীকভাবে ব্যক্ত করেছিলেন।—

'যে দেশে দৈবক্রমে জন্মেছি মাত্র সেই দেশকে সেবার দ্বারা ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলি নি ; একে অধিকার দিতে পারি নি। নিজের বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ

দিয়ে, প্রেম দিয়ে যাকে গড়ে তুলি তাকেই আমরা অধিকার করি ; তারই 'পরে অন্যায় আমরা মরে গেলেও সহ্য করতে পারি নে। কেউ কেউ বলেন, আমাদের দেশ পরাধীন বলেই তার সেবা সম্বন্ধে দেশের লোক উদাসীন। এসব কথা শোনবার যোগ্য নয়......আমরা কন্‌গ্রেস করেছি, তীব্র ভাষায় হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেছি ; কিন্তু যে-সব অভাবের তাড়নায় আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ, উপবাসে শীর্ণ, কর্মে অপটু, আমাদের চিত্ত অন্ধসংস্কারে ভারাক্রান্ত, আমাদের সমাজ শত খণ্ডে খণ্ডিত, তাকে নিজ বুদ্ধির দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা সংঘবদ্ধ চেষ্টা দ্বারা দূর করবার কোনো উদ্‌যোগ করি নি। কেবলই নিজেকে এবং অন্যকে এই বলেই ভোলাই যে, যে দিন স্বরাজ হাতে আসবে তার পরদিন থেকেই সমস্ত আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। এমনি করে কর্তব্যকে সুদূরে ঠেকিয়ে রাখা, অকর্মণ্যতার শূন্যগর্ভ কৈফিয়ত রচনা করা নিরুৎসুক নিরুদ্যম দুর্বল চিত্তেরই পক্ষে সম্ভব।' ['রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মত', কালান্তর]

আমাদের আত্মপ্রতারণার নির্ভুল বিশ্লেষণ এখানে পাই। স্বাধীনতার বিশ বছর পরে উপরিধৃত মন্তব্য বর্ণে বর্ণে মিলে যাচ্ছে। গত শতকের শেষে নরমপন্থীদের (কংগ্রেসের মডারেট দল) ভিক্ষাপদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, 'তখনকার দিনে চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করা ও গলা মোটা করে গবর্নমেন্টকে জুজুর ভয় দেখানোই আমরা বীরত্ব বলে গর্ব করতেম।'

(তদেব)

স্বরাজের স্বরূপ কী—এ প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ নির্ভয়ে বলেছেন, 'দেশকে যদি স্বরাজসাধনায় সত্যভাবে দীক্ষিত করতে চাই তা হলে সেই স্বরাজের সমগ্র মূর্তি প্রত্যক্ষগোচর করে তোলবার চেষ্টা করতে হবে।... স্বরাজকে যদি প্রথমে দীর্ঘকাল কেবল চরকার সুতো-আকারেই দেখতে থাকি তা হলে আমাদের সেই [অন্ধ] দশাই হবে। এই রকম অন্ধ সাধনায় মহাত্মার মতো লোক হয়তো কিছু দিনের মতো আমাদের দেশের একদল লোককে প্রবৃত্ত করতেও পারেন, কারণ তাঁর ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের 'পরে তাদের শ্রদ্ধা আছে। এইজন্যে তাঁর আদেশ পালন করাকেই অনেকে ফললাভ বলে গণ্য করে। আমি মনে করি, এরকম মতি স্বরাজ লাভের পক্ষে অনুকূল নয়। স্বদেশের দায়িত্বকে কেবল সুতো কাটায় নয়, সম্যকভাবে গ্রহণ করবার সাধনা ছোটো ছোটো

আকারে দেশের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা আমি অত্যাবশ্যক বলে মনে করি।......সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চা, তার পরিচয়, তার সম্বন্ধে গৌরববোধ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হলে তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে। ['স্বরাজ গঠন', কালান্তর]

রবীন্দ্রনাথ এই কথা লিখেছিলেন আশ্বিন ১৩৩২ বঙ্গাব্দে, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে। তখন অসহযোগ আন্দোলনের পালে কেবল হাওয়া নয়, কয়েকটি ছিদ্রও দেখা দিয়েছিল। তবু সেদিন সে কথা সাহস করে বলবার মতো লোকের অভাব ছিল।

বিলাতি দ্রব্য বর্জন ও চরকা প্রচলন, সম্মোহন মন্ত্র ও গুরু ভজনা স্বরাজ লাভের পথ নয়: নির্ভীকভাবে রবীন্দ্রনাথ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আসল কথা, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর আপত্তি। অসহযোগ আন্দোলন মূলতঃ নেতিবাচক আন্দোলন বলে রবীন্দ্রনাথ তা সমর্থন করেন নি। ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলার সার্থকতায় তিনি সন্দিহান ছিলেন।

আর স্বরাজলাভের জন্য যুক্তির নির্বাসন, দেশের চিত্তশক্তির সাময়িক অবরোধ, গুরুপদে প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণ, গুরুবাক্য ওরফে দৈববাণীতে বিশ্বাস স্থাপনের তীব্র নিন্দা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। স্বরাজসাধনায় মহাত্মাজীর দান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তার প্রমাণ এই উক্তি—

মহাত্মা তাঁর সত্যপ্রেমের দ্বারা ভারতের হৃদয় জয় করেছেন, সেখানে সকলেই তাঁর কাছে হার মানি।......কন্‌গ্রেস আমরা প্রতিদিন গড়তে পারি, প্রতিদিন ভাঙতে পারি, ভারতের প্রদেশে প্রদেশে ইংরেজি ভাষায় পোলিটিকাল বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানোও আমাদের সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত, কিন্তু সত্যপ্রেমের যে সোনার কাঠিতে শত বৎসরের সুপ্ত চিত্ত জেগে ওঠে সে তো আমাদের পাড়ার স্যাকরার দোকানে গড়াতে পারি নে। যাঁর হাতে এই দুর্লভ জিনিস দেখলুম তাঁকে আমরা প্রণাম করি। [সত্যের আহ্বান, কালান্তর]

বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনে মহাত্মাজীর এই দান সকৃতজ্ঞচিত্তে আমাদের স্বীকার করা উচিত। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' ও 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' এবং শ্রীসুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসে স্বাধীনতাসংগ্রামে গান্ধীজির দান শিল্পস্বীকৃতি পেয়েছে।

কিন্তু এর পরই রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন—'কিন্তু, সত্যকে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও সত্যের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা যদি দৃঢ় না হয় তা'হলে ফল হল কী ?'

সত্যসন্ধানে অবিচল রবীন্দ্রনাথকে দুঃখের সঙ্গে লিখতে হয়েছে,

> মহাত্মাজির কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন, কেননা তাঁর মধ্যে সত্য আছে ; অতএব এই তো ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটিমাত্র সংকীর্ণক্ষেত্রে। তিনি বললেন, কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো। এই ডাক কি সেই 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা' ? এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক ? (তদেব)

প্রশ্নের ভঙ্গিতেই পরিস্ফুট, চরকা কাটার আহ্বানকে রবীন্দ্রনাথ নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক বলে মনে করেন নি। তাই খুব স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন,

> 'দেশের চিত্তপ্রতিষ্ঠিত এই স্বরাজকে অল্পকালে কয়েকদিন চরকা কেটে আমরা পাব, এর যুক্তি কোথায় ? যুক্তির পরিবর্তে উক্তি তো কোনো-মতেই চলবে না। মানুষের মুখে যদি আমরা দৈববাণী শুনতে আরম্ভ করি, তা হলে আমাদের দেশে যে হাজার রকমের মারাত্মক উপসর্গ আছে এই দৈববাণী যে তারই মধ্যে অন্যতম ও প্রবলতম হয়ে উঠবে।'
>
> (তদেব)

রবীন্দ্রনাথের এই আশংকা স্বাধীন ভারতবর্ষে নিত্যই যথার্থ বলে প্রমাণিত হচ্ছে। দৈববাণীর বিরুদ্ধে, অন্ধ মন্ত্রানুগত্যের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃপ্ত ঘোষণা :

> 'বাহ্যফলের লোভে আমরা মনকে খোয়াতে পারব না। যে কলের দৌরাত্ম্যে সমস্ত পৃথিবী পীড়িত মহাত্মাজি সেই কলের সঙ্গে লড়াই করতে চান, এখানে আমরা তাঁর দলে। কিন্তু, যে মোহমুগ্ধ মন্ত্রমুগ্ধ অন্ধ বাধ্যতা আমাদের দেশের সকল দৈন্য ও অপমানের মূলে, তাকে সহায় করে এ লড়াই হতে পারে না। কেননা তারই সঙ্গে আমাদের প্রধান লড়াই, তাকে তাড়াতে পারলে তবেই আমরা অন্তরে বাহিরে স্বরাজ পাব।' (তদেব)

রবীন্দ্রনাথ এই কথা লিখেছিলেন ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে (কার্তিক ১৩২৮ বঙ্গাব্দ)। এই কথার প্রয়োজন আজো আমাদের দেশে ফুরোয় নি।

॥ তিন ॥

'কালান্তরে' রবীন্দ্র-দর্পণে সমকালের প্রতিবিম্বের তৃতীয় রূপ, আমাদের রাষ্ট্রীয় সমস্যার প্রকৃতি-বিশ্লেষণ ও সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশ।

ইংরেজশাসনে ভারতবর্ষে সমাজকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রকে মুখ্য করা হয়েছে বলেই ভারতের দুর্দশা। এই দুর্দশার নিপুণ বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ করেছেন। বস্তুত এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ইংরেজ-অধিকৃত ভারতের চেহারাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তাঁর কথায়,

"এই তো গেল আমাদের সবচেয়ে প্রধান সমস্যা। যে বুদ্ধির রাস্তায় কর্মের রাস্তায় মানুষ পরস্পরে মিলে সমৃদ্ধির পথে চলতে পারে সেইখানে খুঁটি গেড়ে থাকার সমস্যা; যাদের মধ্যে সর্বদা আনাগোনার পথ সকল রকমে খোলা রাখতে হবে তাদের মধ্যে অসংখ্য খুঁটির বেড়া তুলে পরস্পরের ভেদকে বহুধা ও স্থায়ী করে তোলার সমস্যা; বুদ্ধির যোগে যেখানে সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, অবুদ্ধির অচল বাধায় সেখানে সকলের সঙ্গে চিরবিচ্ছিন্ন হবার সমস্যা; খুঁটিরূপিণী ভেদবুদ্ধির কাছে ভক্তিভরে বিচার-বিবেককে বলিদান করার সমস্যা।......আমাদের আর একটি প্রধান সমস্যা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা।"

[সমস্যা, কালান্তর]

আমাদের জাতীয় জীবনে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার ভেদবুদ্ধি কীভাবে আমাদের জাতীয় জীবনকে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত করেছে তা রবীন্দ্রনাথ নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার গোঁজামিল দেবার যে চেষ্টা হয়েছে—অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফৎ সমর্থন ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার লজ্জাকর হীনতা—সে-সবের মধ্যে যে ফাঁকি রয়েছে, তা 'কালান্তর' গ্রন্থে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। বলেছেন, "আসল ভুলটা রয়েছে অস্থিতে মজ্জাতে, তাকে ভোলবার চেষ্টা করে ভাঙা যাবে না" (তদেব)। "ভ্রাতৃভাবে জীর্ণ মসলার দ্বারা তাড়াতাড়ি অল্প কয়েকদিনের মধ্যে খুব মজবুত করে পোলিটিকাল সেতু বানাবার চেষ্টা" ব্যর্থ হতে বাধ্য, তা তিনি দেখিয়েছেন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ পরবর্তীকালে অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

পথ কোথায় ? লড়াই কার সঙ্গে ?—এই প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "আমাদের লড়াই ভূতের সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবাস্তবের সঙ্গে।" (তদেব)। এই ভূত আমাদের জীবনে এনেছে ভেদ ও পরবশতা, এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের আয়ুধ হোক শুভবুদ্ধি, যা অনৈক্য, অশিক্ষা, নীচতা ও লোভের শত্রু।

চিত্তশক্তির দৈন্য দেখে রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হয়েছেন। দেশের সমস্ত বুদ্ধিশক্তি ও কর্ম শক্তিকে সংঘবদ্ধ আকারে দেশে ছড়িয়ে দিলেই দেশের মুক্তি—তাঁর এই পন্থা রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' ভাষণে ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের রাষ্ট্রজীবনে যখনি দেউলে চিন্তার প্রাধান্য লক্ষ্য করেছেন, তখনি তার বিরুদ্ধে সবল কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছেন, নির্ভয়ে অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ করেছেন। রাষ্ট্র-চিন্তাবিদ রবীন্দ্রনাথের চিন্তার এটাই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তাঁর কথায়,

"আমি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে এই কথাই বারবার বলেছি, যে কাজ নিজে করতে পারি সে কাজ সমস্তই বাকি ফেলে, অন্যের উপর অভিযোগ নিয়েই অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয়কর্তব্য বলে মনে করি নে।"

[রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত, কালান্তর]

আসল কথা, স্বরাজের প্রধান শর্ত, আত্মশক্তির উদ্বোধন। 'স্বরাজ আগে আসবে, স্বদেশের সাধনা তারপরে, এমন কথাও তেমনিই সত্যহীন, এবং ভিত্তিহীন এমন স্বরাজ।' (তদেব)

দেশের চিত্তশক্তির দৈন্যের তীব্র নিন্দা করে নির্ভয়ে রবীন্দ্রনাথ এই তীব্র ভর্ৎসনা-বাক্য উচ্চারণ করেছেন,

"আজ আমাদের দেশে চরকালাঞ্ছন পতাকা উড়িয়েছি। এ যে সংকীর্ণ জড়শক্তির পতাকা, অপরিণত যন্ত্রশক্তির পতাকা, স্বল্পবল পণ্যশক্তির পতাকা—এতে চিত্তশক্তির কোনো আহ্বান নেই। সমস্ত জাতিকে মুক্তির পথে যে আমন্ত্রণ সে তো কোনো বাহ্য প্রক্রিয়ায় অন্ধ পুনরাবৃত্তির আমন্ত্রণ হতে পারে না। তার জন্য আবশ্যক পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন।"

(তদেব)

ভারতের স্বাধীনতার দাবী রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে সমর্থন করেছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে, হিজলী বন্দীশিবিরে রাজবন্দী হত্যার বিরুদ্ধে, মিস র‍্যাথবোনের বিরুদ্ধে খোলা চিঠির জবাবে রবীন্দ্র-কণ্ঠ

বারবার গর্জন করে উঠেছিল।

স্বাধীনতার আহ্বান যখন রবীন্দ্র-কণ্ঠে শুনি তখন সমস্ত মন জেগে ওঠে। স্পষ্টভাষায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"আমাদের সমাজে, আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণায় দুর্বলতা যথেষ্ট আছে, সে কথা ঢাকিতে চাহিলেও ঢাকা পড়িবে না। তবু আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। অন্ধকার ঘরে এক কোণের বাতিটা মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে বলিয়া যে আর এক কোণের বাতি জ্বালাইবার দাবি নাই, এ কাজের কথা নয়। যে দিকের যে সলতে দিয়াই হোক আলো জ্বালাই চাই।" ['কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', কালান্তর]

আত্মকর্তৃত্বের অধিকার আমাদের চাই—এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ বারবার সবল কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। 'নিভৃতে সাহিত্যে রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে' বেরিয়ে এসেছিলেন এই দাবী জানাতে। 'ভাগচক্রের পরিবর্তনে একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে'—এ কথাও তিনি ঘোষণা করেছিলেন ('সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ, ১ বৈশাখ, ১৩৪৮)।

রবীন্দ্রনাথের কৈশোর ও যৌবন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরও কৈশোর ও যৌবন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলেছিলেন, কিন্তু খানিকদূর এগিয়েই তিনি সরে যান,—এ ইতিহাস আমাদের অজানা নয়। এই মতবিরোধের পরিচয় পাই 'সত্যের আহ্বান' (১৯২১), 'সমস্যা' (১৯২৩), 'সমাধান' (১৯২৩), 'চরকা' (১৯২৫) ও 'রবীন্দ্রনাথে রাষ্ট্রনৈতিক মত' (১৯২৯)—কালান্তর-ভুক্ত প্রবন্ধ-নিচয়ে ও 'ঘরেবাইরে' উপন্যাসে (১৯১৬)।

নিখিলেশের উক্তি রবীন্দ্রনাথেরই উক্তি :

"আজ সমস্ত দেশের ভৈরবীচক্রে মদের পাত্র নিয়ে আমি যে বসে যাইনি, এতে সকলেরই অপ্রিয় হচ্ছি। দেশের লোক ভাবছে, আমি খেতাব চাই কিম্বা পুলিশকে ভয় করি। পুলিশ ভাবছে, ভিতরে আমার কুমৎলব আছে বলেই বাইরে আমি এমন ভালো মানুষ। তবু আমি এই অবিশ্বাস ও অপমানের পথেই চলেছি। কেননা, আমি এই বলি, দেশকে সাদাভাবে সত্যভাবে দেশ বলেই দেখে, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে, যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না—চীৎকার করে মা বলে', দেবী বলে', মন্ত্র পড়ে' যাদের কেবলই সম্মোহনের দরকার হয়—তাদের

সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয়, যেমন নেশার প্রতি। সত্যেরও উপর কোনো একটা মোহকে প্রবল করে রাখবার চেষ্টা, এ আমাদের মজ্জাগত দাসত্বের লক্ষণ। চিত্তকে মুক্ত করে দিলেই আমরা আর বল পাই নে। হয় কোনো কল্পনাকে নয় কোনো মানুষকে, নয় ভাটপাড়ার ব্যবস্থাকে আমাদের অসাড় চৈতন্যের পিঠের উপর সওয়ার করে না বসালে সে নড়তে চায় না। যতক্ষণ এইরকম মোহে আমাদের প্রয়োজন আছে, ততক্ষণ বুঝতে হবে স্বাধীনভাবে নিজের দেশকে পাবার শক্তি আমাদের হয় নি।"

আমাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবন সম্পর্কে নিখিলেশের এই বিশ্লেষণ কালান্তর গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তার সারাৎসার। মহাত্মাজির চরকা ও ও অসহযোগ-আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এই অভিযোগই উত্থাপন করেছেন :

"সমস্ত জাতিকে মুক্তির পথে যে আমন্ত্রণ......তার জন্যে আবশ্যক পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন। সে কি এই চরকা চালনায়? চিন্তাবিহীন মূঢ় বাহ্য অনুষ্ঠানকেই ঐহিক পারত্রিক সিদ্ধিলাভের উপায় গণ্য করেই কি এত কাল জড়ত্বের বেষ্টনে আমরা মনকে আকৃষ্ট করে রাখি নি? আমাদের দেশের সবচেয়ে বড়ো দুর্গতির কারণ কি তাই নয়? আজ কি আকাশে পতাকা উড়িয়ে বলতে হবে, বুদ্ধি চাই নে, বিদ্যা চাই নে, প্রীতি চাই নে, পৌরুষ চাই নে, অন্তর প্রকৃতির মুক্তি চাই নে, সকলের চেয়ে বড়ো করে' একমাত্র করে' চাই, চোখ বুজে, মনকে বুজিয়ে দিয়ে হাত চালানো, বহু সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন হয়েছিল তারই অনুবর্তন করে'? স্বরাজ-সাধন-যাত্রার এই হল রাজপথ? এমন কথা বলে' মানুষকে কি আপমান করা হয় না?" ['রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', কালান্তর]

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নায়ক নিখিলেশের উক্তি ও ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে রচিত এই প্রবন্ধে রাষ্ট্রনীতিবিৎ রবীন্দ্রনাথের উক্তি একই চিন্তা-প্রসূত। এ থেকে অনুধাবন করা যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাজির নেতৃত্বের উপর অন্ধ বিশ্বাস না রেখে নোতুন নেতৃত্ব চেয়েছেন। সে নেতৃত্ব কে দেবে?

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আদ্যোপান্ত ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করেছেন তিনটি প্রবন্ধে—'কংগ্রেস', 'দেশনায়ক' ও

'মহাজাতিসদন'। এই তিনটি একই বছরে (১৯৩৯) লেখা। গান্ধী-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের অভ্যুদয়—ভারতে রাজনীতিতে ও কংগ্রেসের ইতিহাসে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সেই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তিনি নির্বাক দর্শক ছিলেন না। সেই মুহূর্তে নির্ভয়ে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। দেউলে গান্ধী-নেতৃত্বের অবসান ও সুভাষ-নেতৃত্বের অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রবীন্দ্রনাথ অনুধাবন করেছিলেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তিনি লিখেছিলেন,

১। 'বর্তমান কংগ্রেস্ যত বড়ো মহৎ অনুষ্ঠানই হোক না কেন তার সমস্ত মত ও লক্ষ্য যে একেবারে দৃঢ়নির্দিষ্ট ভাবে নির্বিকার নিশ্চল হয়ে গেছে, তাও সত্য হতেই পারে না। কোনো দিনই তা না হোক এই আকাঙ্ক্ষা করি'। ('কন্‌গ্রেস' ২০।৫।১৯৩৯)

২। 'এ কথা জানি, যাঁরা শক্তিশালী তাঁরা নতুন পথে অসাধ্য সাধন করে থাকেন। মহাত্মাজিই তারই প্রমাণ। তবু, তাঁর স্বীকৃত সকল অধ্যবসায়ই চরমতা লাভ করবে এমন কথা শ্রদ্ধেয় নয়। অন্য কোন কর্মবীরের মনে নতুন সাধনার প্রেরণা যদি জাগে তা হলে দোহাই পাড়লেও সে বীর হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না। সেজন্য হয়তো অভ্যস্ত পথে যূথভ্রষ্ট হয়ে অনভ্যস্ত পথে তাঁকে দল বাঁধতে হবে, সে দলের সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে ও তাকে আয়ত্ত করতে সময় লাগবে।' (তদেব)

৩। 'আজ আমি জানি, বাংলা দেশের জননায়কের প্রধান পদ সুভাষচন্দ্রের। ......তার (বাংলার) অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনতা দূর করবার সাধনা গ্রহণ করবেন এই আশা করে আমি সুদৃঢ়সংকল্প সুভাষকে অভ্যর্থনা করি এবং এই অধ্যবসায়ে তিনি সহায়তা প্রত্যাশা করতে পারবেন আমার কাছ থেকে, আমার যে বিশেষ শক্তি তাই দিয়ে। বাংলাদেশের সার্থকতা বহন করে বাঙালি প্রবেশ করতে পারবে সসম্মানে ভারতবর্ষের মহাজাতীয় রাষ্ট্রসভায়। সেই সার্থকতা সম্পূর্ণ হোক সুভাষচন্দ্রের তপস্যায়।' (তদেব)

৪। 'সুভাষচন্দ্র, বাঙালি কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশ-নায়কের পদে বরণ করি।......বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি।' ('দেশনায়ক')

৫। 'বাংলাদেশের যে আত্মিক মহিমা নিয়তপরিণতির পথে নবযুগের

নবপ্রভাতের দিকে চলেছে, অনুকূল ভাগ্য যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং প্রতিকূলতা যার নির্ভীক স্পর্ধাকে দুর্গম পথে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করছে, সেই তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব এই মহাজাতি সদনের কক্ষে কক্ষে বিচিত্র মূর্তরূপ গ্রহণ করে বাঙালিকে আত্মোপলব্ধির সহায়তা করুক। বাংলার যে জাগ্রত হৃদয় মন আপন বুদ্ধির ও বিদ্যার সমস্ত সম্পদ ভারতবর্ষের মহাবেদীতলে উৎসর্গ করবে বলেই ইতিহাসবিধাতার কাছে দীক্ষিত হয়েছে, তার সেই মনীষিতাকে এখানে আমরা অভর্থনা করি।' ('মহাজাতি সদন')
পরবর্তীকালের ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যদ্বাণীকে সার্থক করেছে। এখানেই রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক বিশ্লেষণ অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

॥ চার ॥

'কালান্তরে' রবীন্দ্র-দর্পণে সমকালের প্রতিবিম্বের চতুর্থ রূপ, আন্তর্জাতিকতার উৎকর্ষ ও জাতীয়তাবাদের অপকর্ষ-প্রতিপাদন। পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা ও অনুদারতা দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে সংকীর্ণ দেশপ্রেম ওরফে আত্মগর্বী জাতীয়তাবোধের উপরে রবীন্দ্রনাথ স্থান দিয়েছেন আন্তর্জাতীয়তাবাদকে। বলেছেন,

"বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্র একান্তভাবে স্বকীয় স্বার্থসাধনের যে আয়োজনে ব্যাপৃত সেই তার রাষ্ট্রনীতি। তার মিথ্যা দলিল আর অস্ত্রের বোঝা কেবলই ভারী হয়ে উঠেছে। এই বোঝা বাড়াবার আয়োজনে পরস্পর পাল্লা দিয়ে চলেছে; এর আর শেষ নেই, জগতে শান্তি নেই। যে দিন মানুষ স্পষ্ট করে বুঝবে যে, সর্বজাতীয় রাষ্ট্রিক সমবায়েই প্রত্যেক জাতির প্রকৃত স্বার্থসাধন সম্ভব, কেননা পরস্পরনির্ভরতাই মানুষেব ধর্ম, সেইদিনই রাষ্ট্রনীতিও বৃহৎভাবে মানুষেব সত্যসাধনের ক্ষেত্র হবে। সেইদিনই সামাজিক মানুষ যে-সকল ধর্মনীতিকে সত্য বলে স্বীকার করে, রাষ্ট্রিক মানুষও তাকে স্বীকার করবে। অর্থাৎ, পরকে ঠকানো, পরের ধন চুরি, আত্মশ্লাঘার নিরবচ্ছিন্ন চর্চা, এগুলোকে কেবল পরামর্থের নয়, ঐক্যবদ্ধ মানুষের স্বার্থেরও অন্তরায় বলে জানবে। League of Nations-এর

প্রভিষ্ঠা হয়তো রাষ্ট্রনীতিতে অহমিকামুক্ত মনুষ্যত্বের আসন প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্‌যোগ।'
['চরকা', কালান্তর']

স্পষ্ট করে রবীন্দ্রনাথ একথাই লিখেছেন তাঁর Nationalism ভাষণ-মালায়—

India has never had a real sense of nationalism. Even though from childhood I had been taught that idolatry of of the Nation is almost better than reverence for God and humanity, I believe I have outgrown that teaching, and it is my conviction that my countrymen will truly gain their India by fighting against the education which teaches them a country is greater than ideals of humanity.

রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে। জাপানী কবি ইয়োনে নোগুচির পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে লেখেন (১৯৩৮)—জাতীয়তার চেয়ে অনেক বড়ো মানবতা ('humanity is greater than nationality')। মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ এর জন্য দেশে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিদেশে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসনের বিরোধিতা করেছেন। জাপানে, জার্মানিতে, মার্কিন দেশে এজন্য তিনি যে বিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন, তাতে দমিত হন নি। এই অভিমত ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করবে,—ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের এই অভিযোগে তিনি কর্ণপাত করেন নি। মহান আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ প্রতিকূল পরিবেশে সাহসের সঙ্গে ব্যক্ত করে ছিলেন। 'সত্যের আহ্বান' (১৯২১) ও 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১) প্রবন্ধে এই বক্তব্য বিশ্লেষিত ও প্রতিষ্ঠিত।

১। "ভারতের আজকের এই উদ্‌বোধন সমস্ত পৃথিবীর উদ্‌বোধনের অঙ্গ। একটি মহাযুদ্ধের তূর্যধ্বনিতে আজ যুগারম্ভের দ্বার খুলেছে। মহাভারতে পড়েছি, আত্মপ্রকাশের পূর্ববর্তীকাল অজ্ঞাতবাসের কাল। কিছুকাল থেকে পৃথিবীতে মানুষ যে পরস্পর কি রকম ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে সে কথাটা স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞাত ছিল। অর্থাৎ ঘটনাটা বাইরে ছিল, আমাদের মনে প্রবেশ করে নি। যুদ্ধের আঘাতে এক মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যখন বিচলিত হয়ে উঠল, তখন এই কথাটা আর লুকানো রইল না। হঠাৎ একদিনে আধুনিক সভ্যতা অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত কেঁপে উঠল। বোঝা গেল, এই কেঁপে ওঠার কারণটা

স্থানিক নয় এবং ক্ষণিক নয়—এর কারণ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে ব্যাপ্ত, তার মধ্যে সত্যের সামঞ্জস্য যতক্ষণ না ঘটবে ততক্ষণ এই কারণের নিবৃত্তি হবে না। এখন থেকে যে-কোন জাত নিজের দেশকে একান্ত স্বতন্ত্র করে দেখবে, বর্তমান যুগের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটবে, সে কিছুতেই শান্তি পাবে না। এখন থেকে প্রত্যেক দেশকে নিজের জন্য যে চিন্তা করতে হবে তার সে চিন্তার ক্ষেত্র হবে জগৎজোড়া। চিত্তের এই বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চা করাই বর্তমান যুগের সাধনা।" ('সত্যের আহ্বান')

২। 'মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সবচেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে, তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। অথচ, আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহদাশয় ইংরেজদের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে।...দৃষ্টান্তস্থলে এন্‌ড্রুসের নাম করতে পারি; তার মধ্যে যথার্থ ইংরেজকে, যথার্থ খৃষ্টানকে, যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল।' ('সভ্যতার সংকট')*

এইসব উক্তিতে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের উপরে আন্তর্জাতিকতাবাদ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বকে স্থান দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ কালান্তরের কবি; সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের কবি নন; উদার বিশ্ববোধের কবি।

---

* রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দীনবন্ধু এন্‌ড্রুজের চিন্তার মিল ছিল অনেক ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি 'বিদেশী' বস্ত্র পোড়ানোর ব্যাপারে গান্ধীজির মতের বিরুদ্ধতা করেছিলেন। দীনবন্ধুর অভিমত এখানে স্মরণযোগ্য: 'There is a subtle appeal to racial feeling in that word 'foreign'. We seem to be losing sight of the great outside world to which we belong and concentrating on India and this must, I fear, lead back to the old, bad, selfish nationalism.'
—Charles Freer Andrews.